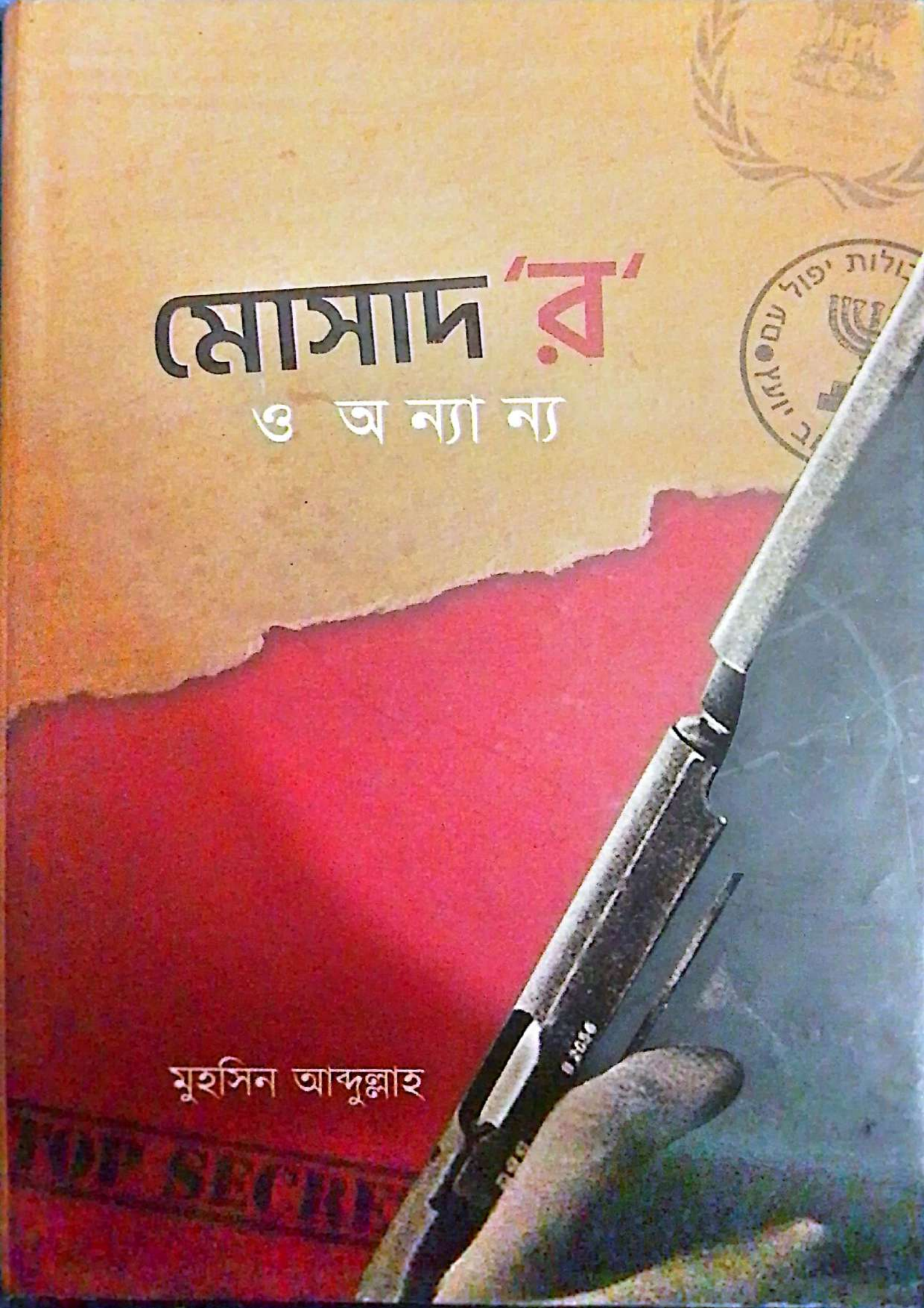
মোসাদ 'র'

ও অন্যান্য



মুহসিন আব্দুল্লাহ

To join our telegram channel
https://t.me/Astana_e_Musafir



@ASTANA_E_MUSAFIR

এমন আরো PDF বই ডাউনলোড করার জন্য আমাদের
Astana_e_Musafir টেলিগ্রাম চ্যানেলে ঘুরে আসুন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

গোয়েন্দা কী?———১১
গোয়েন্দা কত প্রকার?———১২
গোয়েন্দাদের কিছু বৈশিষ্ট্য———১৪
কীভাবে গোয়েন্দা নিয়োগ হয়?———১৫
গোয়েন্দারা কী কাজ করে?———১৭
গোয়েন্দাদের অবদান———১৯
গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণ———২০
কেন গোয়েন্দাগিরি প্রয়োজন?———২২
শত্রুদেশের গোয়েন্দা যখন বন্ধু———২২
বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা———২৪
চলচ্চিত্র অঙ্গনে গোয়েন্দা———৩৪
কীভাবে চলে গোয়েন্দাগিরি?———৩৪
গোয়েন্দাগিরির কিছু ব্যর্থ চিত্র———৩৬
এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা ও ওহাবী মতবাদ———১৪
তুর্কি খেলাফত ধ্বংসে যে গোয়েন্দার হাত ছিল———৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে গোয়েন্দাগিরি———৬১
সাধারণ কল্যাণ ও বিশেষ কল্যাণ———৬২
সরকারি কর্মচারীদের পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ———৬৬

CamScanner

শত্রু সৈন্যদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ———৬৭
বহিরাগতদের তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ———৭১

তৃতীয় অধ্যায়

মোসাদ কী?———৭৭
মোসাদের জন্ম যেভাবে———৭৮
মোসাদ কী করে?———৭৯
মোসাদ কেন এসব করে?———৮০
ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কি মোসাদের?———৮৪
শেষ যুগে জেরুজালেমে ইহুদিরাষ্ট্র হবার কথা কুরআনে আছে!———৮৮
খালেদ মিশালকে হত্যা চেষ্টা মোসাদের———৯২
ইরানের পরমাণু প্রকল্প ধ্বংসে মোসাদ———১০১
সাদ্দামের সুপারগান প্রকল্প ধ্বংস করে মোসাদ———১০৭
চকলেট খাইয়ে যাকে মেরেছিল মোসাদ!———১১৫
ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ প্রধানকে হত্যা করে মোসাদ———১১৭
মোসাদের এজেন্ট হয় মিসর প্রেসিডেন্টের জামাতা———১২১
মোসাদের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল একজন মুসলিম শাসক!———১৩৫
কুর্দিদের উসকে দিতে মোসাদের চক্রান্ত———১৩৭
ইরাকের মিগ-২১ বিমান ছিনতাই করে নেয় মোসাদ———১৩৯
সিরিয়া থেকে ইহুদি তরুণীদের ফিরিয়ে আনে মোসাদ———১৪৬
ইয়াসির আরাফাতকে হত্যায় মোসাদের যত দুর্ধর্ষ অপারেশন———১৪৮
অপারেশন এন্টাবে: মোসাদের দুর্ধর্ষ এক কমান্ডো অভিযান———১৬২
৯/১১ কি মোসাদের কাজ?———১৬৮
দেশে দেশে মোসাদ———১৬৯
মোসাদের হাতে নিহত কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি———১৭৭
মুসলিম বিজ্ঞানীদের কেন হত্যা করে মোসাদ?———১৭৭
গুপ্তহত্যা বন্ধ করবে কি মোসাদ?———১৮১
বাংলাদেশের মোসাদ———১৮৪

বাংলাদেশে মোসাদের হস্তক্ষেপ চায় হিন্দু স্ট্রাগল কমিটি!———১৯৪
মোসাদের প্রধানেরা———১৯৫
মোসাদ প্রধানরা অবসর গিয়ে কী করে?———১৯৯
মোসাদ-সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি/নিউজ———২০১
মোসাদ-সংক্রান্ত মুভি———২০২
মোসাদ-সংক্রান্ত বই-পত্র———২০৪

চতুর্থ অধ্যায়

'র' কী?———২০৭
'র-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য———২০৮
'র'-এর কাজ কী?২১০
'র' কীভাবে গঠিত হয়েছিল?———২১০
যেভাবে নামকরণ হয় 'র' (R&A.W)———২১৭
'র'-এর প্রথম প্রধান নিয়োগ হয় যেভাবে———২১৮
'র'-এর প্রথম লক্ষ্যমাত্রা ও কিছু সমস্যা———২১৯
'র'-এর প্রথম বাজেট———২২০
'র'-এর শাখাপ্রশাখা/ 'র'-এর প্রথম অপারেশনাল শাখা———২২০
'র'-এ জনবল নিয়োগ হয় যেভাবে———২২১
'র'-এর প্রশিক্ষণ———২২২
'র'-এর কর্মপদ্ধতি———২২৪
বাংলাদেশ সৃষ্টিতে 'র'-এর ভূমিকা———২২৬
বাংলাদেশ সৃষ্টি 'র'-এর সেরা অর্জন———২২৯
৭৫ এ 'র'-এর ব্যর্থতা———২২৯
সিকিম রাষ্ট্র দখলে 'র'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা———২৩১
বাংলাদেশকে জঙ্গিরাষ্ট্র বানানোর পরিকল্পনা 'র'-এর!———২৩৬
২০১২ সালে একুশে টিভির আলোচিত সেই সংবাদ———২৪০
শ্রীলঙ্কা *গার্ডিয়ান* পত্রিকার নিউজটি বিস্তারিত———২৪৪
শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চ সৃষ্টিতে 'র'?———২৪৭

ঢাকা থেকে গোপনে আসামি ধরে নিয়ে যায় 'র'!——২৫০
বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংসে ভারতের কূটচাল!——২৫৪
কয়লার ধোঁয়া আমাদের, বিদ্যুৎ ভারতের!——২৬১
বাংলাদেশের সংস্কৃতি ধ্বংসে 'র'——২৬২
অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা 'র'-এর লক্ষ্য!——২৬৪
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে 'র'——২৬৬
'র' নিয়ে একটি বিস্ময়কর বই 'বাংলাদেশে র'——২৬৭
বাংলাদেশের হিন্দুদের সাথে 'র'-এর সম্পর্ক !——২৭১
বাংলাদেশ নিয়ে এক 'র' অফিসারের খোলামেলা বর্ণনা——২৭৩
বাংলাদেশে 'র' কতটা প্রভাবশালী?——২৮১
বাংলাদেশ একদিন সিকিমের পরিণতি বরণ করবে!——২৮৩
কোটা সংস্কার আন্দোলন বানচালে 'র'-এর ষড়যন্ত্র!——২৮৩
নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় ভারতের কালো হাত——২৮৫
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে 'র'——২৮৬
রবীন্দ্র কৌশিক: সর্বকালের সেরা 'র' এজেন্ট——২৮৮
'র'-এর কিছু আলোচিত অপারেশন——২৯১
'র' কর্মকর্তাদের কুকর্ম——২৯৪
'র'-এর পরিচালকেরা——২৯৪

পঞ্চম অধ্যায়
আরো কিছু গোয়েন্দা সংস্থা——২৯৮
একনজরে বিশ্বের সেরা ১৫ গোয়েন্দা সংস্থা——৩০৭

প্রথম অধ্যায়

গোয়েন্দা কী?

প্রথমেই শাব্দিক বুৎপত্তি জেনে নেওয়া যাক। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান মতে, গোয়েন্দা শব্দটি ফারসি 'গোয়িন্দাহ' থেকে এসেছে। যার অর্থ গুপ্তচর। বাংলায় শব্দটি বিশেষ্য। Spy, Detective-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ।

Oxford Advanced Learners Dictionary-তে Detective শব্দের অর্থে বলা হয়েছে, 1. A person especially a police officer, whose job is to examine crimes and catch criminals: Detective Inspector (Roger) Brown. 2. A person employed by sb to find out information about sb/sth.

এই ডিকশনারিতে Detective শব্দের সাথে সাথে আরো দুটি পরিভাষা দেখতে বলা হয়। যার একটি Private Detective ('ব্যক্তিগত গোয়েন্দা') অপরটি Store Detective ('দোকান/গুদাম গোয়েন্দা'). Private Detective *(noun);* a DETECTIVE who is not in the police but who can be employed to find out information, find a missing person, follow sb etc. Private Detective-কে Private Investigator ev Private eye ('গোপন চোখ') I ejv nq| Store Detective *(noun);* a person employed by a large shop/store to watch customers and make sure they do not steal goods.

গোয়েন্দা বা Detective হচ্ছেন একজন পেশাদার অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি কোনো পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মনোনীত গুপ্তচর হতে পারেন।

CamScanner

হতে পারেন বড় কোনো ব্যবসায়ী, রাজনীতিক কিংবা বিশেষ ব্যক্তি নিয়োজিত একান্ত তথ্য সংগ্রহকারী। এজন্য গোয়েন্দাকে 'ব্যক্তিগত গোয়েন্দা' বা 'ব্যক্তির দৃষ্টি/গোপন চোখ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অনানুষ্ঠানিকভাবে, বিশেষত কথ্য সাহিত্যে একজন গোয়েন্দাকে নিবন্ধন বা লাইসেন্সধারী কিংবা লাইসেন্সবিহীন অবস্থায় দেখা যায়। শার্লক হোমস এবং ইন্সপেক্টর ক্লোসিও অত্যন্ত জনপ্রিয় গোয়েন্দা উপন্যাস-চরিত্র হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত নাম।

গোয়েন্দার প্রধান কাজই হচ্ছে কোনো গুরুতরভাবে লুক্কায়িত অপরাধ বা অমীমাংসিত ঐতিহাসিক অপরাধের ঘটনাপ্রবাহ তদন্তের স্বার্থে তৃণমূল পর্যায় থেকে সংগ্রহ করে সংবাদের পেছনের সংবাদ জনসমক্ষে তুলে ধরা। এ ছাড়াও একজন গোয়েন্দা ব্যক্তি 'ডিটেকটিভ' হিসেবেও সকলের কাছে পরিচিতি পেয়ে থাকেন।

একজন ব্যক্তি যখন গোয়েন্দা হিসেবে কর্মরত থাকেন তখন তিনি একটি আইডেন্টি কার্ড সঙ্গে রাখেন। প্রয়োজনে কেউ তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। সাধারণত গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ পদবিধারী ব্যক্তির নামের পূর্বে ডিটেকটিভ লেখা থাকে, যা সংক্ষেপে 'ডিট' (Det.) নামে পরিচিত।

১. গোয়েন্দা কত প্রকার?

২. ভারতীয় সংবাদিক অশোকা রায়না তাঁর বিখ্যাত '*ইনসাইড র*' বইতে লেখেন, "রিচার্ড ডিকেন তাঁর 'A History of the Chinese Secret Service'-এ উল্লেখ করেছেন, যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ৫১০ বছর পূর্বে 'mvb Ry; 'wcs dv' (Ping Fa) ev 'Art of War' শীর্ষক বইয়ে জানামতে সর্বপ্রথম যুদ্ধের কলাকৌশল ও এসপাওয়ানেজ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওই বইটিতে বিশেষভাবে একটি গুপ্তচর সংস্থার সংগঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। যদিও এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে কিছু করা সম্ভব নয়, তথাপি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গুপ্তচরবৃত্তি সম্বন্ধীয় ওই গ্রন্থটিই সবচেয়ে পুরনো লিখিত নথি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার দাবিদার।

CamScanner

'Art of War' বইয়ে 'সান জু' পাঁচ প্রকার গুপ্তচরবৃত্তি ও পাঁচ ধরনের 'গুপ্তচর বা গোয়েন্দা' সম্পর্কে আলেকপাত করেছেন। এরা হচ্ছে যথাক্রমে-

১. স্থানীয় গুপ্তচর (Local Spy)

শত্রুদেশে ভালো আচরণ ও সহৃদয় ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের মন জয় করে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকে এমন ব্যক্তি।

২. অভ্যন্তরীণ গুপ্তচর (Internal Spy)

শত্রুদেশে বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের 'তথ্যের সূত্র' হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে তাদের গুপ্তচর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

৩. রূপান্তরিত গুপ্তচর (Converted Spy)

শত্রুদেশীয় গুপ্তচরদের ঘুষের মাধ্যমে তাঁর নিজ সংস্থার ভুল তথ্য পাচারে প্ররোচিত করা ও তাঁর নিজ জনগণের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা।

৪. অনুপযুক্ত বা বাতিল গুপ্তচর (Condemned Spy)

যে সমস্ত গুপ্তচর শত্রু দ্বারা বন্দি হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করে।

৫. সাধারণ গুপ্তচর (Ordinary Spy)

সাধারণ নিয়মিত ক্যাডারভুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর গুপ্তচর।

"... ভারতে কৌটিল্যের 'আর্থশাস্ত্র' গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কিত লেখনীর জগতে সবিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। কৌটিল্য ইতিহাসে 'বিষ্ণুগুপ্ত' ও 'চাণক্য' নামেও সমধিক পরিচিত।

শ্যামসাস্ত্রী তাঁর 'আর্থশাস্ত্রে'র অনুবাদে এ বইটির রচনাকালে ৩২১ খ্রিষ্টপূর্ব সাল হতে ৩০০ শত খ্রিষ্টপূর্ব সালের মধ্যে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কৌটিল্য অত্যন্ত সুন্দর লৈখিক বর্ণনার মাধ্যমে 'মৌর্য' ও 'মৌর্য পরবর্তী' রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বইয়ে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

কৌটিল্যের মতানুযায়ী গুপ্তচরদের প্রাথমিকভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. 'স্থানীয় এজেন্ট' ও ২. 'পরিব্রাজক বা ভ্রাম্যমাণ এজেন্ট' (এরা আবার তত্ত্বাবধায়ক এজেন্ট রূপেও চিহ্নিত) হিসেবে পরিচিত।

'স্থানীয় এজেন্ট' তার কর্তৃত্বাধীনে যাদের নিয়োজিত করবেন, তারা বিভিন্ন আবরণে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত। এরা হলো 'শঠ/অসৎ শয্য', 'সন্ন্যাসী', 'গৃহস্বামী'/গৃহস্থ', 'ব্যবসায়ী' এবং তপশ্চর্যায় নিয়োজিত 'যোগী/তাপস' শ্রেণির ব্যক্তিত্ব।

আবার 'পরিব্রাজক' বা 'ভ্রাম্যমাণ এজেন্ট' আওতায় আসা গুপ্তচররা হচ্ছে 'সতীর্থ/সহযোগী গুপ্তচর', 'জনরোষ প্রজ্বলনকারী গুপ্তচর', 'বন্দি গুপ্তচর' এবং 'জাদুকর মহিলা গুপ্তচর'।

কৌটিল্য এসবের সাথে পুরোহিত ও সন্ন্যাসিনী গুপ্তচরের বিবরণও তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন; যা তাঁর গুপ্তচর হিসেবে বিভিন্ন ও ব্যাপক প্রকৃতি বা পেশার লোকদের নিয়োজিত করার চাতুর্যপূর্ণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়।

যদিও কৌটিল্য একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু জনগণের 'ধর্মীয় অনুভূতির' নীতিজ্ঞান বর্জিত যত্রতত্র ব্যবহারে তাঁকে যথেষ্ট প্ররোচনা দিতে দেখা যায়। আবার গুপ্তচররা অসংখ্য ছদ্মাবরণে লুকিয়ে কাজে নিয়েজিত থাকায় একে অন্যের সাথে বাস্তবসম্মত উপায়ে যত দূর সম্ভব অপরিচিত থাকাই বিধেয় বলে কৌটিল্য মনে করেন।"

৩. গোয়েন্দাদের কিছু বৈশিষ্ট্য

সাধারণ অর্থে যিনি গুপ্তচর বৃত্তির মাধ্যমে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন, তিনি 'গোয়েন্দা' নামে পরিচিত। সাধারণত একজন সফল ও স্বার্থক গোয়েন্দাকে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়:

* অপরাধ বা রহস্যজনক কর্মকাণ্ড মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করবেন।

CamScanner

* রহস্যমূলক কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষণ সম্পৃক্ত থেকে তীক্ষ্ণ ও শাণিত মেধা প্রয়োগ করবেন।

* উপস্থিত বিচার-বুদ্ধি যুক্তিসংগতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বা বস্তুকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করবেন।

* নির্দোষ ব্যক্তি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত বা দোষী না হন এবং প্রকৃত দোষীকে আইনে সোপর্দ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

* অপরাধী বা ঘটনার ছোট্ট ক্লু, সংকেত বা চিহ্নের সাহায্যে অপরাধের গতি-প্রকৃতি ও অবস্থান চিহ্নিত করবেন।

৪. কীভাবে গোয়েন্দা নিয়োগ হয়?

কিছু কিছু পুলিশ অধিদপ্তরে 'গোয়েন্দা' পদে সরাসরি লোক নিয়োগ করা হয় না। গোয়েন্দাকে ওই পদে নিয়োগের জন্যে নির্দিষ্ট কিছু শর্তাবলি পূরণ করতে হয়। তন্মধ্যে লিখিত পরীক্ষা একটি অন্যতম মানদণ্ড। পুলিশ কর্মকর্তাকে এ যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমেই কেবল গোয়েন্দা পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ আইন অনুসারে, পুলিশ গোয়েন্দাকে কমপক্ষে দুবছর পোশাকধারী বা উর্দি পরিহিত কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করতে হয়। এর ফলে তিনি 'অপরাধী তদন্ত অধিদপ্তরে' যোগদানের জন্য আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। গোয়েন্দা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য যুক্তরাজ্যের পুলিশবাহিনীতে চাকরির পাশাপাশি অপরাধ তদন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে 'জাতীয় তদন্ত পরীক্ষায়' অবশ্যই কৃতকার্য হতে হয়।

অনেক পুলিশ অধিদপ্তরে গোয়েন্দা হিসেবে স্নাতক উত্তীর্ণ সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে পোশাকবিহীন অবস্থায় সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়। অনেকের মতে, গোয়েন্দারা সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের চাকরি করেন ও পৃথক ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। গোয়েন্দাদের মাঝে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের গুণাবলি, সক্ষমতা, যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়, যা পোশাক বা উর্দিধারী পুলিশ কর্মকর্তাদের চেয়ে ভিন্ন।

CamScanner

অপরদিকে সমালোচকরা বলেন যে, কোনোরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা বা পুলিশ বিভাগে চাকরি না করে একজন গোয়েন্দা সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হতে পারেন না। বরঞ্চ আদর্শ পুলিশী কার্যক্রমে তাদের কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টিসহ নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়। পোশাক পরিহিত পুলিশ সহকর্মীদের সাথে কাজ করতে গিয়ে তারা কাজের পরিবেশকে আরো কঠিন ও দুরূহ করে তোলেন।

গোয়েন্দাকে তার অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। তন্মধ্যে -তদন্তকার্যে নীতিবোধ, চর্চা এবং প্রক্রিয়া রয়েছে। সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি; অপরাধ আইন ও প্রক্রিয়া, প্রচলিত আইনে গ্রেফতার, অনুসন্ধান ও মালামাল জব্দ, ওয়ারেন্ট ও প্রমাণ; পুলিশ বিভাগে রক্ষিত নথিপত্র ও প্রতিবেদন সম্পর্কে ধারণা; আদালতে প্রমাণ বা স্বাক্ষ্য হিসেবে পুলিশ বিভাগের নীতিমালা, চর্চা ও উদ্দেশ্য; এবং পুলিশ বিভাগের পদ্ধতি ও স্বাক্ষ্য অন্যতম। সাধারণত উভয় ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্মকতা এবং গোয়েন্দাকে প্রশ্নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু গোয়েন্দাকে আরো বেশি প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি ও মোকাবিলা করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়।

বেসরকারি পর্যায়ে গোয়েন্দাকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধনের মাধ্যমে অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু এর জন্যে তাকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং অপরাধীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কেও সম্যক অবগত হতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষ শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণ, সঠিকভাবে ও দক্ষতার সাথে অস্ত্র পরিচালনাসহ অভিজ্ঞতার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষিত গোয়েন্দাদেরকে একত্রিত করে গঠিত হয় 'গোয়েন্দা শাখা'। যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে সামরিক বাহিনী কিংবা পুলিশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়। এর নিয়ন্ত্রণও থাকে সামরিক বাহিনী কিংবা পুলিশের হাতে। অভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এ শাখার ভূমিকা অপরিসীম। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্যান্য

দল কিংবা বিভাগের তুলনায় সবচেয়ে বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয় গোয়েন্দা শাখাকে।

লুক্কায়িত, অমীমাংসিত বা গোপনীয় অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে গোয়েন্দা শাখাকে বিশেষায়িত করে অনেকগুলো স্তরে বিভাজন করা হয়। সেগুলো হলো- নরহত্যা; দস্যুতা বা ডাকাতি; সংগঠিত অপরাধ; নিখোঁজ; প্রতারণা; মাদকদ্রব্য; যৌন হয়রানী; কম্পিউটার অপরাধ; অভ্যন্তরীণ সহিংসতা; নজরদারি ইত্যাদি। আধুনিককালে কাউন্টার টেররিজম বা সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা বা জঙ্গিবাদ দমন, ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ট্যাক্স ইত্যাদি।

৫. গোয়েন্দারা কী কাজ করেন?

ক. মাঠ পর্যায়ে

গোয়েন্দা কার্য পরিচালনার জন্য একজন গোয়েন্দাকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক ও বিস্তৃত চিন্তাধারার অধিকারী হতে হয়। নিত্য-নতুন কলা-কৌশল, ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তাকে। এ ছাড়াও অধিকাংশ মামলা কার্য সম্পূর্ণকরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর তদন্তকার্য ও প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষীদের উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ওপর নির্ভর করতে হয়, যা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তদন্তকার্য পরিচালনার পাশাপাশি যদি গোয়েন্দা কার্যক্রমে চরদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হয়, তা হলে অতি দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। চরগণ ব্যক্তির সাথে নিরবচ্ছিন্ন কিংবা মাঝে মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। গোয়েন্দারা পরবর্তী সময়ে চরদের কাছ তাঁদের মধ্যকার কথাবার্তা থেকে এ সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে জানেন ও তথ্য সংগ্রহ করেন; কিন্তু তিনি তা কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন না। পরবর্তী সময়ে গোয়েন্দারা পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ এবং তথ্য সংরক্ষণের ওপরই সম্ভাব্য ব্যক্তি বা ইপ্সিত বস্তুর অবস্থান নিশ্চিত করেন।

ফৌজদারি তদন্তের কার্যকলাপগুলো খতিয়ে দেখতে বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে পুলিশ। ফৌজদারি তদন্তে দ্রুতবেগে গাড়ি চালানো, মাতলামি করে গাড়ি চালানো, চুরি-ছিনতাই, হত্যাকাণ্ড,

জালিয়াতি, প্রতারণা ইত্যাদি বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত। যখন পুলিশ তদন্ত কার্যের সমাপণী ঘোষণা করেন, তখন তারা কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন।

কোনো কারণে ফৌজদারি তদন্তে একজন গোয়েন্দার মনে যদি সন্দেহজনক কোনো কিছুর উদ্রেক হয়, তা হলে তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর মাধ্যমেই তিনি আদালতের সম্মুখে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন।

খ. ময়না তদন্ত

সাধারণত মৃতদেহের শারীরিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য জানার জন্য ময়না তদন্তের প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায়ই ময়না তদন্তের ব্যবস্থা রয়েছে। ময়না তদন্তের মাধ্যমেও একটি মামলা সুচারুরূপে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব, যা গোয়েন্দাদের কার্যক্রম এবং তদন্তের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ও হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়। আইন অনুযায়ী 'ফরেনসিক বিজ্ঞান' এমন একটি পদ্ধতি, যা বিস্তারিত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে যেকোনো ব্যক্তির প্রশ্নের ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করা সম্ভব হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে অপরাধ অথবা দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

গ. অতীত ইতিহাস

অনেক ক্ষেত্রে গোয়েন্দারা সরকারি এবং ব্যক্তিগত নথিপত্র ঘেঁটে অপরাধ বা রহস্য সম্পর্কীয় বিষয়কে পটভূমিকায় নিয়ে ও তথ্য সংযোগ করে অগ্রসর হন। পুলিশ বাহিনীর গোয়েন্দারা শুধু নথিপত্র কিংবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাঁপের সাহায্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করে থাকেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ গুরুতর অপরাধী থেকে শুরু করে সামান্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্যেও 'ব্যক্তিগত নথি' খুলে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। এর ফলে গোয়েন্দারা অপরাধীর গ্রেফতার হওয়া সংক্রান্ত বিবরণ, ব্যক্তিগত তথ্যাবলি, ছবি ইত্যাদির সাহায্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তির গতিবিধি অনুসন্ধানসহ নজরদারি করতে পারেন। এ ছাড়াও অপরাধী

যদি মোটর সাইকেলের মালিক হন, তাহলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের তথ্যাবলিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ওয়ারেন্ট সাথে নিয়ে পুলিশের গোয়েন্দারা ক্রেডিট কার্ডের রেকর্ড এবং ব্যাংক বিবৃতির মতো বিষয়গুলোও অনুসন্ধান করে থাকেন। হোটেলের নিবন্ধন তথ্য, ক্রেডিট প্রতিবেদন, আনসার মেশিনের বার্তা এবং ফোনের কথোপকথনও এর অন্তর্ভুক্ত।

৬. গোয়েন্দাদের অবদান

দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে গোয়েন্দা বা গোয়েন্দা দল প্রয়োজনে জীবনবাজি রেখে নিজ রাষ্ট্রের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় অন্য দেশে অবস্থান করেন যা আইনের পরিভাষায় 'গোয়েন্দাগিরি' বা 'গুপ্তচরবৃত্তি' নামে পরিচিত।

আধুনিক বিশ্বে গোয়েন্দা তৎপরতার ওপরই একটি দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে। কখনো তারা সাফল্য পান ও নিজ রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় তথ্য কিংবা উপকরণ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রেরণ দেশের স্বার্থ রক্ষা করে থাকেন। আবার ব্যর্থতায় তাদের জীবনহানীও ঘটে কিংবা কারাগারে ঠাঁই হয় বছরের পর বছর ধরে। অনেক সময় গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে দুদেশের মধ্যকার পারস্পরিক চমৎকার ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হতে দেখা যায়। সৌভাগ্যবশত দেশগুলোর পারস্পরিক বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় কদাচিৎ কেউ কেউ মুক্তি লাভ করেন।

গোয়েন্দা বাহিনীর অবদানের কারণেই অনেক সময় একটি ক্ষুদ্র দেশ বিশ্বের বুকে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে। যেমন, ইসরাঈল। আবার গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার কারণে একটি দেশ বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব দরবারে নতজানু হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। যেমন, সৌদি আরব, বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ। গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যর্থতার কারণে একটি দেশের পরাশক্তি হবার স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হয়ে যেতে পারে, এমনকি দেশের অস্তিত্বই ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে। যেমন, ইরাক, লিবিয়া। আবার গোয়েন্দাদের চক্রান্তের কারণে একটি দেশ

CamScanner

কখনো জনগণের হয় না, হয় সামরিক বাহিনীর। দেশের ভেতর দেশ, সরকারের ভেতর সরকার কায়েম করে সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। যেমন, পাকিস্তান।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে, দেশ ব্যর্থ হওয়া মানেই গোয়েন্দা ব্যর্থতা নয়। অনেক দেশ ধ্বংসের মুখে পড়ে নিজেদের রাজনৈতিক নেতাদের অযোগ্যতা, দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মানসিকতা ও শিক্ষাগত অবস্থার কারণে।

৭. গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণ

গোয়েন্দাদের দক্ষ করে তুলতে সাধারণত নিজ দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়া অনেক সময় প্রশিক্ষণের জন্য বাছাইকৃত জনশক্তিকে উন্নত দেশে প্রেরণ করা হয়। অপরাধী সনাক্তকরণে তারা বহুবিধ নিত্য-নতুন কৌশল ও পন্থা গ্রহণ করেন। তবে আধুনিককালে প্রশিক্ষণের ধরন বদলেছে। দেশভিত্তিক অপরাধের ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রযুক্তির বহুমুখী বিকাশের যুগে সে প্রশিক্ষণও ভিন্নতর অদ্ভুত মাত্রা গ্রহণ করেছে। যেমনটি ব্রিটেনের দি টেলিগ্রাফ পত্রিকার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। প্রত্রিকাটিতে প্রতিবেদক টিম কামিং যুক্তরাষ্ট্রের 'সিআইএ', ব্রিটেনের 'এমআইসিক্স', চীনের 'এমএসএস', ইজরাঈলের 'মোসাদ', ভারতের 'র', পাকিস্তানের 'আইএসআই' এবং জার্মানি ও ফ্রান্সের গোয়েন্দাবাহিনীগুলো কীভাবে প্রশিক্ষণ দেয় তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরে।

প্রতিবেদনে ব্রিটেনের এমআইসিক্স বাহিনীর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়, ..they have used Xbox live gaming data to target prospective employees. অর্থাৎ, তারা প্রশিক্ষণার্থী গোয়েন্দাদের কম্পিউটারে গেম খেলার মতো এক্সবক্স লাইভ গেম খেলতে দেবে। সেখানকার পরফরমেন্সই তাদের মেধা নির্ণয় করবে। যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএর ট্রেনিং সম্পর্কে বলা হয়, দেশটির ভার্জিনিয়া অঞ্চলের লেংলেই

এলাকায় একটি আবাসিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে দেড় লাখ গোয়েন্দাসংশ্লিষ্ট লোক বসবাস করে। তো প্রশিক্ষণার্থীদের সেখানে গিয়ে থাকতে হবে। যার প্রতিবেশীদের খুব কমই ভালো প্রতিবেশী হবে। সেখানে থাকতে হলে, গ্রাজুয়েট পাশ, আঠারোর বেশি বয়স, নেশাপানির অভ্যাসমুক্ত এবং এক বছর থাকার মানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে। সাইন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা বিজনেস ডিপার্টমেন্টর ছাত্র হতে হবে।

চীনের এমএসএস সম্পর্কে বলা হয়, এমএসএস মূলত সাবেক রাশিয়ার কেজিবির আদলে গঠিত। এতে সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী কূটনৈতিক যেকোনো পেশার যেকোনো বয়সের মানুষ গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ নিতে পারে। পুরো চীনে প্রায় ৮টি জাতীয় গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

ইসরাঈলের মোসাদ সম্পর্কে বলা হয়, মোসাদ গোয়েন্দা জগতের শীর্ষে অবস্থান করছে। তারা তাদের ওয়েবসাইটে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্যই গোয়েন্দা সংযুক্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ রেখেছে। ইসরায়েলের হার্জিলিয়া শহরের মিডরাশাহ মোসাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র। তিন বছরের প্রশিক্ষণ দেয় তারা সেখানে। প্রশিক্ষণ শেষে শত প্রতিকূলতা মাড়িয়ে টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করতে শিখে যাবেন যে কেউ।

ভারতের 'র' সম্পর্কে বলা হয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বশস্ত্র বাহিনী হতে সদস্য সংগ্রহ করে ১০ দিনের প্রাথমিক বাছাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে তারা। এরপর সেখান থেকে তিন বছর মেয়াদি উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয় 'র'।

পাকিস্তান সম্পর্কে বলা হয়, পাকিস্তানের আইএসআই দেশের ভেতর আরেক দেশ নামে পরিচিত। সামরিক বাহিনীর স্বার্থ রক্ষা তাদের প্রধান কাজ। রাজধানী ইসলামাবাদে ডিফেন্স সার্ভিস ইন্টলিজেন্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬ মাসের কোর্স রয়েছে। কোর্সগুলোর মেজর বা ততোধিক পদগুলো সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্যই বরাদ্দ। অসামরিক লোকেরা বিজ্ঞাপনভিত্তিক বিভিন্ন পদে কাজ করতে পারে।

CamScanner

৮. কেন গোয়েন্দাগিরি প্রয়োজন?

এ প্রসঙ্গে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সাবেক প্রধান বি রমন তার বিখ্যাত The Kaoboys & R&AW: Down Memory Lane গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেন, "ঈড়াবৎঃ action capability is an indispensable tool for any state having external adversaries. Its perpose is not just collection of intelligence, but the protection of national ineterests and .....which have to be secret and deniable. Others dont admit even its existence.

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈরীতা রয়েছে এমন যেকোনো দেশে পরিচয় গোপন রেখে কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এটি শুধু গোয়েন্দা তথ্যের জন্য প্রয়োজন হয় এমনটি নয়। অধিকন্তু জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধা-কূটনৈতিক ও আধা-সামরিক ধরনের প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও এর প্রয়োজন রয়েছে। গতানুগতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক বা সামরিক উপায়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ বা জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না মনে হলে অথবা এ ধরনের গতানুগতিক উপায় কর্যকর হবে না বলে মনে হলে সেক্ষেত্রে কোনো কোনো দেশ গোপন কার্যক্রমের আশ্রয় নেয়। প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানোর জন্য যেকোনো গোয়েন্দা সংস্থা গোপন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মতো সক্ষমতা অর্জন করে। কোনো কোনো দেশের সরকার তাদের গোয়েন্দা সংস্থার এ ধরনের কার্যক্রম চালানোর ক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার করে। তবে গোপন রাখা বা অস্বীকার করার প্রয়োজন রয়েছে এমন কাজের প্রকাশ তারা বিস্তারিতভাবে করেন না। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র এ ধরনের কার্যক্রমের অস্তিত্বই স্বীকার করে না।

৯. শত্রুদেশের গোয়েন্দা যখন বন্ধু

দুই দেশের গোয়েন্দা বাহিনী বন্ধু হয় কি? এর উত্তরে সাধারণ যে কেউ বলবে, না, কোনো দিনই না! শত্রুদেশের গোয়েন্দা কখনই বন্ধু হতে

পারে না। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন রকম। দুই শত্রুদেশের গোয়েন্দা বাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যেতে পারে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। আবার বন্ধুপ্রতীম দুই দেশের গোয়েন্দা বাহিনী একে অপরের সামরিক-অসামরিক ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকলেও সেখানে গোপনে চলতে পারে কঠিন শত্রুতা। এরকম বক্তব্যই উঠে এসেছে ভারতের দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সাবেক প্রধান বি রমন এর বিখ্যাত The Kaoboys & RAW: Down Memory Lane গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে,

...After the chinese communists extended their control over yunnan post-1949, the surviving remnants of the anti-communist Kachin and shan states of Buma and set up bases there-Beijing ..... Chinese intelligence for preventing a break-up of West Pakistan by India and with the Indian intelligence for preventing a possible Chinese take-over of North Burma. This may appear strange and incomprehensible, but such things are normal in the intelligence profession.

ভারত ও মার্কিন গোয়েন্দাদের উদ্বেগ ছিল, চীনারা বার্মা সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উত্তর বার্মার ওপর চীনা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে কি না। বাস্তবে সেটি ঘটেনি। ১৯৭০-এর দশকে কোমিনতাং সেনারা তাইওয়ানে চলে যাওয়ার পর বার্মা এলাকা থেকে চীনা সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

চীনের ব্যাপারে সাধারণ উদ্বেগ উত্তর বার্মায় 'র'-এর সাথে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর এ বিষয়ে যৌথ কাজের সম্পর্ক সৃষ্টি করে। যে কেউ দেখে বিস্মিত হতে পারেন যে, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ভারতের পাঞ্জাবে আইএসআই'র সাথে মিলে খালিস্থান আন্দোলনকে সাহায্য করছে আবার ভারতের পাকিস্তান ভাঙার চেষ্টা ঠেকাতে কাজ করছে চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের সাথে। আর সেই সিআইএ উত্তর বার্মায় সম্ভাব্য চীনা নিয়ন্ত্রণ ঠেকাতে কাজ করছে ভারতীয়

CamScanner

গোয়েন্দাদের সাথে। দৃশ্যত এটাকে মনে হতে পারে এক অদ্ভুত এবং বিচিত্র ঘটনা তবে গোয়েন্দা পেশায় এ এক স্বাভাবিক দৃশ্যপট।

১০. বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা

কিশোর, তরুণদেরকে উদ্দীপ্ত করতে গোয়েন্দা(দের) রোমাঞ্চকর অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে ঘিরে মুদ্রণ আকারে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য গল্প উপন্যাস কিংবা সিরিজ বই। অনেক খ্যাতিমান লেখক, প্রকাশক বিভিন্নভাবে গোয়েন্দাকাহিনি প্রকাশ করে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছেন। সাধারণত এতে তাদের সাফল্যগাঁথাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দলগত কিংবা একক পর্যায়ে গোয়েন্দাদেরকে ঘিরে রচিত হয়েছে- তিন গোয়েন্দা, সাইমুম সিরিজ, এমিলের গোয়েন্দা দল ইত্যাদি গোয়েন্দা কাহিনি সিরিজ। আরো বেশকিছু গোয়েন্দা চরিত্র রয়েছে যেগুলো বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিন গোয়েন্দা

তিন গোয়েন্দা বাংলাদেশের সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় একটি কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি সিরিজ। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে শুরু হয় এই সিরিজটি। রকিব হাসান এই বিখ্যাত সিরিজটি লেখার কাজ শুরু করেন। রকিব হাসান একটানা ১৬০টি কাহিনি লেখেন। পরবর্তী সময়ে শামসুদ্দীন নওয়াব এটি লেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শামসুদ্দীন নওয়াব মূলত একজন ঘোস্ট বা ভৌতিক কাহিনি লেখক। 'তিন গোয়েন্দা' তিনজন কিশোর গোয়েন্দার গল্প। তিন গোয়েন্দা পুরোপুরি মৌলিক কাহিনি নয়। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গোয়েন্দা কাহিনির ছায়া অবলম্বনে রচিত। বিশেষ করে প্রথম দিককার বইগুলো রবার্ট আর্থারের ইংরেজি সিরিজ "থ্রি ইনভেস্টিগেটরস" অবলম্বনে রচিত। আবার কিছু বই এনিড ব্লাইটনের "ফেমাস ফাইভ" অবলম্বনে রচিত। এই তিনজন গোয়েন্দাকে ঘিরেই 'তিন গোয়েন্দা'র শোভন প্রকাশনা বের হয় তিন বন্ধু নামে প্রজাপতি প্রকাশন থেকে। তিন গোয়েন্দারা যেভাবে নিজেদের পরিচয় দেয়:

হ্যাল্লো, কিশোর বন্ধুরা-

আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।

জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,

হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি, আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালি। থাকি চাচা-চাচির কাছে।

দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,

আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,

রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।

একই ক্লাসে পড়ি আমরা।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে

পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-

এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

বর্তমানে রকিব হাসান অনিয়মিতভাবে সেবা প্রকাশনী থেকে তিন গোয়েন্দা লিখছেন। তিন গোয়েন্দার বাস প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস-এর রকি বীচে। কিশোর পাশা বাঙালি, ছোটবেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মা মারা যাবার পর হতে চাচা রাশেদ পাশা ও মেরী চাচির কাছে বড় হয়। রবিন মিলফোর্ড বইপাগল আমেরিকান আর মুসা আমান দলের পেশীশক্তি, আমেরিকান-আফ্রিকান। পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে পুরনো এক মোবাইল হোমে তাদের হেডকোয়ার্টার। তিন গোয়েন্দার বইতে আরো দেখা মেলে জর্জিনা

পার্কার, কুকুর রাফি, চিরশত্রু শুটকি টেরি, হলিউড মুভি পরিচালক ডেভিড ক্রিস্টোফার, গোয়েন্দা ভিক্টর সাইমন, রাঁধুনী নিসান জাং কিম, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, উমর শেরিফ, ফগর‍্যাম্পারকটের।

ফেলুদা

সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট কিংবদন্তি গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা ওরফে প্রদোষচন্দ্র মিত্র। ফেলুদার প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মোত ৩৫টি সম্পূর্ণ ও ৪টি অসম্পুর্ণ ফেলুদা কাহিনি বের হয়েছে। ফেলুদা কলকাতার ২১ রজনী সেন রোডে বাস করে। শার্লক হোমসের বিশাল ভক্ত ফেলুদা শারীরিক শক্তি বা অস্ত্রের পরিবর্তে অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বিরল বিশ্লেষণী দক্ষতার মাধ্যমে রহস্য সমাধান করতে পছন্দ করে। ফেলুদার ট্রেডমার্ক চারমিনার সিগারেট। ফেলুদার সঙ্গী তোপসে ওরফে তপেশরঞ্জন মিত্র, যে কিনা ফেলুদার খুড়তুতো ভাই, সে ফেলুদার সব অভিযান লিপিবদ্ধ করে। ফেলুদার বন্ধু জনপ্রিয় লেখক লালমোহনবাবু 'জটায়ু' শিরোনামে রহস্য উপন্যাস লেখেন। এ ছাড়াও ফেলুদার বইতে দেখা পাওয়া যায় সিধুজ্যাঠা, মগনলাল মেঘরাজের। ফেলুদার কাহিনি হতে বই, মুভি, টিভি সিরিজ, টেলিফিল্ম নির্মিত হয়েছে।

সাইমুম সিরিজ

বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক রচনা করেন সাইমুম সিরিজ। ৮০-এর দশকে শুরু হওয়া সাইমুম সিরিজ এখন সর্বশেষ ৬১ পর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামি মূল্যবোধে উজ্জীবিত প্রায় প্রতিটি পরিবারের ছেলেমেয়েরাই এ দুর্দান্ত গল্প সিরিজের সাথে পরিচিত। গল্পের মূল নায়ক আহমদ মূসা। ইহুদি-খ্রিষ্টান তথা জায়নবাদী পৃথিবীর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে করা নানা কারসাজি, চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয় আহমদ মূসা। এক দুর্ধর্ষ গোয়েন্দার মতোই সে ঘটনার পরম্পরা বুঝে ফেলে। এগিয়ে যায় অসীম সাহসে। এশিয়া, ইউরোপ

আমেরকিা কিংবা আফ্রিকায়। শহর থেকে নগরে। সর্বত্র তার বুদ্ধিদীপ্ত, চৌকশ উপস্থিতি। সবকিছুই তার নখদর্পণে।

আহমদ মূসা চরিত্রটি কীভাবে আপনার মাথায় এলো? এক পাঠকের এমন প্রশ্নে লেখক 'দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক' আবুল আসাদ বলেন, 'দুই নবির নামানুসারে আমি আহমদ মূসার নামকরণ করেছি। ইসলামের ইতিহাস এবং সমসাময়িক পরিস্থিতি সামনে রেখে এমন একটা চরিত্রের কথা ভেবেছি, যার আদর্শ, নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম শুধু মুসলমান নয়, পশ্চিমা সভ্যতার শীর্ষ মহলকেও প্রভাবিত করবে। এভাবেই আমি চেয়েছি ইসলামের আদর্শবাদ সকল অপবাদ, অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি অতিক্রম করে প্রাচ্য-প্রাতীচ্য সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, এই ভিশনই আহমদ মূসার চরিত্র সৃষ্টি।' আরেক পাঠকের প্রশ্ন ছিল, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের মুসলমানদের এই নাজুক পরিস্থিতিতে একজন আহমদ মূসার জন্ম কীভাবে সম্ভব? উত্তরে আবুল আসাদ বলেন, 'ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সবার অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাওয়াই সব সময়ের সবচেয়ে বড় কাজ। এই যাত্রাপথেই যেমন হযরত উমর রা. ও হযরত খালেদ রা.-এর দেখা মিলেছে, তেমনি আহমদ মূসাদের দেখা মিলবে।' ১৯৭৬ সালে 'অপারেশন তেলআবিব-১'-এর মাধ্যমে এই সিরিজের সূচনা করেন লেখক। বর্তমানে প্রকাশিত সাইমুম সিরিজের বইগুলো... ১. অপারেশন তেলআবিব-১, ২. অপারেশন তেলআবিব-২, ৩. মিন্দানাওয়ের বন্দি, ৪. পামিরের আর্তনাদ, ৫. রক্তাক্ত পামির, ৬. রক্ত সাগর পেরিয়ে, ৭. তিয়েনশানের ওপারে, ৮. সিংকিয়াং থেকে ককেশাস, ৯. ককেশাসের পাহাড়ে, ১০. বলকানের কান্না, ১১. দানিয়ুবের দেশে, ১২. কর্ডোভার অশ্রু, ১৩. আন্দালুসিয়ার প্রান্তরে, ১৪. গোয়াদেলকুইভারে নতুন স্রোত, ১৫. আবার সিংকিয়াং, ১৬. মধ্য এশিয়ায় কালো মেঘ, ১৭. ব্ল্যাক ক্রসের কবলে, ১৮. ব্ল্যাক ক্রসের মুখোমুখি, ১৯. ক্রস এবং ক্রিসেন্ট, ২০. অন্ধকার আফ্রিকায়, ২১. কঙ্গোর কালো বুকে ২২. অদৃশ্য আতঙ্ক ২৩. রাজচক্র ২৪. জারের গুপ্তধন ২৫. আটলান্টিকের ওপারে ২৬. ক্যারিবিয়ানের দ্বীপদেশে ২৭. মিসিসিপির তীরে ২৮. আমেরিকার এক অন্ধকারে ২৯. আমেরিকায়

CamScanner

আরেক যুদ্ধ ৩০. এক নিউ ওয়ার্ল্ড, ৩১. ফ্রি আমেরিকা, ৩২. অক্টোপাশের বিদায়, ৩৩. সুরিনামের সংকটে, ৩৪. সুরিনামে মাফিয়া, ৩৫. নতুন গুলাগ, ৩৬. গুলাগ অভিযান, ৩৭. গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার, ৩৮. ধ্বংস টাওয়ার, ৩৯. ধ্বংস টাওয়ারের নীচে, ৪০. কালাপানির আন্দামানে, ৪১. আন্দামান ষড়যন্ত্র, ৪২. ডুবো পাহাড়, ৪৩. পাত্তানীর সবুজ অরণ্যে, ৪৪. ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস, ৪৫. বসফরাসের আহ্বান, ৪৬. রোমেলি দুর্গে, ৪৭. বসফরাসে বিস্ফোরণ, ৪৮. মাউন্ট আরারাতের আড়ালে, ৪৯. বিপদে আনাতোলিয়া, ৫০. একটি দ্বীপের সন্ধানে, ৫১. প্যাসেফিকের ভয়ংকর দ্বীপে, ৫২. ক্লোন ষড়যন্ত্র, ৫৩. রাইন থেকে অ্যারেন্ডসী, ৫৪. আবার আমেরিকায়, ৫৫. ডেথ ভ্যালি, ৫৬. আর্মেনিয়া সীমান্তে, ৫৭. আতংকের দিভিন উপত্যকা, ৫৮. রত্ন দ্বীপ, ৫৯. বিপন্ন রত্নদ্বীপ, ৬০. উইঘুরের হৃদয়ে, ৬১. ড্রাগন ভয়ংকর।

মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেনের সৃষ্ট চরিত্র মাসুদ রানা- বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্ট। গুপ্তচরবৃত্তি তার পেশা, কখনো কখনো পৃথিবীকে বাঁচানোর অথবা বন্ধুকে রক্ষার মিশনেও তাকে দেখা যায়। লেখকের ভাষায় কোমলে-কঠোরে মেশানো, টানে সবাইকে কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না। মাসুদ রানা চিরতরুণ। সাংকেতিক নাম এম আর-নাইন। তার পরিচালিত একটি গোয়েন্দা সংস্থা আছে, নাম "রানা এজেন্সী"। মাসুদ রানার পিতা জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরী। ইয়ান ফ্লেমিং-এর জেমস বন্ডের আদলে তৈরি মাসুদ রানা। মাসুদ রানার প্রথম বই "ধ্বংস পাহাড়" ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। সেই যে শুরু, এখন পর্যন্ত চার শতাধিক বই বেরিয়েছে। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইগুলোর কয়েকটি বাদে বাকি প্রায় সব বিদেশি বই বা মুভির ছায়া অবলম্বনে রচিত। মৌলিক বইগুলো হলো- ধ্বংস পাহাড়, ভারতনাট্যম, হ্যাকার, এলিস্টেয়ার ম্যাকলীন, রবার্ট লুডলাম, জেমস হেডলী চেয, উইলবার স্মিথ, ক্লাইভ কাসলার, ফ্রেডরিক ফরসাইথ- এমন বিখ্যাত লেখকদের বইয়ের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছে বইগুলো। বইতে আরো যেসব

পরিচিত চরিত্রের দেখা মেলে তারা হলো: মেজর জেনারেল রাহাত খান, সোহেল, সোহানা, রুপা, গিলটি মিয়া, বিজ্ঞানী কবির চৌধুরী। মাসুদ রানা অবলম্বনে চলচ্চিত্র এবং নাটকও নির্মিত হয়েছে।

দস্যু বনহুর

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক রোমেনা আফাজের চরিত্র 'দস্যু বনহুর' নিয়ে মোট ১৩৬টি গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। দস্যু সর্দার কালু খাঁ মনিরকে কুড়িয়ে পান ও তাকে পরবর্তী সময়ে দস্যু বনহুর রূপে গড়ে তোলেন। বনহুর যেমন গরিবের বন্ধু তেমনি সন্ত্রাসীদের শত্রু। অত্যাচারীদের সম্পদ লুটে নিয়ে ভাগ করে দেয় বঞ্চিতদের মাঝে। সে অশ্বপৃষ্ঠে জঙ্গলে চলাচল করে। মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপি, রুমালে ঢেকে রাখা মুখ। বনহুরের সহযোদ্ধা রহমান ও কায়েস। তার দুইজন স্ত্রী- মনিরা ও নুরী। মোট আটটি সমগ্রে সালমা বুক ডিপো প্রকাশিত দস্যু বনহুরের সবগুলো কাহিনি পাওয়া যায়।

মেজর রাহাত

মাসুদ রানার বস যার কথা ভাবলেই রানার বুক ধড়ফড় করে, কাঁচাপাকা ভূর গুরুগম্ভীর চরিত্র মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে নিয়েও সেবা প্রকাশনী থেকে বই প্রকাশিত হয়েছে। কাজী আনোয়ার হোসেন, নিয়াজ মোরশেদ, রওশন জামিল, ইফতেখার আমিন প্রমুখের লেখা এই সিরিজটি অনিয়মিতভাবে ১৯৮২ সাল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলো বই বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের ওয়ার থ্রিলার থেকে ছায়া নিয়ে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে 'ওয়ান্ডার বয়' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া নির্ভীক এক বাঙালি মেজর রাহাত। স্ট্রাইক ফোর্সের নেতৃত্ব দানকারী এই নির্ভীক, অকুতোভয় মেজর একের পর এক শত্রুপক্ষের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়। নব্বইয়ের দশকে সিরিজের শেষ বইটি লেখা হয়েছিল।

কুয়াশা

সুলেখক কাজী আনোয়ার হোসেনের সৃষ্ট চরিত্র কুয়াশা। কুয়াশা-১ নামে এই সিরিজের প্রথম বইটি সেবা প্রকাশনী হতে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত

হয়। কুয়াশা বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। কুয়াশার বাড়ি কুষ্টিয়াতে। সতেরো বছর বয়সে কুয়াশা জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ব্যাভেনবার্গের সাথে বাংলাদেশ ছাড়ে। পনেরো বছর পর সে আবার দেশে ফিরে আসে তার গোপন গবেষণা চালানোর জন্য। তার একমাত্র ছোট বোন মহুয়া। মানবকল্যাণের জন্য কুয়াশা গবেষণা করে আর এর টাকা জোগাড় করতে সে অবৈধ পথ বেছে নিতেও দ্বিধাবোধ করে না। এজন্য কুয়াশা আইনের চোখে অপরাধী, একজন ফেরারি আসামি। কুয়াশার বইগুলোতে অন্যান্য পরিচিত চরিত্র হলো: শখের গোয়েন্দা শহীদ, কামাল, ডি কস্টা, গফুর, মি. সিম্পসন, লিনা, রাসেল, ড. ওয়াই। কুয়াশা সিরিজের প্রকাশনা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

ব্যোমকেশ বক্সী

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গোয়েন্দা চরিত্র 'ব্যোমকেশ বক্সী'র স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে ১৯৩২ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মোট ৩৩টি কাহিনি লিখেছেন। ব্যোমকেশের প্রথম বই 'সত্যান্বেষী'। ব্যোমকেশের আছে অনবদ্য বিশ্লেষণী দক্ষতা। ধারালো নাক, লম্বা চেহারা, নাতিস্থূল অবয়বের অধিকারী ব্যোমকেশ শুধু বুদ্ধি দিয়ে যাবতীয় জটিল রহস্যের জট খোলে। সে পুলিশের চাকরি করে না, শুধু খেয়ালের বশে শখ করে সত্যান্বেষী হয়ে ওঠে। ব্যোমকেশ স্বল্পভাষী, বাইরে থেকে দেখে তার ভেতরের জ্ঞানের গভীরতা বোঝা যায় না। বন্ধু অজিত ব্যোমকেশের সহযোগী। সত্যবতী ব্যোমকেশের স্ত্রী, এই কৃশাঙ্গীর সাথে একটি খুনের মামলা তদন্ত করতে গিয়ে তার পরিচয়। ব্যোমকেশের সবগুলো কাহিনি আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'ব্যোমকেশ সমগ্র'-তে পাওয়া যায়। ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে টিভি সিরিজ, মুভি ও রেডিও অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে।

টেনিদা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্র টেনিদা ওরফে ভজহরি মুখার্জি। কলকাতার পটলডাঙায় টেনিদার বাস। টেনিদা গল্পের রাজা, ফুটবল

মাঠের সেরা খেলোয়াড়, ক্রিকেট খেলার ক্যাপ্টেন। লোকের বিপদে সবার আগে সে উপস্থিত হয়ে যায়। তার বিখ্যাত সংলাপ- "ডি-লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক"। মৈনাক পর্বতের মতো তার নাক। টেনিদার সঙ্গী প্যালারাম তার কাহিনিগুলো বর্ণনা করে। হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় কথা বলে আর ক্যাবলা চারজনের মাঝে সবচেয়ে চালাক। টেনিদা তার টিম নিয়ে বিভিন্ন অভিযানে যায় এবং রহস্যের সমাধান করে। এ ছাড়াও টেনিদার বীরত্বের অতিরঞ্জিত গল্প নিয়েও কিছু বই লেখা হয়েছে। টেনিদাকে নিয়ে লেখা মোট ৫টি উপন্যাস, ৩২টি গল্প আর ১টি নাটিকা সংকলিত করে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে টেনিদা সমগ্র। টেনিদার কাহিনি নিয়ে কমিকস, মুভি ও অ্যানিমেটেড সিরিজ নির্মিত হয়েছে।

ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জনপ্রিয় চরিত্র ঘনাদা ওরফে ঘনশ্যাম দাস। ঘনাদার প্রথম গল্প 'মশা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ঘনাদার মোট পনেরোটি বই বের হয়, এই বইগুলো একত্রে আনন্দ পাবলিশার্স হতে ঘনাদা সমগ্র ১ ও ২ নামে প্রকাশিত হয়। ঘনাদার বইতে সরাসরি অভিযানের দেখা পাওয়া যায় না বরং তাঁর মেসের প্রতিবেশী চার যুবককে নিজের জীবনের নানা অভিযান সম্পর্কে অবিশ্বাস্য ও আজগুবি গল্প মুখে মুখে বানিয়ে শোনান। আবার কিছু গল্প কলকাতা লেকের পাড়ে বসেও বলতে দেখা যায়। ঘনাদার গল্পগুলি বানানো হলেও এর অধিকাংশ তথ্যই বাস্তবতার ভিত্তিতে গৃহীত। ঘনাদার বসবাস ৭২ নং বনমালী নস্কর লেনের একটি মেসে। মেসে তাঁর সঙ্গী আরো চারজন বাসিন্দা শিবু, শিশির, গৌর আর সুধীর। ঘনাদা গল্পগুলোতে তিনি নিজেই নায়ক। গল্পের ঘনাদা বুদ্ধিতে ও শক্তিতে অপরাজেয়। ঘনাদা ভোজনরসিকও বটে। ঘনাদার গল্পে রহস্য-রোমাঞ্চ-ইতিহাস-ঐতিহ্য-বিজ্ঞান কল্পকাহিনি ফুটে উঠেছে। ঘনাদার কাহিনিতে আরো যাদের দেখা পাওয়া যায় তারা হলো: রাঁধুনি রামভুজ, বানোয়াড়ী, বাপী দত্ত, সুশীল চাকীর।

CamScanner

প্রফেসর শঙ্কু

সত্যজিৎ রায়ের চরিত্র স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর প্রথম কাহিনি 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরী' ১৯৬১ সালে সন্দেশ পত্রিকায় বের হয়। শঙ্কু একজন পদার্থবিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক। তিনি ৬৯টি ভাষা জানেন। অকুতোভয়, আত্মভোলা শঙ্কুর কর্মস্থল বিহারের গিরিডিতে। শঙ্কু অবিবাহিত। বিজ্ঞানী হিসেবেও শঙ্কুর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তাঁর ৭২টি আবিষ্কারের মাঝে আছে: মিরাকিউরল, ম্যাফগান, ম্যাঙ্গোরেঞ্জ, অ্যানাইহিলিন, নার্ভিগার, অমনিস্কোপ, ক্যামেরাপিত ইত্যাদি। শঙ্কু দেশপ্রেমিক, পোষা বিড়াল নিউটন আর চাকর প্রহ্লাদ তাঁর নিত্যসঙ্গী। এ ছাড়াও দেখা মেলে প্রতিবেশী অবিনাশ চট্টোপাধ্যায় ও হিতাকাঙ্ক্ষী নকুড়বাবুর। সাহারা মরুভূমি, সমুদ্রের তলদেশ, মঙ্গল গ্রহ, ইংল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, স্পেনসহ আরো জায়গাজুড়ে তাঁর অভিযান পরিচালনা করেছেন। সত্যজিৎ রায় শঙ্কুকে নিয়ে ১৯৬১ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত মোট ৩৮টি সম্পূর্ণ ও ২টি অসম্পূর্ণ কাহিনি লিখেছেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে শঙ্কু সিরিজের মোট ৮টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ শঙ্কুসমগ্রতে সকল গল্প সংকলিত হয়।

ঋজুদা

বুদ্ধদেব গুহের সৃষ্টি ঋজুদা যে তার সঙ্গী রুদ্রকে নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। ঋজুদা যেমন রহস্যের সমাধান করে তেমনি তার কাহিনিতে পাওয়া যায় এডভেঞ্চার আর শিকারের গল্প। ঋজুদার আরো দুই সঙ্গী তিতির এবং ভটকাই। মজার ব্যাপার হলো ঋজুদা কাহিনির কোনোটার পটভূমিই কল্পিত নয়। লেখক নিজে যেসব স্থানে ঘুরতে গেছেন তার পটভূমিতেই রচিত ঋজুদার গল্পগুলো। লেখক নিজেই বলেন যে, "পূর্ব আফ্রিকা থেকে ভারত মহাসাগরের সেশেলস আইল্যান্ডস, বা মণিপুর মিয়ানমার বা আন্দামান আইল্যান্ডস বা ভারতের নানা প্রান্তের সব বনভূমিতে আমি নিজে ঘুরে আসার পরই ঋজুদা কাহিনি লিখতে বসেছি তোমাদের জন্যে। তাই এগুলি শুধু গোয়েন্দা বা শিকার কাহিনি নয়,

এগুলি পড়লেও বাড়িসুদ্ধ সকলের নতুন নতুন নানা জায়গাতে বেড়িয়ে আসার সুযোগ হবে এই সব লেখার মাধ্যমে"। ঋজুদার প্রথম বই 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে'। আনন্দ পাবলিশার্স হতে ঋজুদার মোট পাঁচটি সমগ্র বেরিয়েছে।

গোয়েন্দা বরদাচরণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টি গোয়েন্দা বরদাচরণ। তার আছে গোয়েন্দার শাণিত বুদ্ধি, অদম্য মনোবল আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। বরদাচরণের দাদু অম্বিকাচরণ যে কিনা ভোররাতে উঠে দেড়শো বুকডন আর তিনশো বৈঠক দেয়- তাঁরও দেখা পাই বরদাচরণের গল্পে। শীর্ষেন্দু বরদাচরণকে নিয়ে সাতটি গল্প লিখেছেন, যা স্থান পেয়েছে 'নাথ পাবলিশিং' প্রকাশিত 'গোয়েন্দা বরদাচরণ সমগ্র ও অন্যান্য' বইতে।

কাকাবাবু

বাংলা সাহিত্যের অকুতোভয় সাহসী চরিত্র কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরীর স্রষ্টা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন সরকারি চাকুরে কাকাবাবুর একটি পা ভাঙা, হাঁটেন ক্র্যাচে ভর দিয়ে। প্রখর বিশ্লেষণ ক্ষমতা সেই সাথে দুই হাতে প্রবল শক্তি। কাকাবাবু বিয়ে করেননি। রোমাঞ্চপ্রিয় কাকাবাবু রহস্যের খোঁজ পেলেই অভিযানে ছুটে যান। কাকাবাবুর সঙ্গী সন্তু ওরফে সুনন্দ যে তাঁর সব অভিযানের সাক্ষী। সন্তুর বন্ধু জোজোও অভিযানে তাঁদের সঙ্গী হয়। জোজো মহা চাপাবাজ, তিলকে তাল বানাতে তার জুড়ি নেই। কাকাবাবুর বইতে অন্যান্য পরিচিত চরিত্র হলো: দেবলীনা দত্ত, শৈবাল দত্ত, রিনি, নরেন্দ্র ভার্মা। কাকাবাবুর কাহিনি ১৯৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দমেলা পত্রিকায়, 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' শিরোনামে। পরবর্তীকালে সমগ্র আকারে প্রকাশিত হয় ভারতের আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। ২০১২ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লেখক মোট ৩৬টি কাকাবাবুর কাহিনি লিখে গেছেন। কাকাবাবুর কাহিনি হতে মুভি, টিভি সিরিজ, টেলিফিল্ম, এনিমেশন, কমিকস তৈরি হয়েছে।

CamScanner

১১. চলচ্চিত্র অঙ্গনে গোয়েন্দা

গোয়েন্দাদের দক্ষতা, সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা, কৌশল অবলম্বন, ব্যক্তিগত জীবন, ব্যর্থতা ইত্যাদির বিভিন্ন নিত্য-নতুন ধারা নিয়ে বিশ্বে অনেক চলচ্চিত্র, নাটক প্রদর্শিত হয়েছে। তন্মধ্যে- জেমস বন্ড বিশ্ব চলচ্চিত্র অঙ্গনে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সাধারণত এ ধারার সিনেমাগুলো চলচ্চিত্রকার ব্যতীত অন্য কোনো লেখক, ঔপন্যাসিকের লেখা গল্প বা উপন্যাসকে অবলম্বন করে চলচ্চিত্র উপযোগী করা হয়।

অনেকগুলো চলচ্চিত্রে গোয়েন্দাকে প্রধান চরিত্র কিংবা অপ্রধান চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা ভাষায় বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার হিসেবে সম্ভবত সত্যজিৎ রায় সর্বাগ্রে এগিয়ে রয়েছেন। তিনি গোয়েন্দাদের ঘিরে অনেকগুলো চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন। তন্মধ্যে- চিড়িয়াখানা, জয় বাবা ফেলুনাথ তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র। বাংলা তিন গোয়েন্দা কাহিনির মতো বিখ্যাত দুটি চলচ্চিত্র- ১. The Three Investigators and the Secret of Terror Castle ২. The Three Investigators and Secret of Skeleton Island এ ছাড়া রহস্যময় ঘটনার ঘনঘাটায় বিশ্বকাঁপানো আরো কিছু মুভি হলো- ৩. Psycho সাইকো (১৯৬০), ৪. সেভেন (১৯৯৫) ৫. জোডিয়াক (২০০৭) ৬. দ্য সাইলেন্স অব দ্যা ল্যাম্বস (১৯৯১) ৭. মেমোরিজ অব মার্ডার (২০০৩), ৮. ভেনজেন্স ইজ মাইন (১৯৭৯); ৯. ম্যানহান্টার (১৯৮৬); ১০. ফ্রেইলটি (২০০১)

১২. কীভাবে চলে গোয়েন্দাগিরি?

অপরাধ বাড়ছে, বাড়ছে অপরাধীর সংখ্যাও। তাদের ওপর নজরদারি করার জন্য তৎপর হতে হচ্ছে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের। অপরাধের ধরন বদলে যাওয়ায় তাদেরও হতে হচ্ছে অনেক বেশি কৌশলী। গোয়েন্দাদের কর্মকাণ্ড কীভাবে চলে এ প্রশ্নটা অনেকের মনেই উদয় হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ প্রশ্নের কিছু দিক।

"গোয়েন্দা নজরদারির জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সন্দেহভাজনের ওপর সরাসরি নজরদারি করা। ফোনে আড়ি পাতা হয় জেনে এখন আর

সন্ত্রাসীরা ফোনে কথাবার্তা বলে না। তাই সন্দেহভাজন অপরাধী কখন, কোথায় গেল, সেগুলো উপস্থিত থেকে নজরদারি করলে ভালো ফল দেয়। তবে এক্ষেত্রে জনবল প্রধান সমস্যা।

ফ্রান্সের বিচারব্যবস্থার সন্ত্রাসবাদবিষয়ক প্রধান তদন্তকারী মার্ক ত্রেভিদিক নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, ফোনে আড়ি পেতে কোনো লাভ হয় না। অপরাধী এখন ফোনে কথা বলে না। তবে সশরীরে উপস্থিত থেকে নজরদারি করা অর্থ ও জনবলের অপচয় এবং বিষয়টি ব্যয়বহুল বলে মনে করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফ্রান্সের সাবেক এক সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকর্তা। তাঁর সঙ্গে একমত মার্কিন গোয়েন্দারাও।

কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (এফবিআই) সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ফিলিপ এ পার্কারের মতে, কোনো সন্দেহভাজনের ওপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখতে হলে জনবলের অপচয় হয়। ৮ ঘণ্টা করে হলে দিনে ৩টি শিফট বা ১২ ঘণ্টা করে হলে দুটি শিফটে কাজ করতে হয়। নাম প্রকাশ না করে একজন কর্মকর্তা বলেন, এক শিফটে একজন গোয়েন্দা থাকলে চলে না; অন্তত চারজন প্রয়োজন। সে হিসাবে ৮ ঘণ্টার শিফটে প্রয়োজন ১২ জন আর ১২ ঘণ্টার শিফটে প্রয়োজন ৮জন গোয়েন্দার। গাড়িসহ সহায়ক আরও অনেক কিছু প্রয়োজন এমন নজরদারির জন্য। আবার এই ১২ জন একটানা কাজ করলে লোকে চিনে ফেলতে পারে বা মানুষ সন্দেহ করতে পারে। তাই দলে ২৪ জনের মতো গোয়েন্দা রাখতে হয়, যাতে তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজ করতে পারে।

চাকরিজীবনের বেশির ভাগ সময় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রাশিয়ার চরদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করা ফিলিপ এ পার্কার বলেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি সব সময় চলাচল করে না। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি যখন কোনো বাসায় অবস্থান নিয়ে থাকে, তখন তাকে পুরোপুরিভাবে নজরদারিতে রাখা যায় না। এটা এ ধরনের গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা।

এ ধরনের নজরদারির ক্ষেত্রে কত অর্থ খরচ হয়? বিষয়টি বুঝতে হলে এফবিআই গোয়েন্দাদের ঘণ্টাভিত্তিক বেতন বিশ্লেষণ করতে হবে।

CamScanner

একজন এফবিআই গোয়েন্দা ৮ ঘণ্টার শিফট হিসাবে সপ্তাহে এক হাজার ২৩০ ডলার বেতন পান। সে অনুযায়ী ২৪ জন গোয়েন্দার বেতনই দাঁড়ায় সাড়ে ২৯ হাজার ডলারের বেশি। এর সঙ্গে আছে গাড়িভাড়াসহ অন্যান্য খরচ। একজন সন্দেহভাজনের ওপর নজরদারির জন্য সপ্তাহে এ পরিমাণ ব্যয় অবশ্যই বেশি। আর এটি যদি দিনের পর দিন ধরে চলতে থাকে, তাহলে এ কর্মকাণ্ড যে কতটা ব্যয়বহুল হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।"

১৩. গোয়েন্দাগিরির কিছু ব্যর্থ চিত্র...

এ প্রসঙ্গে দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত একটি ফিচারে নজর দেওয়া যাক। "গোয়েন্দাগিরি হাজার প্রশ্ন" শিরোনামে লেখাটি লিখেছেন মোস্তফা কামাল।

"তখন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট বোরাহানউদ্দিন রাব্বানি। মোল্লা উমর পাকিস্তানে মাদরাসায় পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তাঁকে 'পিক' করে। তাঁকে দিয়ে জঙ্গি সংগঠন তালেবান গঠন করানো হয়। তারপর মোল্লা উমর কয়েকজন মাদরাসার ছাত্রকে (সশস্ত্র ক্যাডার) নিয়ে কান্দাহার সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেন। পাঁচ বছরের মধ্যে তালেবান আফগানিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রদেশ দখল করা শুরু করে।

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর গোয়েন্দাপ্রধানকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বলেন, ব্যাপার কী? তালেবানরা নাকি বিভিন্ন প্রদেশ দখল করছে। কী করো? কোনো খবর দাও না? খবর রাখোও না হয়তো!

গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'না, স্যার। সব ঠিক আছে। কোনো সমস্যা নেই।' প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, 'সমস্যা নেই; তাহলে তারা প্রদেশ দখল করে কীভাবে? পত্রিকায় রিপোর্ট দেখলাম। সেগুলো কি মিথ্যা?' গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'জি, স্যার। সব ভুয়া খবর। ওরা কি কোনো দিন ঠিক লেখে নাকি, স্যার? যত্তসব আজগুবি খবর!' প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, 'তোমার কথার ওপর ভরসা রাখতে পারি?' গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'জি, স্যার। একশবার।'

গোয়েন্দাপ্রধান চলে গেলেন। এরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটে গেল বড় অঘটন। প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের কয়েকজন সদস্য প্রেসিডেন্ট সাহেবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে জানালেন, 'স্যার, পুরো প্রেসিডেন্ট ভবন তালেবানরা ঘিরে ফেলেছে! প্রেসিডেন্ট সাহেব যদি বাঁচতে চান, তাহলে তাঁকে পালাতে হবে! ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হতবিহ্বল! তিনি কী করবেন, কিছুই ভেবে পান না। কিছুক্ষণ আগে গোয়েন্দাপ্রধান এসে বলে গেল, সব ঠিক আছে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই। তালেবানরা কিছুই করতে পারবে না! আর এখন তোমরা এই খবর দিচ্ছ!

যাহোক, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা উপায়ান্তর না পেয়ে প্রেসিডেন্ট সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। তাঁকে সবিস্তারে সবকিছু জানালেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব তো বিস্ময়ে বিমূঢ়! এটা কী করে সম্ভব! তিনি কাছের কর্মকর্তাদের ডাকলেন। তাঁরাও হতাশার সঙ্গে বললেন, স্যার, ঘটনা সত্য!

প্রেসিডেন্ট সাহেব কী আর করবেন। বাঁচার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট ভবনের পেছনের দরজা দিয়ে পালালেন। পরে খবর পেলেন, তিনি পালিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই তালেবানরা প্রেসিডেন্ট ভবন দখল করেছে।

দুই.

১৯৯০ সাল। দেশে তুমুল আন্দোলন চলছে। তিন দল যুগপৎ কর্মসূচি দিচ্ছে। ধীরে ধীরে স্বৈরশাসক এরশাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। নাকের ওপর পানি উঠে যাচ্ছে! এর পরও গোয়েন্দারা তাঁকে বোঝালেন, স্যার, কোনো সমস্যা নেই। আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে ঢাকাকেন্দ্রিক। ঢাকাকে সামাল দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, স্যার। সব আমরা দেখতেছি।

গোয়েন্দাদের পরামর্শ অনুযায়ী এরশাদ সাহেব দমন-পীড়নের পথ বেছে নিলেন। আর অন্যদিকে তিনি সেনাপ্রধান নূরুদ্দিন সাহেবকে হাতে রাখার চেষ্টা চালালেন। কিন্তু তিনি তো আর দেশের মানুষের বিপক্ষে যেতে পারেন না! নূরুদ্দিন সাহেব এরশাদ সাহেবকে বললেন, জনগণ আপনার বিপক্ষে চলে গেলে আমার আর কিছু করার থাকবে না।

CamScanner

এরশাদ সাহেব মনে মনে ভাবলেন, আন্দোলন দমাতে পারলেই সেনাবাহিনীকে হাতে রাখা যাবে। আন্দোলনের একপর্যায়ে ডা. মিলন নিহত হলেন। ব্যস, পরিস্থিতি গেল ঘোলাটে হয়ে। এরশাদ সাহেব গোয়েন্দাদের ডাকলেন। তাঁদের কাছে পরিস্থিতি জানতে চাইলেন। তাঁরা এবারও বললেন, স্যার, এদের আন্দোলন ধোপে টিকবে না, স্যার। আপনি অনেক বেশি জনপ্রিয়। আপনি চুপচাপ বসে থাকেন। ঢাকা জ্বলছে। আর এরশাদ বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন, তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গভীর অতলে তলিয়ে গেলেন।

তিন.

খালেদা জিয়ার গুলশানের অফিস। হঠাৎ পুলিশ এসে ঘিরে রাখল পুরো বাড়িটা। কী হয়েছে কেউ জানে না। একে অপরকে প্রশ্ন করে। ভাই, ঘটনা কী! এত পুলিশ কেন?

জবাব নেই কারো কাছে। একজন মিডিয়ার লোক পুলিশের কাছে জানতে চাইলেন, ভাই, ঘটনা কী?

পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, অফিসে অনেক অনেক প্রিন্টিং ম্যাটেরিয়াল ঢুকেছে। এগুলো নিয়ে গোয়েন্দারা সন্দেহ করছেন। তাঁদের ধারণা, সরকারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে!

সাংবাদিক সাহেব বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, ও! তাই নাকি! সত্যি বলছেন তো!

পুলিশ অফিসার বললেন, আরে ভাই, দুই-তিনটা গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট। মিথ্যা হয় কী করে?

সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রধানের কার্যালয়ে তল্লাশি করছেন; সরকারের উচ্চপর্যায়ের অনুমতি লাগবে না? পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, আপনার কী ধারণা, অনুমতি ছাড়াই তল্লাশি করতে এসেছি? সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করলেন, কোন লেভেল থেকে অনুমতি নিয়েছেন?

CamScanner

পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, আসলে আমরাও বিষয়টা ভালো জানি না। স্যার বলেছেন তল্লাশি করতে, তাই আমরা তল্লাশি করছি। তল্লাশি শেষ হয়েছে? সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন। পুলিশ কর্মকর্তা মাথা নেড়ে বললেন, হুম।

কী পেলেন? সাংবাদিক জানতে চাইলেন। 'দাঁড়ান। সিজার লিস্ট দেখে বলি। ভাই, কিছুই পাওয়া যায়নি। ফলাফল শূন্য।' পুলিশ কর্মকর্তা বত্রিশ দাঁত বের করে বললেন। 'গোয়েন্দাদের ভুল তথ্যের কারণে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলো না?' সাংবাদিক বললেন।

পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, কী জানি ভাই। গোয়েন্দারা কেন যে এসব ভুয়া তথ্য দেয় আর আমাদের ঝামেলা বাড়ায়! আবার এই কথা লিখে দিয়েন না ভাই!

তা হলে বিপদে পড়ব। তারপর পুলিশ কর্মকর্তা গাড়িতে উঠে অফিসের দিকে রওনা হলেন।"

[বি.দ্র. প্রবন্ধটির মতাদর্শগত দায়ভার প্রবন্ধকারের, প্রকাশকের নয়।]

১৪. এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা ও ওহাবী মতবাদ

যুগ যুগ ধরে মুসলিম শাসন কিংবা ব্যক্তিদের সাথে যেসব ভয়ংকর গোয়েন্দা তৎপরতা ইহুদি মুশরিক অথবা অন্য কোনো অমুসলিম জাতি কর্তৃক চালানো হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে শত শত বই লেখা হয়ে যাবে। তাই বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে সাম্প্রতিক শতকে আলোচিত কিছু গোয়েন্দা তৎপরতা এ বইতে তুলে ধরা হবে। এর মধ্যে প্রথমেই আসা যাক ওহাবী মতবাদ বিষয়ে। ওহাবী মতবাদের জনক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওহাব নাজদী। তার প্রবর্তিত আকীদাই ওহাবী মতবাদ নামে পরিচিত। আরবের নাজদ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন মুহাম্মাদ আবদুল ওহাব নাজদী। নজদের 'হুরাইমিলা' নামক স্থানে ১১১১ হিজরী সনে (১৬৯৬ খ্রি.) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২০৬ হিজরী (১৭৮৭ খ্রি.) মারা যান। আহলে হাদিস ও সালাফী বলে পরিচিত

CamScanner

আলেমগণের একাংশ তার অনুসারী। ইউকিপিডিয়ার তথ্যমতে, বিশ্বের ওহাবী মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবে বাস করে। সৌদি আরবের ২২.৯%, কাতারের ৪৬.৮৭%, আমিরাতের ৪৪.৮%, বাহরাইনের ৫.৭%, কুয়েতের ২.১৭% জনগণ ওহাবীপন্থি। সৌদি আরবের ওহাবীপন্থি লোকের বেশির ভাগ নজদ অঞ্চলে বাস করে। সৌদি আরব, কাতার, শারজাহ এবং রাস আল খাইমাহতে ইসলামের অফিসিয়াল সংস্করণ হচ্ছে ওহাবী মতবাদ।

যাহোক, এ ব্যাপারে আলোচনার ঝড় উঠে এক ব্রিটিশ ইহুদি গোয়েন্দার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'হামফ্রেজ মেমোরিজ' প্রকাশিত হবার পর।

এই ব্রিটিশ গোয়েন্দা অফিসার 'হামফ্রে' মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল ওয়াহাবের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। তার আগে 'হামফ্রে' তুরস্কের শায়খ আফিন্দির নিকট ছদ্মবেশে মুসলমান সেজে কুরআন ও হাদীসের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে। এরপর ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে তাদের মধ্য যে আলোচনা হয় তা 'হামফ্রে' তার ডায়েরিতে লিখে রাখেন। পরবর্তী সময়ে সেসব বই আকারে প্রকাশিত হয়।

[মাসিক তরজুমান পত্রিকায় (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সংখ্যা) আবদুল ওহাব নাজদী প্রসঙ্গটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন জনাব লোকমান আহমদ আমিনী। নিবন্ধটি 'হামফ্রেজ মেমোরিজ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়]

জনাব 'হামফ্রে' এর ডায়েরিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জার্মানির হস্তগত হয়, তখন জার্মান পত্রিকা 'ইসপগিল' তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। এতে ব্রিটিশদেরকে বিশ্ব সমাজের নিকট অনেক লজ্জিত হতে হয়। ডায়েরিটি ফরাসি পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল। জনৈক লেবাননী বুদ্ধিজীবী তা আরবিতে অনুবাদ করেন।

হামফ্রে লিখেছেন, "আমি যখন তরখানের কাজে নিয়োজিত ছিলাম তখন একজন লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি সেখানে

যাতায়াত করতেন এবং তুর্কি, ফারসি এবং আরবি ভাষায় কথা বলতেন। তিনি দ্বীনি তালেব ইলমের পোশাক পরিধান করতেন। তার নাম হলো মোহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব। তিনি উচ্চাভিলাষী, সম্মানাকাঙ্ক্ষী এবং ধোপ দুরস্ত লোক ছিলেন। উসমানী সরকারের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করতেন ও সর্বদা তার সমালোচনা করতেন। কিন্তু ইরান সরকারের সাথে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। তরখান আব্দুর রেজার সাথে তার বিশেষ সম্পর্কের কারণ হলো উভয়েই উসমানী খলিফাকে নিজের পরম শত্রু মনে করতেন। কিন্তু এটা আমার বোধগম্য হয়নি যে, তিনি কী কারণে আব্দুর রেজার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। কারণ, তারা দুজন ছিলেন দুই মতাবলম্বী (একজন শিয়া আরেকজন সুন্নী)। আমি এটাই জানতে পারিনি, তিনি ফারসি ভাষা কোথায় শিখলেন। অবশ্য বসরায় শিয়া সুন্নীরা এক ছিল। সেখানে আরবি ও ফারসি উভয় ভাষার প্রচলন ছিল।

আবদুল ওহাব স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। তার মন শিয়া সুন্নীর পক্ষপাতিত্ব মুক্ত ছিল। অথচ সেখানকার বেশির ভাগ সুন্নীই শিয়া বিরোধী ছিলেন। আবার কোনো সুন্নী মুফতি শিয়াদের কাফের বলে অভিহিত করতেন। আবদুল ওহাবের দৃষ্টিতে হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলি ও মালেকী শিক্ষা কেন্দ্রের কোনোটিরই বিশেষ কোনো গুরুত্ব ছিল না, তার বক্তব্য ছিল আল্লাহ তাআলা কোরআন মজীদে যা বলেছেন তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব কোরআন-হাদীস চর্চা করতেন। স্বীয় অভিমতের পক্ষে ইসলামি জ্ঞান বিশারদের মতামত প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন। কিন্তু কোনো কোনো সময় তার চিন্তাধারা প্রখ্যাত আলেমদের বিপরীত অর্থে হতো। তিনি কথায় কথায় বলতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কিতাব ও সুন্নতকে অপরিবর্তনীয় বিধান করে আমাদের জন্য পেশ করেছেন। তিনি কখনো বলেননি যে, সাহাবায়ে কেরাম ও আইয়ামে দ্বীনের বর্ণনা অটল এবং অবতীর্ণ ওহীর শামিল। আমাদের জন্য কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণ করাই শুধু ওয়াজিব। উলামা

CamScanner

চার ইমাম, এমনকি সাহাবাদের মতবাদ যাই হোক না কেন তাদের ইখতিলাফের দ্বারা দ্বীনকে মজবুত করার দরকার নেই।

একদিন ইরান থেকে আগত জনৈক আলেমের সাথে খাবার টেবিলে তর্ক শুরু হয়ে গেল। সে আলেমের নাম ছিল শায়খ জাওয়াদ কুম্মী। তিনি আবদুর রেজা তরখানের মেহমান ছিলেন। শায়খ জাওয়াদ কুম্মীর সাথে আবদুল ওহাবের মৌলিক মতভেদ ছিল। তাদের কথাবার্তা শিঘ্রই তিক্ততার রূপ গ্রহণ করে। শায়খ কুম্মী আবদুল ওহাবকে বললেন, "তুমি যদি স্বাধীন চিন্তার লোক হও, নিজের দাবি অনুযায়ী যথেষ্ট লেখা পড়া করে থাক, তবে কেন শিয়াদের মতো হযরত আলী (রা)-কে সম্মান প্রদর্শন কর না?"

আবদুল ওহাব উত্তরে বললেন, "হযরত উমর (রা) ও অন্যান্যদের কথা আমার কাছে প্রমাণ নয়, আমি শুধু কিতাব ও সুন্নতকে মানি।"

কুম্মী বলেন, আচ্ছা তুমি যদি সুন্নতের অনুসারী হয়ে থাক তবে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, আমি জ্ঞানের শহর আর আলী (রা) তার দরজা" একথা বলে কি আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবাদের মধ্য পার্থক্য করেননি?

আবদুল ওহাব বলেন, যদি ব্যাপার এরকমই হয় তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বলা উচিত ছিল "আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে গেলাম- একটি কিতাব ও দ্বিতিয়টি আলী (রা)"।

কুম্মী বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন আমি তোমাদের মধ্য কিতাব ও আহলে বাইতকে রেখে গেলাম নিশ্চয়ই আলী (রা) আহলে বাইত এর মাঝে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আবদুল ওহাব এ হাদীসকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করলেন। কিন্তু শায়খ কুম্মী উসূলে কাফীর ইসনাদের ভিত্তিতে হাদীসটির সত্যতা প্রমাণ করেন। তখন ওহাব নাজদী চুপ থাকতে বাধ্য হলেন। পরে তিনি বলে উঠলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদের জন্য শুধু কিতাব ও আহলে বাইত রেখে গিয়ে থাকেন তাহলে সুন্নত কোথায় গেল?

CamScanner

কুম্মী বলেন, সুন্নত এ কিতাবের তাফসীর ও তাশরীহকে বলে অন্য কিছুকে নয়। ইবনে ওহাব বলেন, আপনার মতানুযায়ী আহলে বাইতই কালামে ইলাহীর তাফসীর, তবে হাদীসের মতন বৃদ্ধি করা হলো কেন?

কুম্মী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর উম্মতে মোহাম্মাদীকে কোরআন বোঝাবার প্রয়োজন ছিল। কেননা, জনসাধারণ নিজের জীবনকে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী গঠন করতে চেয়েছিল। এজন্য পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবী ইলমের ভিত্তিতে কিতাবে ইলাহীর মূল ধরে আর বংশধরকে কোরআনের ভাষ্যকার ও কিতাবের ব্যাখ্যা ঠিকমতো উম্মতের নিকট পেশ করার জন্য হাওয়ালা করেছেন। ইবনে ওহাব এরপর খাচায়বন্দি পাখির মতো ছটফট করতে থাকেন।

আবদুল ওহাবের সাথে মেলামেশা ও সাক্ষাতে বুঝতে পারলাম যে, ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যাবলিকে কার্যকর করার জন্য এ ব্যক্তি অত্যন্ত উপযোগী হবে। তার উচ্চাভিলাষ, খ্যাতি কামনা, অহংকার দ্বারা উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে ইসলাম ও সাহাবায়ে কেরামের এমনকি খোলাফায়ে রাশেদিন পর্যন্ত সমালোচনায় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। কোরআন-হাদীস থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলই তার উদ্দেশ্য ছিল।

আমি চিন্তা করলাম, কোথায় এ অহংকারী যুবক আর কোথায় ইস্তাম্বুলের সেই আহামদ আফেন্দী। হানাফী মাযহাবের অনুসারী সে বৃদ্ধ ইমাম আবু হানীফার নাম নেওয়ার আগে ওযু করে নিত। আর আবদুল ওহাব আবু হানিফা (র)-কে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তিনি বলতেন, আমি আবু হানিফার চেয়ে বেশি জানি এবং সহীহ বোখারী বেহুদা কিতাব বৈ কিছু নয়।১

{১-আবদুল ওহাবের রচনাবলিতে বোখারী শরীফের হাওয়ালার উল্লেখ দেখা যায়, সম্ভবত প্রাথমিক জীবনে তিনি এ ধরনের উক্তি করে থাকবেন অথবা হাফফ্রে তার প্রতি অপবাদ হিসেবে একথা লিখে থাকবেন}

হামফ্রে বলেন, যাহোক, আমি আবদুল ওহাবের সাথে গভীর সম্পর্ক করে নিলাম এবং আমি বারবার তাকে এ কথা শুনাতাম "আল্লাহ আপনাকে

হযরত আলী (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর চাইতে বেশি উপযুক্ত করে বানিয়েছেন। আপনি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমসাময়িক লোক হতেন তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারতেন। আমি সব সময় আশাভরা সুরে তাকে বলতাম আমি চাই ইসলামে যে বিপ্লব সাধিত হবে তা আপনার দ্বারাই হোক। আপনি এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক যে আপনিই ইসলামকে অবনতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।

আমি ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সাথে ঠিক করলাম যে আমরা দুজন মজলিসে বসে উলামা, মুফাসিরীন, মাযহাব ও সাহাবাদের থেকে ভিন্ন পন্থায় নতুন চিন্তা ধারার ভিত্তিতে কোরআন মজীদ নিয়ে আলোচনা করব। আমি কোরআন পড়তাম আর আয়াতের অর্থ নিয়ে মতামত প্রকাশ করতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যেকোনো প্রকারে তাকে ইংরেজ উপনিবেশবাদী সংস্থার ফাঁদে জড়িয়ে দেওয়া। আমি ক্রমে ক্রমে এ উচ্চাভিলাষী লোকটিকে জড়িয়ে ফেলতে লাগলাম, এমনকি তিনি বাস্তবতার ওপর স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

একদিন তাকে জিজ্ঞাস করলাম জিহাদ করা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন, অবশ্যই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা বলেছেন কাফের ও মুনাফিক উভয়ের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করেননি? আবদুল ওহাব বলেন, জিহাদ শুধু যুদ্ধের ময়দানে নয় বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ চলাফেরা কথাবার্তার দ্বারা মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আমি বললাম তাহলে এ অবস্থায় কাফেরদের সাথেও কথাবার্তা ও চলাফেরার দ্বারা যুদ্ধ করা ওয়াজিব। তিনি বললেন, না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আমি বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের সাথে প্রাণ বাঁচাতে যুদ্ধ করেছেন। কেননা, কাফেরগণ তার জানের দুশমন ছিল। আবদুল ওহাব এ কথার ওপর মাথা নাড়লেন, আমি বুঝতে পারলাম আমার কাজে আমি সফল হতে চলেছি।

একদিনের ঘটনা- আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, মহিলাদের সাথে মুতয়া বিবাহ (সুনির্দিষ্ট সময়ের শর্তে বিবাহ) জায়েজ কিনা? তিনি বললেন, "কখনো না"। আমি বললাম তাহলে কুরআনে এটা জায়েজ বলা হয়েছে কেন? "আর তোমরা যখন তাদের সাথে মুতয়া করবে তখন তাদের মোহর আদায় করে দাও।"[১] তিনি বললেন, হ্যাঁ আয়াত নিজের জায়গায় ঠিকই আছে, কিন্তু হযরত উমর বলেছেন, "মুতয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানায় হালাল ছিল আমি আজকে এটাকে হারাম করলাম।"

{২-প্রকৃতপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতয়াকে হারাম বলে বিধান জারি করেছিলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিন মুতয়াকে হারাম বলে ঘোষণা করেছিলেন।"[২] হযরত উমর (রা) একদিন খোতবা প্রদানকালে বলেছিলেন, "আমি আল্লাহর কসম করে বলছি- যদি আমি জানতে পারি কোনো বিবাহিত স্বাধীন মুসলমান মুতয়া করেছে তবে আমি অবশ্যই তাকে পাথর মেরে হত্যা করব।"[৩]}

এখন কেউ যদি এটাতে লিপ্ত হয় তবে আমি তাকে শাস্তি দেব। আমি বললাম আজব বিষয় যে আপনি হযরত উমর (রা)-কে অনুসরণ করেন আবার নিজেকে তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী বলে মনে করেন, হযরত উমর (রা) কি অধিকার আছে যে তিনি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক হালাকৃত বস্তুকে হারামে পরিণত করেন? আপনি কোরআনের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে হযরত উমর (রা)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন? আবদুল ওহাব এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন। তার চুপ থাকাই সম্মতির লক্ষণ বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে তার চিন্তা ধারা শুধরিয়ে তাকে আমি যৌন উত্তেজনাকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলাম। তিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম আপনি কি 'মুতয়া' দ্বারা

---

১. নিসা-২৪
২. বোখারী ও মুসলিম
৩. ইবনে মাজা

নিজের জীবনকে আনন্দদায়ক করতে চান? আবদুল ওহাব সম্মত ও আশান্বিত হয়ে মাথা নাড়লেন। আমার দায়িত্বের শেষ সীমানায় আমি পৌঁছে গেলাম। আমি তার সাথে ওয়াদা করলাম যেকোনোভাবেই আমি এর ব্যবস্থা করব। আমার একটা ভয় ছিল যে তিনি না আবার সুন্দরীদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন, কারণ সুন্নীরা ছিল 'মুতয়া' বিরোধী। আমি তাকে বললাম আমার কাজকর্ম একেবারেই গোপনীয় থাকবে। এমনকি মহিলাটিকেও আপনার নাম বলা হবে না। বসরায় ইংরেজ উপনিবেশ সরকারের পক্ষ হতে চরিত্র হননের জন্য খ্রিষ্টান এক মহিলা নিয়োজিত ছিল। সে মুসলিম নওজোয়ানদের পথভ্রষ্টতার জন্য উৎসাহ জোগাত সেই মহিলার কাছে আমি সব খুলে বললাম। যখন সে রাজি হলো তখন সাময়িকভাবে তার নাম আমি সুফিয়া রাখলাম।

যথাসময়ে আমি আবদুল ওহাবকে নিয়ে সুফিয়ার ঘরে পৌঁছলাম। আমরা মাত্র দুজন ছাড়া ঐখানে আর কেউ ছিল না। আবদুল ওহাব একটি আশরাফীর বিনিময়ে এক সপ্তাহের জন্য সুফিয়াকে বিবাহ করেন। ধর্মীয় বিধান নিধন আর স্বাধীন চিন্তাধারার নতুন স্বাদ তাকে পান করাল সুফিয়া।

এর তিন দিন পর পুনরায় ইবনে আবদুল ওহাবের সাথে দেখা করলাম। এবার শরাব যে হারাম এ নিয়ে কথাবার্তা চলল। আমি চেষ্টা করলাম যে সমস্ত আয়াতে শরাবকে হারাম করা হয়েছে, যে আয়াতগুলো আবদুল ওহাবের নিকট প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত সেগুলোর খণ্ডন করি। আমি বললাম ইয়াজিদ, খোলাফায়ে বনু উমাইয়া ও বনী আব্বাস এর শরাব নূশী আমাদের জানা কথা। তাহলে এটা কি করে হতে পারে যে এ সকল ধর্মীয় ও মাযহাবের নেতারা গোমরাহীর জীবনযাপন করতেন, আর শুধু আপনিই সঠিক পথের ওপর আছেন? নিশ্চই আমাদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের জ্ঞান তাদের বেশি ছিল, সুতরাং এ কথা পরিষ্কার যে আল্লাহ ও রাসূলের বাণী থেকে তারা যা কিছু বের করেছেন তা হলো শরাব যে হারাম তা নয় বরং এটা মাকরুহ। এ ছাড়া ইহুদি-

CamScanner

খ্রিষ্টানদের পবিত্র কিতাবসমূহে পরিষ্কারভাবে শরাব পান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অথচ ওই ধর্মও তো আল্লাহ দ্বারা প্রেরিত আর ওই সমস্ত দ্বীনের পয়গম্বরদের ওপর তো ইসলাম বিশ্বাস রাখতে বলে, এটা কি করে সম্ভব যে শরাব আল্লাহ প্রেরিত এক ধর্মে হালাল আর আরেক ধর্মে হারাম। আমদের নিকট রায়াতী প্রমাণ আছে যে হযরত উমর (রা) এই সময় পর্যন্ত শরাব পান করেছেন যে পর্যন্ত এ আয়াত অবতীর্ণ না হয়েছে " তোমরা কি শরাব ও জুয়া থেকে বিরত থাকবে না?[১] যদি শরাব হারাম হতো তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রা) কে শাস্তি দিতেন, কিন্তু তাকে শাস্তি প্রদান না করাই এ কথার প্রমাণ করে যে শরাব হারাম নয়।

{৩-ধাপে ধাপে শরাব পানকে হারাম ঘোষণা করা হয়। প্রথমত, "লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে আপনি বলুন উভয়ের মধ্য কবীরা গুনাহ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু ওতে উপকারের চেয়ে পাপ বেশি[২] দ্বিতীয়ত, "হে ঈমানদারগণ মদ্যপ অবস্থায় তোমরা নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না যে পর্যন্ত না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার"।[৩] তৃতীয়ত-"হে ঈমানদারগন মদ, জুয়া ও মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়ক এসব শয়তানী কাজ সুতরাং তোমরা এসব বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ হতে বিরত রাখতে চায়, তবে কি তোমরা নিবৃত হবে না।"[৪]}

ইবনে আবদুল ওহাব অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আমার কথাবার্তা শুনছিলেন, হঠাৎ করে বলে উঠলেন বর্ণিত আছে যে হযরত উমর (রা) শরাবে পানি মিশিয়ে পান করতেন, যাতে নেশার ঘোর থাকতো না, তিনি

---

১. মায়েদা-৯১
২. বাকারা-২১৯
৩. নিসা-৪৩
৪. সূরা মায়েদা ৯০-৯১

বলতেন শরাবের নেশা হারাম, মূল শরাব হারাম নয়। ওই শরাব যাতে নেশা হয় না তা হারাম নয়।

{৪-হযরত উমর (রা) এ ধরনের কোনো উক্তি করেননি, এটা একেবারেই মিথ্যা কথা}

আবদুল ওহাব হযরত উমর (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে এ আয়াতের আলোকে সঠিক বলে মনে করতেন সেখানে বলা হয়েছে- যদি শরাবে মাস্তি না থাকে তাহলে পানকারীর ওপর তার প্রভাব কার্যকর হবে না, আর এ জন্য যে শরাবে মাস্তি নেই তা হারাম নয়।

আমি ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সাথে শরাব প্রসঙ্গের কথা সুফিয়ার কানে পৌছিয়ে দিলাম, আর তাগিদ দিলাম সুযোগ পেলেই তাকে নেশায় চুর করে দেবে আর যত পার শরাব পান করাবে।

পরের দিন সুফিয়া আমাকে জানালো যে, সেদিন আবদুল ওহাব প্রাণ ভরে শরাব পান করেছেন, এমনকি তিনি আত্মহারা হয়ে চিৎকার করতে থাকেন। শেষরাতে তিনি তার সাথে কয়েকবার মেলামেশা করেন, এখনো তার নেশার ভাব কাটেনি। মোটকথা সুফিয়া পুরাপুরি আবদুল ওহাবের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।

আবদুল ওহাবের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনার সময় একদিন আমি রোজা প্রসঙ্গ শুরু করলাম। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা তো বলেননি রোজা রাখা জরুরি।

{৫ সুরা বাকারার ১৮৫ আয়াত দ্বারা রমজানের রোজা রাখা ফরজ করা হয়েছে}

কাজেই ইসলামে রোজা রাখা মুস্তাহাব। এ সময় আবদুল ওহাব খুব রেগে গিয়ে বললেন, তুমি কি আমাকে ধর্মচ্যুত করতে চাও? আমি বললাম, 'হে আবদুল ওহাব দ্বীন বলতে অন্তরের পবিত্রতা জীবনের নিরাপত্তা ও মধ্যমপন্থাকে বোঝায়। এ সমস্ত অবস্থা মানুষকে অন্যের ওপর জুলুম ও অত্যাচার থেকে বিরত রাখে। হযরত ঈসা কি বলেননি

ধর্ম প্রেম ও ভালোবাসাকে বোঝায়? কুরআনে আছে- এবং নিজ রবের ইবাদত করতে থাকুন যে পর্যন্ত না ইয়াকীন এসে উপস্থিত হয়।[১]

মানুষ যদি কামেল বিশ্বাসের মনজিলে পৌঁছে যায় তখন আল্লাহর নেয়ামত তার ভেতর দৃঢ় হয়ে যায় আর সে যদি সদাচারী হয় তাহলে রোজার আর কি প্রয়োজন থাকে? ইবনে ওহাব এবার আমার ওপর ভীষণ রাগ করলেন ও নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। আরেকদিন সুযোগমতো আমি বললাম, নামাজ জরুরি নয়। তিনি বললেন, কেন? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামাজ পড়"[২] সুতরাং নামাজের উদ্দেশ্য হলো জ্বিকরে ইলাহী, আর আপনার উচিত তার নাম নিজমুখে জারী রাখা। ইবনে আবদুল ওহাব বললেন হ্যাঁ, আমি শুনেছি কোনো কোনো ধর্মীয় আলেম নামাজের সময় আল্লাহ নাম বার বার উচ্চারণ করতে থাকেন আর তারা নামাজ পড়েন না (এটা তার শোনা কথা, এর কোনো ভিত্তি নেই)।

আবদুল ওহাবের স্বীকৃতিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করে কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে নামাজ পড়তে উৎসাহ দিলাম। এর পরিণাম হলো নামাজের পাবন্দি তার থেকে ছুটে গেল। এখন তিনি কখনো নামাজ পড়েন কখনো পড়েন না। বিশেষ করে সকালের নামাজ তিনি প্রায়ই তরক করতে লাগলেন। আমরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। এ কারণে ভোরে উঠে ওজু করার সাহস তার হতো না।

প্রকৃতপক্ষে আমি ইবনে আবদুল ওয়াহাবের শরীর থেকে ঈমানী পোশাক ছাড়াতে কামিয়াব হলাম। পরিশেষে আমি একদিন আলোচনার পরিধি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র 'শান' পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে তুমি যদি কিছু বলো তাহলে তোমার সাথে আমার আর কোনো

---

১. আল হিজর-১৯
২. তাহা-১৪

সম্পর্ক থাকবে না। আমি পরিশ্রমের ফসল ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে হঠাৎ আমার আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম এরপর তার সাথে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি।

এর পর থেকেই আবদুল ওহাবকে নেতৃত্ব প্রদানের ব্যাপারে চিন্তিত হলাম। তার দিল ও রুহে প্রবেশ করে শিয়া-সুন্নী ফেরকার বাইরে ইসলামের তৃতীয় ফেরকার নেতৃত্বের জন্য তাকে আগে বাড়াবার জন্য আমলের যোগ্য করে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। এ কাজে সুফিয়াও আমার সহযোগী ছিল, কেননা আবদুল ওহাব তাকে অত্যন্ত ভালোবাসত আর সপ্তাহ সপ্তাহ মুদ্দত বাড়াত। মূলত সুফিয়া আবদুল ওয়াহাবের সবর, স্থিতি এমনকি তার সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

আমি একদিন আবদুল ওহাবকে বললাম- এটা কি ঠিক নয় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সমস্ত সাহাবীর বন্ধুত্ব ছিল, তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি বললাম ইসলামের কানুন কি স্থায়ী না অস্থায়ী তিনি বললেন অবশ্যই স্থায়ী, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হালালকৃত কিয়ামত পর্যন্ত হালাল থাকবে, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হারামকৃত কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। আমি সাথে সাথে বললাম তবে আমাদের ও তার সুন্নতের ওপর আমল করে একে অপরের বন্ধু ও ভাই হওয়া উচিত। এরপর থেকে আমরা উভয়ের প্রবাসে ও নিবাসে একে অপরের সাথে থাকতে লাগলাম।

একদিন আমি তাকে একটি মিথ্যা স্বপ্নের কথা বললাম, "রাত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি কুরসীর ওপর বসা অবস্থায় দেখলাম, ঠিক জিকিরকারী ও ওয়াজকারী যেরকমভাবে মিম্বরের ওপরে বসে বয়ান করে। বড় বড় আলেম ও বুযুর্গানে দ্বীন যাদের আমি চিনি না তার চারদিকে থেকে তারা তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘিরে রেখেছে। তখন আমি দেখলাম আপনি সে মজলিশে প্রবেশ করেছেন এবং আপনার চেহারা থেকে আলো বের হচ্ছিল। যখন আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দাঁড়ালেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে আপনাকে সম্মান

প্রদর্শন করে আপনার কপালে চুমা খেয়ে বললেন, 'হে আমার একই নামের অধিকারী মুহাম্মদ, তুমি আমার ইসলামের ওয়ারিশ, মুসলমানদের দ্বীন দুনিয়াকে সামলে নেবার জন্য আমার যথার্থ খলিফা, এ কথা শুনে আপনি বললেন, 'ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সামনে ইলম জাহির করতে আমার ভয় হয়।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি মনে ভয়কে স্থান দিও না। তুমি যা কিছু নিজের ব্যাপারে চিন্তা করছ তুমি তার চাইতে অনেক বেশি মর্যাদাশীল'।"

আবদুল ওহাব আমার মনগড়া স্বপ্নের কথা শুনে আনন্দে আটখানা। তিনি বারবারই আমাকে জিজ্ঞাস করছিলেন তোমার স্বপ্ন কি সত্যি হয়? আমি তাকে এ ব্যাপারে সান্ত্বনা দিতে থাকি। আমি লক্ষ করলাম স্বপ্নের আলোচনার দিন থেকে তার মনোভাব এক নতুন মাজহাব সৃষ্টির দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে কাজ শুরু করে দিল।

একদিন আবদুল ওহাব আমাকে বললেন, ইসপাহানে অবস্থানকালে আবদুল করীম নামে এক ব্যক্তির সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়, তিনি নিজেকে একজন লেখক হিসেবে প্রচার করতেন। তিনি ইবনে আবদুল ওহাবের সাথে থেকে তার সমস্ত গোপনীয় তথ্য জেনে নেয়। তার সাথে সুফিয়াও কিছুদিনের জন্য ইসপাহানে আসে এবং আবদুল ওহাব তার মুতয়ার মেয়াদ দুমাসের জন্য বাড়িয়ে নেয়। সিরাজ এলাকা সফরের সময় আবদুল করীম তার সাথে ছিল এ সময় আবদুল করীম আবদুল ওয়াহাবের জন্য সুফিয়া থেকেও আরো সুন্দরী মেয়ের ব্যবস্থা করে দেয় তার নাম ছিল আসিয়া। আবদুল করিম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পুনর্বাসন এলাকার মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী ছিল।

মোটকথা আবদুল করীম, সুফিয়া, আসিয়া ও হামফ্রে মিলে দিনরাত চেষ্টা করে আবদুল ওহাবকে ব্রিটিশ মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছামাফিক প্রস্তুত করে নেয়।

ব্রিটিশ সরকারের পদক্ষেপসমূহ-

ব্রিটিশ সরকার আবদুল ওহাবকে সাহায্য করার পূর্ণ আশ্বাস দেওয়ার পর জযীরাতুল আরবের অন্তর্গত নজদের নিকটবর্তী এলাকায় তার নেতৃত্বের প্রথম পদক্ষেপ সূচিত হয়।

আবদুল ওয়হাবের প্রথম পদক্ষেপগুলো ছিল-

১। আবদুল ওয়হাবের মাযহাবে যারা শামিল হবে না তাদেরকে কাফের বলা, তাদের মাল সামানা ইজজত সম্মান বিনষ্ট করা বৈধ মনে করা।

২। মূর্তিপূজার বাহানায় যথাসম্ভব ক্বাবাঘর ধ্বংস করা আর হাজীদের মাল লুণ্ঠনের জন্য আরব উপজাতিদের উত্তেজিত করা।

৩। রাসুল (সা) এবং তাঁর খলিফাদের এবং বিশেষ করে মহৎ ব্যক্তিদেরকে অবহেলার দোহাই দিয়ে এবং এমনিভাবে শিরক ও মূর্তিপূজার চিহ্নসমূহ বিলাপের বাহানায় মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য শহরে যতটা সম্ভব মাজার ও কবরগুলো ধ্বংস করা।

৪। যতটুকু সম্ভব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ফিতনা-ফাসাদ ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়ানো।

৫। কুরআনে হ্রাস বৃদ্ধির ওপর হাদীস থেকে দলিল দিয়ে এক নতুন কোরআন প্রচার করা।

নতুন মতবাদ প্রচার-

আমাদের পূর্ব পরামর্শ অনুযায়ী নজদের লোকেরা আমাকে ইবনে আবদুল ওহাবের গোলাম মনে করত। আবদুল ওহাবের দাওয়াতী পরিবেশ তৈরি করতে আমদের দুবছর সময় লেগেছে। ১১৪৩ হিজরী সনের মাঝামাঝি সময় আবদুল ওহাব জযীরাতুল আরবে নতুন ধর্মমত ঘোষণার জন্য চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তার মতাদর্শী ও সাহায্যকারী লোকদের একত্রিত করেন। প্রথমে তিনি শুধু নিজের লোকদের মধ্য অস্পষ্ট ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে দাওয়াতের সূচনা করেন, কিছুদিন পর নজদের সব চিন্তাবিদ লোকদেরকে বড় বড় দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। ধীরে ধীরে অর্থের বিনিময়ে আবদুল ওহাবের পক্ষে একটি বড় জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে থাকি। একথা উল্লেখ্য যে দাওয়াত প্রচারের শুরুতে তার বিরোধীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, এতে আবদুল ওহাব পিছিয়ে যেতে চাইলে তাকে আমরা সাহস দিই। আমি তাকে বলি, "নবুয়তের প্রাথমিক দিনগুলোতে রাসূল (সা)-এর দুশমন

আপনার চাইতে বেশি শক্তিশালী ছিল, এ কষ্ট, অপবাদ সহ্য করা ছাড়া কোনো দীর্ঘ পথ ও মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়। আমার সফলতার অন্য দিক হলো একবার তার বিরোধিতাকারি ১২৬ ব্যক্তি তাকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং আমি তা নস্যাৎ করে দিই।"

অবশেষে ইবনে ওহাব আমাকে বললেন, পুনর্বাসন মন্ত্রনালয়ের দেওয়া ৫ দফাকে কার্যকরী করার জন্য নিজের পূর্ণ চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। তবে দুটি বিষয়ে তিনি কোনো আশ্বাস দেননি প্রথমটি হলো-মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘর ধ্বংস করা, কেননা মুসলমান এত তাড়াতাড়ি রাজি হবে না। আর দ্বিতীয়টি ছিল তার সাধ্যের বাইরে তা হলো নতুন কোরআন লিপিবদ্ধ করা। তিনি এটা করতে রাজি ছিলেন না। এ ছাড়া তিনি মক্কা ও ইস্তামবুলের শাসকদের খুব ভয় করতেন। আমি তার কৈফিয়ত যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

ইবনে ওহাবের দাওয়াতের কয়েক বছর পর যখন ৫ দফা সফলতার চরম মনযিল পার করল, তখন ব্রিটিশ সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, রাজনৈতিকভাবে জযীরাতুল আরবে কিছু করা প্রয়োজন। এ কারণেই নিজ কর্মচারী মুহাম্মাদ ইবনে সউদকে ইবনে ওহাবের সাথে কাজ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি সউদি বংশের প্রথম বংশধর ছিলেন। তিনি ১১৪৭ হিজরীতে ওহাবী মাযহাব গ্রহণ করেন। আর তিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হতে নজদের শাসনকর্তাও ছিলেন। তিনি ১১৭৯ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। এ কাজ সমাধা করার জন্য মোহাম্মাদ ওয়াহাবের নিকট গোপনে একটি সাক্ষাৎকারী দল পাঠানো হয়। তারা মোহাম্মাদী দ্বীনের (ওহাবী মতবাদের) কাজে অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয় এবং তাকিদ দেয় দ্বীনী বিষয়ে ফয়সালার ভার পুরোপুরি ওয়াহাবের হাতে থাকবে কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ের ফয়সালার ভার ইবনে সউদের জিম্মায় থাকবে। এরা উভয়েই নজদের নিকট 'দরইয়াহ' শহরকে নিজেদের কর্মস্থল করে নেয়। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকার (ব্রিটিশ সরকার) সমস্ত আরবে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

CamScanner

[বি.দ্র. ব্রিটিশ গোয়েন্দার বর্ণনা বিশ্বাস অবিশ্বাস পাঠকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই বই প্রকাশের উদ্দেশ্য শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের গোয়েন্দাগিরির সত্যতা তুলে ধরা, ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করা নয়।]

১৫. তুর্কি খেলাফত ধ্বংসে যে গোয়েন্দার হাত ছিল

এরপর বলছি আরো একজন বিখ্যাত গোয়েন্দার কথা। ১৯২৪ সালে তুর্কি খেলাফত ধ্বংসে যার একচ্ছত্র ভূমিকা ছিল।

"সবাই স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সবার স্বপ্ন সমান নয়। যারা রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, তারা দিনের বেলা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নিজের স্বপ্নকে অসার জ্ঞান করে। কিন্তু যারা দিনের বেলা স্বপ্ন দেখে, তারা ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ! তারা চোখ খোলা রেখে স্বপ্ন দেখে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে চলে, সফল হয়। যেমনটা আমি করেছি!"- টি. ই. লরেন্স, সেভেন পিলারস অব উইজডম

ওপরের কথাগুলো বেশ পরিচিত লাগছে কি? লাগারই কথা, যদি আপনি চোখ কান খোলা রেখে থাকেন। ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের এরকমই একটি উক্তি সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন দেখা যায় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এবং মোটিভেশনাল স্পিচেও শোনা যায় অনেক। তবে এরকমই একটি উক্তি আবদুল কালামের অনেক আগেই করে গেছেন এক বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ, দুঃসাহসী যোদ্ধা, থমাস এডওয়ার্ড লরেন্স।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শক্তিশালী অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তেঁতে ওঠা আরব বিদ্রোহে অংশ নিয়ে, একজন ঠান্ডা মাথার অকুতোভয় সামরিক নেতা হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছিলেন তিনি। মোটর বাইক দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারানোর পূর্বেই 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' হিসেবে ইতিহাসে ভাস্বর হয়েছেন তিনি। তার জীবনী নিয়ে হলিউডে তৈরি হয়েছে বিখ্যাত সিনেমা 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া'। তবে তার জীবন

সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানতে ছবিটির ওপর নির্ভর না করাই ভালো। সেখানে নাটকীয়তার পরিমাণটা একটু বেশিই ছিল। যা-ই হোক, তার সংক্ষিপ্ত জীবনের গল্পই এখন শোনা যাক।

যুক্তরাজ্যের ওয়েলসের ট্রেমাডগ শহরে ১৮৮৮ সালের ১৬ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন থমাস এডওয়ার্ড লরেন্স। তার বাবা থমাস চ্যাপম্যানের স্বীকৃত সন্তান নন তিনি। তার মা সারাহ, চ্যাপম্যানের বাসায় গৃহশিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সূত্রে তাদের মধ্যে প্রণয় সংঘটিত হয় এবং অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জন্ম হয় লরেন্সের। অবশ্য এ সত্যটি লরেন্স জানতে পেরেছিলেন ১৯ বছর বয়সে। ততদিনে চ্যাপম্যান আর বেঁচে নেই। তবে লরেন্স নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করতে পারেন, কারণ চ্যাপম্যান তাকে ছেড়ে চলে যাননি কখনো। চ্যাপম্যান মৃত্যুর আগপর্যন্ত পিতৃস্নেহ দিয়ে গেছেন লরেন্সকে।

শৈশবেই জন্মস্থান ত্যাগ করে, পরিবারের সাথে অক্সফোর্ডে চলে আসেন লরেন্স। সেখানে একটি স্থানীয় স্কুলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পড়ালেখা সারেন। তার সম্মানে 'সিটি অব অক্সফোর্ড হাইস্কুল ফর বয়েজ' নামের সেই স্কুলের চারটি কক্ষের নাম 'লরেন্স কক্ষ' রাখা হয়েছিল পরবর্তীকালে। নিজের জীবনীতে তিনি দাবি করেছিলেন, ১৯০৫-০৭ সালে তিনি সেন্ট মো দুর্গে একটি ব্রিটিশ আর্টিলারির সাথে গোপনে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তার জনপ্রিয়তা যখন আকাশ ছোঁয়া, তখন অবশ্য তাকে নিয়ে কৌতূহলবশত অনেকে গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে, সেন্ট মো দুর্গের রেকর্ডে তার দাবির কোনো প্রমাণ নেই! যা-ই হোক, ১৯০৭ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেসাস কলেজে ভর্তি হন।

কৈশোরে লরেন্সের মাথায় প্রত্নতত্ত্বের ভূত চেপে বসে। তিনি প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে অনেক অমীমাংসিত রহস্য উদঘাটন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্ন দেখতেন। মধ্যযুগের নাইট সম্প্রদায়ের বীরত্বের ইতিহাস তাকে মুগ্ধ করত। তার এই আকর্ষণ তার ভ্রমণপিয়াসী মানসিকতার সাথেও দারুণভাবে মিলে যায়। অক্সফোর্ডে পড়াকালীন এর

আশেপাশের প্রায় সকল চার্চে তিনি পদচিহ্ন রেখেছেন, সংগ্রহ করেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি এবং পুরাকীর্তি। এ সময় তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু বেসনকে নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন সাইকেলে চেপে। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নাইট টেম্পলগুলোতে দুই বন্ধু গিয়ে সংগ্রহ করতেন মূল্যবান ধ্বংসাবশেষ এবং তথ্য-উপাত্ত। ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মে, তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সিরিয়ার ক্রুসেডার দুর্গগুলোতে ভ্রমণের নিমিত্তে পায়ে হেঁটে একাকী ভ্রমণ করেছিলেন ১ হাজার মাইলের বেশি পথ! প্রত্নতত্ত্বের জন্য তার আকর্ষণ ছিল এতটাই প্রবল।

প্রচণ্ড অধ্যবসায় আর আকর্ষণের জোরে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে স্নাতক পাশ করেন লরেন্স। মধ্যযুগীয় সাহিত্য পড়তে ভর্তি হন মাগদালিন কলেজে। কিন্তু তার মতো দুঃসাহসী মানুষের স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশান্ত পরিবেশে নয়। সর্বদা দুঃসাহসী সব অভিযানের পরিকল্পনা ঘুরতো তার মাথায়। অপেক্ষা ছিল কেবল একটি সুযোগের। সে সুযোগ আসে ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে। দ্বিতীয়বার ভাববার আর অবকাশ পাননি। সাথে সাথেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটিয়ে বৈরুতের উদ্দেশে রওনা দেন।

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় প্রয়োজন হয় বলে শিখেছিলেন একাধিক ভাষা। অনর্গল বলে যেতে পারতেন ফরাসি, জার্মান, তুর্কি, গ্রিক আর ল্যাটিন ভাষা। বৈরুতে গিয়ে আরবি ভাষাটাও শিখে ফেলেন। এ সময়টা ছিল তার উত্থানের প্রস্তুতিকালের মতো। ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি আরবদের শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তর গবেষণা এবং পড়ালেখা করতে লাগলেন। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই তৈরি হলো তার অসংখ্য বন্ধু। স্থানীয়দের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিশে যেতে শুধু যে ভাষাই শিখেছিলেন তা নয়, নিজের পোশাক পরিচ্ছদেও এনেছিলেন আমূল পরিবর্তন। আরবদের ঢঙে লম্বা জুব্বা আর মাথায় সুদৃশ্য উষ্ণীষে একেবারে আরবদের মতোই দেখাতো তাকে।

১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ততদিনে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জীবন-জীবিকা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি আর দিগন্তজোড়া ধু-ধু মরুভূমির প্রেমে

পড়ে গেছেন লরেন্স। প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের খাতিরে পায়ে হেঁটে, ঘোড়া কিংবা উটের পিঠে চড়ে মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ মরুভূমিই চষে বেড়ানো হয়ে গেছে তার। এসব কাজ করতে গিয়ে তৈরি করেন একটি চমৎকার ম্যাপ, যা ঘটনাক্রমে একজন ব্রিটিশ জেনারেলের নজরে আসে। জেনারেল ভদ্রলোক দেখলেন যে, তাদের হাতে থাকা ম্যাপের চেয়ে লরেন্সের ম্যাপ বহুগুণে নির্ভুল। তা ছাড়া লরেন্সের ম্যাপে যুদ্ধের জন্য কিছু কৌশলগত স্থান, যেমন নেগেভ মরুভূমি চিহ্নিত করা ছিল সুস্পষ্টভাবে, যেগুলো কিনা অটোমান সাম্রাজ্যের ব্যবহারের সম্ভাবনা ছিল। ফলে লরেন্সের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে। কায়রোতে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহের জন্য।

মরুভূমিতে যুদ্ধ করে ঠিক সুবিধা করতে পারছিল না ব্রিটিশ বাহিনী। কিন্তু তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে ১৯১৬ সালে আরব বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। আর সে বিদ্রোহে, বিদ্রোহীদের স্বাদরে গ্রহণ করে ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ বাহিনীর 'আরব ব্যুরো অব ফরেন অফিসার' থেকে লরেন্সকেই ঠিক করা হয় বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, কারণ লরেন্সের চেয়ে ভালোভাবে আরবদের সাথে মিশতে পারেনি কোনো ব্রিটিশ নাগরিকই। অন্যদিকে, লরেন্সের মনেও অটোম্যানদের প্রতি বিদ্বেষ এবং আরবদের প্রতি ভালোলাগা কাজ করত। তিনি তাই নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন সে প্রস্তাব।
আরব বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা ছিলেন মক্কার আমির ফয়সাল। লরেন্সের প্রথম কাজটি তাই ছিল আমির ফয়সালের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। তিনি বেশ কিছু যাযাবর উপজাতি গোষ্ঠীকে নিজের দলে ভেড়াতে সক্ষম হন। তাদের নিয়ে পৌঁছে যান আমির ফয়সালের কাছে। আমিরের অনুমতি নিয়েই শুরু হয় লরেন্সের সফল গেরিলা যুদ্ধ। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, তার অনুন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অপ্রশিক্ষিত বাহিনী, আধুনিক কামান গোলায় সজ্জিত অটোমান বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। তাই তিনি বেছে নিলেন গেরিলা আক্রমণের পথ। মদিনার মরুভূমির বুক চিরে চলে যাওয়া হেজাজ রেলওয়ের একটি ট্রেন লুট করেই তিনি অটোমান সাম্রাজ্যে প্রথম আঘাত হানেন। এই রেলওয়েই ছিল অটোমানদের অস্ত্র এবং খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের প্রধান ব্যবস্থা।

যুদ্ধে আকাবা বন্দর ছিল একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অটোমানরা যেকোনো ধরনের নৌ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শক্ত সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তারা যা ভাবতেও পারেনি, লরেন্স করলেন ঠিক তা-ই। আকাবার পেছনের দিকে ছিল বিস্তীর্ণ এক মরুভূমি, যা পেরিয়ে আসতে পথিমধ্যেই মারা পড়ে অধিকাংশ মানুষ। অটোমানরা নিশ্চিত ছিল যে এদিক দিয়ে কেউ আকাবা আক্রমণ করতে আসবে না। আর অটোমানদের এই নির্ভাবনার সুযোগটিই কাজে লাগালেন লরেন্স। নিজের পাগলাটে স্বভাবের উপজাতি বাহিনী নিয়ে তড়িৎ গতিতে আচমকা আক্রমণে দিশেহারা করে দিলেন অটোমান বাহিনীকে, দখল করে নিলেন আকাবা।

"আমার চেনা জানা আর কোনো মানুষের পক্ষে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়, যা লরেন্স করে দেখিয়েছেন!" -কমান্ডার জেনারেল স্যার এডমান্ড অ্যালেনবি

আকাবা দখলের পূর্বে, ব্রিটিশ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তাকে নিজের পরিকল্পনার কথা জানাননি লরেন্স। তথাপি, তাকে এর জন্য কোনো জবাদিহিতা করতে হয়নি। কারণ, অ্যালেনবি তাকে সে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আকাবা দখলের খবর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিজে এসে অ্যালেনবির কাছে পৌঁছেছিলেন লরেন্স। তার এই সাফল্যে, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন সকলে। আমির ফয়সালের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা আরো বেড়ে যায়। এ সময়ে অসংখ্য আক্রমণে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্ব দেন তিনি। অটোমানরা তাকে ধরার জন্য এতটাই হন্যে হয়ে ওঠে যে, তারা লরেন্সকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ২১ হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করে। কম মনে হচ্ছে? মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় আজকের দিনে তার মূল্য ২.১ মিলিয়ন ডলার! তার যুদ্ধে অংশগ্রহণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করা যাক।

* অটোমানদের মূল সরবারহ লাইন হেজাজ রেলওয়ে আক্রমণ।
* আবা এল নামক রেলওয়ে আক্রমণ এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা।
* আকাবার একটি আউটপোস্ট আক্রমণ। এখানে পরাজিত হয়েছিলেন লরেন্স।

* লেবাননের রাস বালবেক শহরের একটি ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া।

* মুদাওয়ারা শহরে আরো একটি রেলওয়ে আক্রমণ এবং একটি ট্রেন ধ্বংস করে দেওয়া।

* মৃত সাগরের দক্ষিণপূর্বে তাহফিলের যুদ্ধ, যেখানে একজন সাধারণ সৈনিক হিসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

* আকাবা আক্রমণ এবং দখল, যা তার সবচেয়ে বড় সফলতা বলে গণ্য করা হয়।

* আম্মান এবং ডেরার সংযোগ রেলওয়ে ধ্বংস করা।

১৯১৮ সালে, বিদ্রোহীরা এবং ব্রিটিশ বাহিনী সিরিয়ার দামেস্ক দখল করে নেয়। লরেন্স এই আক্রমণে বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি আমির ফয়সালকে প্রভিশনাল আরব সরকারের রাজা হতে সহায়তা করেন। কিন্তু ফয়সালের রাজত্বের মেয়াদ ছিল মাত্র ২ বছর। ১৯২০ সালে ফরাসি বাহিনী আরবে ফয়সালের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে, আরব অঞ্চলকে সাময়িকভাবে দুভাগে ভাগ করে। এর ফলেই পরবর্তীকালে ইরাক এবং সিরিয়া নামক দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের জন্ম। এই ঘটনা লরেন্সকে প্রচণ্ড আশাহত করে। তিনি একে আরবদের সাথে ব্রিটিশদের বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যায়িত করেন।

ব্রিটিশদের এহেন কর্মকাণ্ডে ব্যথিত হয়ে নিজের সামরিক পদ থেকে অব্যাহতি দেন লরেন্স। ১৯২২ সালের দিকে তিনি ছদ্মনামে 'রয়্যাল এয়ার ফোর্স' এ যোগ দিলেও শীঘ্রই তার পরিচিতি প্রকাশ পেয়ে যায় এবং তিনি এয়ার ফোর্স থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই, অন্য একটি ছদ্মনামে ব্রিটিশদের এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়ে চলে যান ভারতীয় উপমহাদেশের একটি বিমানঘাঁটিতে। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ এয়ারফোর্সের জন্য কাজ করেছিলেন। তার সকল কৃতিত্ব এবং বীরত্ব পৃথিবীকে জানানোর কাজটি যিনি করেছেন, তিনি সাংবাদিক লাউয়েল থমাস। থমাস যদি লরেন্সের জীবনের গল্প মিডিয়াতে প্রচার না

CamScanner

করতেন তাহলে হয়তো তার দুঃসাহসিক কৃতিত্বগুলো আমরা কোনোদিন জানতে পারতাম না। কেননা লরেন্স ছিলেন প্রচণ্ড রকমের একজন প্রচারবিমুখ মানুষ, যিনি নিজের ব্যাপারে কখনোই কারো কাছে গল্প করতেন না।

একজন উর্বর লেখকও ছিলেন লরেন্স। তার কলমে রচিত হয়েছে 'সেভেন পিলারস অব কিংডম' নামক অসাধারণ একটি গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত বই। এই বইটি আজও ইরাক, আফগানিস্তানের গেরিলা যোদ্ধারা সামরিক কৌশল রপ্ত করতে পড়েন। আরব বিদ্রোহ নিয়ে তার লেখা 'দ্য রিভোল্ট ইন দ্য ডেজার্ট' একাধিকবার বেস্ট সেলার হয়। ১৯৩৫ সালে তিনি এয়ার ফোর্সের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিভৃত জীবন বেছে নেয় লরেন্স।

লরেন্সের মোটরবাইকের শখ ছিল আকাশ ছোঁয়া। ব্রাফ সুপেরিয়র কোম্পানির ৭টি উন্নত এবং তখনকার সাপেক্ষে অত্যাধুনিক মোটরবাইক ছিল তার। এই মোটরবাইকেই তার মৃত্যু হয়। ১৯৩৫ সালের ১৩ মে ইংল্যান্ডের নটিংহ্যামের ডোরসেট নামক গ্রামে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় লরেন্স। ছয়দিন হাসপাতালে থাকার পর ১৯ মে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল মাত্র ৪৬ বছর। ডোরসেটের মোরিটন চার্চে সমাহিত করা হয় তাকে। তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উইনস্টন চার্চিল, যার সঙ্গে লরেন্স বেশ কিছুকাল একই অফিসে কাজ করতেন।

তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত হয়ে নিউরোসার্জন হিউ ক্রেইনস মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণগুলো নিয়ে গবেষণা করেন এবং ক্র্যাশ হেলমেট তৈরি করেন, যা শত শত বাইকারের জীবন রক্ষা করছে। তার সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের একটি উক্তি, "আমরা তার মতো কাউকে আর কোনোদিন খুঁজে পাবো না। তার নাম ইতিহাসে জ্বলজ্বল করবে, প্রতিটি যুদ্ধে স্মরণ করা হবে, আরব আখ্যানের সাথে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ কিন্তু...

ইসলামে অপরের গোপন বিষয়াদি খুঁজে বেড়ানো নিষেধ। ইসলামি সমাজে সাধারণ নাগরিক একে অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করবে না। কেউ কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। অন্যের গোপন জিনিস দেখবে না। অন্যের গোপন কথা শুনবে না। অন্যের গোপন বিষয় জানার জন্য অতিউৎসাহী হবে না। এ ব্যাপারে মাওলানা আব্দুর রহীম (রহ.) তার 'ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা' গ্রন্থে বলেন, 'ইসলাম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রধান উদ্যোক্তা। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও তার আকীদা বিশ্বাসের প্রতি ইসলামে শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ মানব সমাজের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে মানুষের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও ব্যক্তিগত অবস্থার গোপনীয়তা ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশেষ। এ কারণে ইসলাম কখনই মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারাদি, আকীদা, চিন্তা ভাবনা ও তৎপরতা বা কর্যকলাপে খোঁজখবর লয়ে বেড়ানোর প্রবণতাকে সমর্থন জানায়নি। এ দিকে ইঙ্গিত করেই কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাষায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছে, "এবং অপরের গোপনীয় বিষয়াদি খোঁজখুঁজি করে বেড়িও না।"[১]

অনুরূপভাবে কারোর ভিতরকার গোপনীয় বিষয়াদি যদি কেউ জানতেও পারে তখন তা জনগণের মধ্যে প্রচার করে দেওয়া ও সামাজিকভাবে তাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করা ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ কাজ বলে ঘোষিত। এ পর্যায়ে কুরআনের বাণী হচ্ছে, "এবং তোমরা একে অপরের গীবত করে বেড়িও না।"[২]

---

১. সূরা হুজরাত: ১২
২. সূরা হুজরাত: ১২

এই গীবত কার্যটি অত্যধিক ঘৃণা ও পরিত্যাজ্য হওয়ার কথা বোঝাবার জন্য। এর পরই দৃষ্টান্তমূলক কথা স্বরূপ বলা হয়েছে, "তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?.. তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক।[১]

'লোকদের গোপন দোষ খোঁজ করে বেড়িও না' এবং 'তোমরা পরস্পরের দোষ গেয়ে, প্রচার করে বেড়িও না' দুটি কথা একই আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে একটি মৌলনীতি উদঘাটিত হচ্ছে। আর তা হচ্ছে, অন্যদের গোপন তথ্য-রহস্য সংরক্ষণ করা। তা জানতে চেষ্টা করাই হারাম। কুরআনের ভাষায় তা চিরদিনের তরে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন, "তোমরা মুসলমানদের নিন্দা করো না, তাদের গোপনীয়তা খুঁজো না।"

সাধারণ কল্যাণ ও বিশেষ কল্যাণ

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, এই নিষেধ দুটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। সমাজ-সমষ্টির সাথে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, সামষ্টিক কল্যাণ এর দ্বারা ব্যাহত হয় না বলেই মনে করা যায়।

কিন্তু না, এ দুটো নিষিদ্ধ কাজই সংক্রামক এবং এর প্রতিক্রিয়া গোটা সমাজকে জর্জরিত করতে পারে। অন্য কথায় নিষিদ্ধ কাজ দুটির দুইটি দিক রয়েছে। একটি ব্যক্তিগত দিক আর অপরটি সামাজিক দিক। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তা না হলেও তেমন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু তা যখন সামষ্টিক রূপ পায়, তখন তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়! অথবা বলা যায়, ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি সন্ধান না করা হলেও তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সামষ্টিক ক্ষেত্রে অনেক সময় তা না করাই বরং অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন সমষ্টির কল্যাণকে ব্যক্তির ক্ষতির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া ছাড়া কোনোই উপায় থাকে না।

ইসলামি শরীয়াত মানুষের ব্যক্তিগত গোপন তথ্য জানতে চেষ্টা করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে এবং ব্যক্তিগণের গীবত করাকে সুস্পষ্ট হারাম

---

১. সূরা হুজরাত: ১২

ঘোষণা করেছে। কিন্তু সামষ্টিক প্রয়োজনে যদি ব্যক্তিগণের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং কারোর অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বলার আবশ্যকতা দেখা দেয়, তখন তা অবশ্যই করতে হবে, তখন ব্যক্তি অধিকারের ওপর সামষ্টিক প্রয়োজনকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। সে পর্যায়ে ব্যক্তিগণের দোষ খোঁজ করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ ত্রুটি জনগণের মধ্যে প্রচার করে দেওয়া সমষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্য একান্তই অপরিহার্য কর্তব্য।

বরং ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষে সমষ্টির স্বার্থ, তথা অস্তিত্ব রক্ষার্থে ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত জীবনের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য চেষ্টা করা ও সেই পর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধান করা ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিগণের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত না থাকে, তাহলে রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হতে পারে না। এমনকি এরূপ অবস্থা দেখা দেওয়াও অসম্ভব নয় যে, ব্যক্তিগণের প্রবণতা, চরিত্র ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সরকারের অবহিতির অভাবের দরুন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কেননা, সমাজে এসব ব্যক্তিদের অস্তিত্ব ও অবস্থান অকল্পনীয় নয়, যারা রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্যকলাপে গোপনভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এই লোকদের তৎপরতা যথাসময়ে বন্ধ করা না হলে তা গোটা সমাজে ও রাষ্ট্রকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

এরূপ অবস্থায় ইসলামি রাষ্ট্র সরকারের পক্ষে সেদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক সম্পর্কে অবহিতি রাখা এবং তার তৎপরতা ও গতিবিধি লক্ষ করা যে একান্তই কর্তব্য তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। একথা যেমন সাধারণ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্মত, তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেও স্বীকৃত।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্যপন্থি রাষ্ট্র সরকারের নীতিতে জনগণকে হয়রান পেরেশান করার লক্ষ্যে বা পদে পদে তাদেরকে উত্যক্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে এ কাজ করা যাবে না। তা করা হলে তা কুরআনের উদ্ধৃত নিষেধের আওতায় পড়বে এবং অত্যন্ত গুনাহের কাজ হবে। বরং সত্যি কথা হচ্ছে, তা করার অধিকার ইসলামি রাষ্ট্রের নেই।

CamScanner

মাদানীয় সমাজের মুনাফিকরা ইসলামের দুশমনদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত গোয়েন্দা হিসেবে কার্যকর ছিল। তারা মুসলমানদের যাবতীয় গোপন তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে সঙ্গোপনে শত্রুদের জানিয়ে দিত। এ পর্যায়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "ওরা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধে গমন করত, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছু বাড়িয়ে দিত না। ওরা তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা চালাচ্ছে আর তোমাদের লোকদের অবস্থা এই যে, তাদের কথা বিশেষ উৎকর্ণতা সহকারে শুনতে সচেষ্ট অনেক লোকই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ্ এই জালিমদের খুব ভালো করেই জানেন।"[১]

ইসলামি সমাজের মুনাফিকদের চরিত্র ও ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে উক্ত আয়াতে কথা বলা হয়েছে। ওরাই কাফির মুশরিক- ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করত। তারা অবস্থান করত মুসলমানদের মধ্যে; কিন্তু কাজ করত শত্রুদের জন্য।

ইসলাম ও মুসলমানদের সামষ্টিক স্বার্থে ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে কাফিরদের নিয়োজিত গোয়েন্দাদের ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর তৎপরতা ধরা পড়ে যেতে লাগল। তখন মুনাফিকরাই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের চিৎকার বা আপত্তির জবাবে ইরশাদ করলেন, "এদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের কথাবার্তা দ্বারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে-এই ব্যক্তি বড় কান-কথা শুনে। বল, তিনি তো তোমাদেরই ভালোর জন্য এরূপ করেন। আল্লাহর প্রতি তিনি ঈমান রাখেন এবং ঈমানদার লোকদের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি তাদের জন্য রহমত, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার। বস্তুত যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট ও জ্বালা দেয়, তাদের জন্য পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।[২]

---

১. সূরা তাওবাহ : ৪৭
২. সূরা তাওবাহ: ৬১

অর্থাৎ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিকট খবর সংগ্রহ করেন, লোকেরা তাঁকে সর্ববিষয়ে জানায়। তাঁর এই খবর শ্রবণ সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে, সত্যকে উদঘাটিত করার উদ্দেশ্যে, কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে নয়, অকারণে কারোর প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়েও নয়, কারোর ক্ষতি সাধনও তার লক্ষ্য নয়। আর তাঁকে খবরদাতা লোকেরা যেহেতু ঈমানদার, নিষ্ঠাবান, সেই কারণে তিনি তাদের নিকট থেকে পাওয়া খবরকে সত্য বলে বিশ্বাসও করেন। কাজেই তাঁর এই কাজ মু'মিনদের জন্য রহমতস্বরূপ। আর হে মুনাফিকরা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কথা শুনলেও বিশ্বাস করেন না। কেননা তোমাদের প্রকৃত অবস্থা অপ্রকাশ্য ও অজ্ঞাত। উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহর বক্তব্য হলো, "রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফির শত্রুদের গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের খবরাদি জানতে পারেন। তার মূলে তাঁর উদ্দেশ্য মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ। কাফিরদের আকস্মিক ও অতর্কিত আক্রমণ থেকে মুসলিম জনগণকে রক্ষা করাও তাঁরই অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এজন্য মুসলিম জনগণকে সব সময় উৎকর্ণ, সতর্ক, সদা-সচেতন, জাগ্রত ও অবহিত করে রাখার জন্যই সংবাদ সংগ্রহকারী বিশেষ দায়িত্বশীল লোক নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং তিনি তা-ই করেছিলেন।"

উহুদ যুদ্ধের পর এক সময় বনূ আসাদ গোত্র মদীনার ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়োগকৃত সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহকারীগণ সঙ্গে সঙ্গেই তাদের এই প্রস্তুতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিলেন এবং তিনি আগে ভাগেই একটি শক্তিশালী বাহিনী তাদের মস্তক চূর্ণ করার জন্য হযরত আবু সালমার নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের হতচকিত করে দিয়েছিলেন। তারা সবকিছু ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা বিপুল গনীমতের মাল লাভ করেন।

অতএব, ইসলামি রাষ্ট্রকেও অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সংবাদ সরবরাহকারী একটা সদা তৎপর কার্যকর সংস্থা অবশ্যই গড়ে তুলতে

হবে। একদিকে সাধারণ নাগরিকদের অভাব-অনটন-প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হয়ে যথাসময়ে, অবিলম্বে, তা পূরণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপরদিকে ইসলামের দুশমনদের গোপন ক্ষতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিতি লাভ করে তাৎক্ষণিকভাবে তা নস্যাৎ করে দেওয়ার এবং মুসলিম জনগণ ও ইসলামি রাষ্ট্রকে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য এরূপ একটি সংস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। সেই সাথে এই সংস্থাকে আরও তিন পর্যায়ের কাজ করতে হবে:

১. ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করা, যেন তারা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব, যা তাদের নিকট আমানত, যথাযথভাবে পালন করতে পারে ও তাতে কোনোরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি, অবজ্ঞা-অবহেলা-উপেক্ষা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ না ঘটে।

২. শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর চলাচল ও গতিবিধি লক্ষ করা, যেন যথাসময়ে যে-কোনো আগ্রাসনকে প্রতিরোধ না ঘটে।

৩. বিদেশি লোকদের গতিবিধি ও তৎপরতা তীক্ষ্ণভাবে নজরে রাখা, যেন তারা শত্রুপক্ষের জন্য কোনো গোয়েন্দাগিরি করতে বা দেশের অভ্যন্তরে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে।

সরকারি কর্মচারীদের পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ (control)

ইসলামি রাষ্ট্রের বাস্তবতামূলক প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, জনগণের কল্যাণ সাধন এবং পূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা সহকারে আল্লাহর আইন-বিধানসমূহ পুরাপুরি কার্যকর করা। তাই এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত জনগণের ধন-ভান্ডার থেকে নিয়মিত বেতন ভাতা প্রাপ্ত লোকেরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কিনা, সেদিকে অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইসলামের বিশেষ চেষ্টা থাকে, সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের নিয়োগ, যেন জনগণ সর্বাধিক উন্নতমানের খেদমত (service) লাভ করতে পারে। ইসলামের এই লক্ষ্য পুরামাত্রায় অর্জিত হচ্ছে কিনা, কর্মচারীবৃন্দ সততা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে দায়িত্ব পালন করছে কিনা, জনগণের সাথে আদর্শিক ও মানবিক আচরণ গ্রহণ

করছে কিনা, তা-ও সরকারি কর্তৃপক্ষকে তীক্ষ্ণভাবে দেখতে হবে। অন্যথায় ইসলামি রাষ্ট্র তার আসল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই বাইরে কোথাও কোনো বাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন তিনি তার সাথে এমন সব বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য লোক পাঠাতেন, যারা বাহিনীর লোকদের খবরাখবর জেনে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানাত।

হযরত আলী (রা) খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে মালিক আশতারকে লিখিত পত্রে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর নিয়োজিত কর্মচারীদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য লোক নিয়োগ করেন। এ পর্যায়ে তাঁর নির্দেশ ছিল, সরকারি কর্মচারীদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ কর। তারা যদি গোপনে তাদের ব্যাপারাদি তোমাকে জানাতে থাকে, তাহলে আমানত রক্ষা ও জনগণের প্রতি দয়ার্দ্রতা প্রদর্শনে তারা সতর্ক ও সক্রিয় হবে। এদের সহযোগিতায় তুমিও রক্ষা পাবে। তোমার নিকট যদি এমন খরব পৌঁছায় যে, তারা বিশ্বাসভঙ্গের উদ্যোগ নিচ্ছে, তাহলে তোমার নিযুক্ত খবরদাতা লোকদেরকে সেজন্য সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করবে। পরে তাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করবে এবং তারা কাজের যে ক্ষতি সাধন করেছে, তার পূরণ করতে পারবে। পরে অপরাধীদের লাঞ্ছিত করবে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে দায়ী করে এবং একটা লজ্জা তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেবে।

বস্তুত গোপন উপায়ে জনগণের ও সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের গোপন তত্ত্ব উদঘাটন করার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তবে পূর্বে এ ব্যাপারটি আধুনিক কালের মতো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বর্তমানে তো এটা একটি বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে উন্নীত বিষয়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে তা একটি বিষয়রূপে গণ্য করা হয়েছে।

শত্রু সৈন্যদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ

স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে পুরাপুরি কার্যকর করে

তুলেছিলেন, বিশেষ করে শত্রু পক্ষের সেনাবাহিনীর ব্যবস্থা করেছিলেন, এই ব্যবস্থার সাহায্যে যথেষ্ট কল্যাণ লাভ করেছেন। তাঁরা সামরিক বিজয়ে এই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধজয়ের ইতিহাসে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়োজিত ব্যক্তিরা গোপনে প্রতিপক্ষের তৎপরতা ও গতিবিধি যা কিছু দেখতে পেত, তার যথাযথ বিবরণ তাঁকে জানিয়ে দিত। ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর মোকাবিলায় আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন এমনভাবে যে, শত্রুপক্ষ কিছুই কল্পনা করতে পারত না। তারা তাদের পদক্ষেপের পূর্বেই আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত, তেমনি ইসলামি বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। কুরআন মজীদের একটি সূরা'র নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলি সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। "শপথ সেই (ঘোড়াগুলেরা), যা হ্রেষা ধ্বনি করে দৌড়ায়, পরে (নিজেদের ক্ষুর দিয়ে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝাড়ে, আর অতি প্রত্যুষকালে আকস্মিক আক্রমণ চালায়।"[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকবে, রাত্রিবেলা চলবে এবং গোয়েন্দা সাহায্য যেন কখনই বিচ্ছিন্ন না হয়।'

১. বদর যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে এক আরব গোত্রপতির বাড়িতে অবস্থান নিলেন। তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে খবরাখবর জানবার চেষ্টা করলেন। তিনি আরব গোত্রপতিকে কুরাইশ এবং মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে চিন্তাভারাক্রান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন। বলা বাহুল্য, লোকটি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চিনতে পারেনি। জবাবে গোত্র প্রধান বলল, শুনেছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা অমুক দিন মদীনা থেকে বের হয়ে এসেছেন। এই খবর

---

১. সূরা আল-আদিয়াতঃ ১-৩

সত্য হলে আজ তাঁর আমার এই স্থানে উপস্থিত হওয়ার কথা। আর এ-ও খবর পেয়েছি যে, তারাও অমুক দিন মক্কা থেকে বের হয়ে এসেছে। এ খবর সত্য হলে আজ তাদের অমুক স্থানে উপস্থিত হওয়ার কথা, সেটা ঠিক সেই স্থানই ছিল, যেখানে কুরাইশরা সেই দিন অবস্থান নিয়েছিল।

২. 'বদর'-এ উপস্থিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন কুরাইশদের সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহের জন্য। তাঁরা দুইজন ক্রীতদাস ধরে নিয়ে এলেন। তাদের নিকট থেকে কুরাইশ বাহিনীর অবস্থান, তার লোকসংখ্যা এবং নেতৃত্বে কারা কারা রয়েছে ইত্যাদি সর্ববিষয়ে আগাম খবর পাওয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বললেন, 'এবারে মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলিকে তোমাদের সম্মুখে পেশ করে দিয়েছে।'[১]

মোটকথা, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে শত্রু বাহিনীর মধ্যে ও তাদের এলাকায় গোয়েন্দাগিরির কাজে নিযুক্ত করতেন, তাদের পাঠানো খবরের ভিত্তিতে তিনি যুদ্ধের কৌশল তৈরি করতেন এবং শত্রুপক্ষের সব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ ও নিস্ফল করে দিতেন।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা)-কে একটি গোয়েন্দা বাহিনীর নেতা বানিয়ে মক্কায় পাঠালেন। সঙ্গে একখানি মুখ বন্ধ করা পত্র দিয়ে দিলেন। বললেন, 'দুই দিন দুই রাত্রি পথ চলার পর এই পত্র খুলে পড়বে এবং তাতে যে নির্দেশ লেখা রয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ করবে।' দুই দিন পথ চলার পর পত্রখানা খোলা হলে দেখা গেল, তাতে লিখিত রয়েছে, 'আমার এই পত্র পাঠ করার পর কিছু দূর চললেই মক্কা ও তায়েফ-এর মধ্যবর্তী নাখালা নামক স্থানে (অথবা খেজুর

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৬১৮ পৃঃ

বাগানে) উপস্থিত হবে এবং তথায় ঘুপটি মেরে বসে থেকে কুরাইশদের সম্পর্কে খবরাখবর জানবে এবং আমাদের আগাম জানাবে।"[১]

খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ এবং ইয়াহুদী ও গাতফান ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেমেছিল। এই সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে, তার ফলে তাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ বেঁধে যায়। পরে তিনি হুযায়ফাতা ইবনুল-ইয়ামান (রা)-কে পাঠিয়ে তাদের ভেতরকার অবস্থা জানবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহীত কৌশল এক শত ভাগ সফল হয়েছিল। হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা) কুরাইশদের ইচ্ছা, সংকল্প ও যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ ও বিস্তারিত খবর দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকভাবে এই সত্য প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক শত্রুপক্ষ সম্পর্কে আগাম খবর জানার জন্য গৃহীত এই পন্থা ছিল তদানীন্তন আন্তর্জাতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব। সেকালের কোনো রাষ্ট্রনায়ক বা সমরবিদের পক্ষে ও ধরনের কোনো কর্মপ্রন্থা গ্রহণের চিন্তা করাও সম্ভব হয়নি। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় আল্লাহ এই কথায় সত্যতা, "আর যারাই কেবল আমাদের জন্য ও আমাদের দেখিয়ে দেওয়া পথে জিহাদ করবে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের নির্ভুল পথ ও উপায় পন্থাসমূহ জানিয়ে দেব। আর বস্তুতই আল্লাহ তো কেবল তাদের সঙ্গেই রয়েছেন যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আত্মোৎসর্গের ভাবধারাসম্পন্ন।"[২]

এই সত্যের প্রতি লক্ষ রেখেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেছেন, 'একজন সদা সচেতন মেধাবী-প্রতিভাসম্পন্ন সূক্ষ্ম খবর সংগ্রহকারী লোক বিশ হাজার যোদ্ধার তুলনায় যুদ্ধের ময়দানে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।'

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৬০২ পৃ.

তাবুক যুদ্ধে রওনার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লোক মারফত খবর পেয়েছিলেন যে, মদীনারই একটি বাড়িতে কিছু সংখ্যক মুনাফিক একত্রিত হয়ে লোকদেরকে যুদ্ধযাত্রায় বিলম্ব করার জন্য উসকানি দিচ্ছে। তিনি এ খবর পাওয়ার পর হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-কে কতিপয় লোকসহ তথায় পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সভা-গৃহকে জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা-ই করা হয়েছিল।

এ থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য লোক মদীনার সর্বত্র নিয়োজিত ছিল যাবতীয় খবরাখবর যথাসময় তাঁর নিকট পৌঁছাবার জন্য। উক্ত ঘটনা তার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। ফলে মদীনার ইয়াহুদীরা অত্যন্ত গোপনে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করেছে, তা সব আগাম খবর পেয়ে তিনি ছিন্নভিন্ন ও ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

খায়বর যুদ্ধে ইয়াহুদীদের সুরক্ষিত প্রাচীনতর দুর্গজয় করাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে এই পন্থায় সাহায্যে সহজ ও সম্ভব হয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত কথা হলো, ইসলাম রাষ্ট্রকে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থাকে অত্যাধুনিক সাজ-সজ্জা সহকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বহিরাগতদের তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

ইসলামি রাষ্ট্রের তৃতীয় পর্যায়ের সাধারণ শান্তিরক্ষা ও সংবাদ সংগ্রহমূলক কাজ হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শত্রুপক্ষীয় লোকজনের আগমন, গতিবিধি ও তৎপরতা সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম সতর্কতার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা। কেননা, দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রই দেশের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহিনীর উদ্ভবকে বরদাশত করতে পারে না, পারে না সেইরূপ অবস্থার কোনোরূপ সুযোগ করে দিতে। কেননা, তা-ই বহু রাষ্ট্র ও সরকারের পতনের কারণ হয়ে দেখা দেয়। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও এই নীতি অবলম্বন ও পুরাপুরি কার্যকর করেছিলেন। আর এই উপায়ে তিনি

CamScanner

শত্রুদের বহু ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম রোধ করতে ও তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা জীবন ও তৎপরতা প্রমাণ করে যে, তিনি এ উপায়ে বহু শত্রুকে সত্য দ্বীন-ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। আর এই তৎপরতার লক্ষ্যও ছিল তাই। এর ফলে তিনি বহু রক্তপাত এড়িয়ে যেতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যেসব যুদ্ধ-জিহাদে অংশ গ্রহণ করতেন কিংবা শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য কোনো বাহিনী কোথাও পাঠাতেন, তার মূলে নিহিত উদ্দেশ্য থাকত শত্রুদের ঐক্যবদ্ধতা ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া। তাদের ঐক্যের কাতারে ব্যাপক ভাঙন ধরানো। কেননা, তিনি জানতেন ইসলামের পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে গেলে ইসলামের মর্মস্পর্শী মহাসত্যের বাণী জনগণের হৃদয়-মনকে সহজেই স্পর্শ করবে ও দ্বীন-গ্রহণ করতে তাদের আর কোনো বিলম্ব হবে না

বস্তুত কাফির শত্রুরা যখন ঐক্যশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়, মানুষ তখন তার স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে প্রত্যাবর্তন করে নির্ভুল পথের সন্ধানে খুব বেশি আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়ে পড়ে, ঠিক তখন-ই ইসলাম তাদের দিলে প্রবেশ করতে পারে। পারে তাকে টেনে এনে ইসলামি মুজাহিদদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিতে। এ তত্ত্বের সত্যতা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কেননা, বহু সংখ্যক জাতি-গোত্র ও জনগোষ্ঠী ইসলামি শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে সত্য পথ প্রাপ্তির দ্বারে উপস্থিত হয়েছে এবং সত্যকে গ্রহণ করে জীবনকে ধন্য করতেও প্রস্তুত হয়ে গেছে।

মক্কা বিজয়ের ঘটনা দ্বারা এ কথা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, মক্কা বিজিত হলে শত্রুদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলে

এবং জনগণ শান্ত-নির্ঝঞ্ঝাট পরিমণ্ডলে গভীর সূক্ষ্ম অনাসক্ত দৃষ্টিতে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পেলে খুব বেশি দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই তারা তাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা দ্বীন-ইসলামের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারবে এবং পরিশেষে কবুল করতেও বিলম্ব হবে না। এ কারণে তিনি মক্কার কুরাইশদের ওপর বিজয়ী হবেন -এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন এবং এ সংকল্পও তাঁর ছিল যে, এ বিজয় সার্বিক হতে হবে। এ কাজ সম্ভব হতে পেরেছিল গোটা পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে গোপন থাকার ও কারোরই সে বিষয়ে একটি অক্ষরও জানতে না পারার কারণে। বস্তুত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা আক্রমণের পরিল্পনা কোনো একজন সাহাবীরও জানা ছিল না। কেবল হযরত হাতিব ইবনে আবূ বলতায়া (রা) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্ততা ও উদ্বিগ্নতা দেখে নিজেই আঁচ করেছিলেন এবং এবারের লক্ষ্য মক্কা হতে পারে বলে মনে করেছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ তখনও মক্কায় অবস্থান করছিল। তাদের নিরাপত্তার কোনো বিঘ্ন হতে পারে মনে করে মক্কাগামী এক বৃদ্ধার মাধ্যমে কুরাইশ সরদারদের নিকট লিখিত এক পত্রে এ কথা জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাসময় অবহিতি লাভ করেন ও এক বাহিনী পাঠিয়ে সেই চিঠি উদ্ধার করেন। এই প্রেক্ষিতেই কুরআন মজীদের এ আয়াতটি নাযিল হয়, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক বানিয়ো না, ভালোবাসা পোষণ করে তাদেরকে (গোপন কথা) জানিয়ে দাও, অথচ ওরা অমান্য-অস্বীকার করেছে সেই মহাসত্যকে যা তোমাদের নিকট এসেছে। ওরা রাসূলকে এবং বিশেষ করে তোমাদেরকে (মক্কা থেকে) বহিস্কৃত করেছে শুধু এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের রব্ব্ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।"[১]

এভাবে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ শাসন এলাকায় শত্রুদের পক্ষে কোনো গোয়েন্দাগিরি (Spying) করতে

---

১. সূরা আলমুমতাহিনা : ১

দেননি। যখনই এই পর্যায়ে কোনো কাজ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা জানতে পেরে সমস্ত পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ লিখেছেন:

"ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য যে, মুশরিক দেশে যাওয়ার পথসমূহে সীমান্তবর্তী সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী থাকবে, তারা সেদিকে গমনকারী বা তথা থেকে আগমনকারী ব্যবসায়ীদের তল্লাশি চালাবে। গমনাগমনকারীদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গেলে তা কেড়ে নেবে, কারোর নিকট পত্রাদি থাকলে তা পড়ে দেখবে। তাতে মুসলমানদের কোনো গোপন ও অপ্রকাশনীয় তথ্য লিখিত থাকলে তাকে পাকড়াও করবে এবং তাকে সরকারে সোপর্দ করবে তার বিচার করার উদ্দেশ্যে।"[১]

ইসলামি রাজ্যের যেসব লোক বিদেশি শক্তির স্বার্থে গোয়েন্দাগিরি করে, ইসলাম তাদের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক (যিম্মী)রাও যদি বিদেশি শক্তির স্বার্থে ও তার নির্দেশে ইসলামি রাজ্যের অভ্যন্তরে কোনো গোয়েন্দাগিরি করে, তাহলে যিম্মীদের নাগরিকত্ব লাভের প্রধান শর্তই ভঙ্গ করা হবে। কেননা যিম্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে:

"তারা মুসলমানদের কোনোরূপ কষ্ট দেবে না, মান-সম্মান-আবরু নষ্ট করার মতো কোনো কাজ; যেমন, মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচার, অন্যান্য চরিত্রহীনতার কাজ, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই করে তাদের ধন-মাল হরণ এবং বাইরের মুশরিক-ইসলাম দুশমনদের জন্য গোয়েন্দাগিরি করা ইত্যাদি কাজ করবে না। এর কোনো একটি কাজ ও করলে তাদের নাগরিকত্বের শর্ত চূর্ণ হয়ে যাবে।"[২]

---

১. কিতাবুল খেরাজ লিআবি ইউসুফ, তবআতুল কাহেরাহ
২. শরাইউল ইসলাম, কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ১১৯

যিম্মীদের জন্য এই বাধ্যবাধকতাও রয়েছে যে, তারা দেশের মুসলমানদের কোনো গোপন খবর বাইরের শত্রুদের নিকট পৌঁছাবে না, তাদের গোপন প্রস্তুতি ও শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করবে না। কেউ তা করলে সে তার নাগরিকত্বের শর্ত ভঙ্গ করেছে বলে ধরে নিতে হবে। তখন তার রক্ত হালাল। অতঃপর তার ব্যাপারে আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদের কোনো দায়িত্ব (যিম্মীদারী) থাকলো না।[১]

আপনি গোয়েন্দাকর্মে লিপ্ত লোকদের ফয়সালা জানতে চেয়েছেন, যাদেরকে পাকড়াও করা হবে। তারা হয় যিম্মী হবে, না হয় যুদ্ধকারী শত্রুপক্ষের লোক হবে অথবা মুসলমান হবে।

তারা যদি সামরিক প্রতিপক্ষের লোক হয় কিংবা হয় যিম্মী -যারা জিযিয়া দেয়, তারা ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজারি যা-ই হোক, তাদের হত্যা করতে হবে, আর যদি মুসলমানদের কেউ হয় -ইসলাম পালনে সুপরিচিত, তাহলে তাকে কঠিন যন্ত্রণার দণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি আটকে বন্দি করতে হবে, যেন শেষ পর্যন্ত সে তওবা করতে পারে।[২]

বস্তুত বিদেশি শক্তির পক্ষে ইসলামের রাজ্যে গোয়েন্দাগিরি করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মারাত্মক দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য। এ বিষয়ে ইসলামে মৌল নীতিই দেওয়া হয়েছে, বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি আইন দেওয়া হয়নি। কেননা গোয়েন্দাগিরির কোনো স্থায়ী একটিমাত্র রূপ বা ধরন নেই। তা নিত্য নতুন রূপে সংঘটিত হতে পারে। তাই ইসলামের মৌলনীতির। ভিত্তিতে বিস্তারিত আইন-বিধি রচনা করার দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য খবর সংগ্রহকারী লোক নিয়োগ করেছেন এবং তাদের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে তিনি যুদ্ধকৌশল রচনা করেছেন, তা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত।

ইয়াফে নামক মদীনার এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন হযরত জায়েদ ইবনে আরকম। তাঁকে মদীনার মুনাফিকদের ওপর দৃষ্টি রাখার জন্য

---

১. তাজকিরাতুল ফোকাহা, পৃ. ৪৪২
২. কিতাবুল খেরাজ, পৃ. ২০৫-২০৬

CamScanner

দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়েছিল। বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রধান মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবেন উবাই গোপনভাবেই বলেছিল, 'মদীনায় পৌঁছার পর আমাদের মধ্যকার অধিক সম্মানিত ব্যক্তি অধিক হীন ব্যক্তিকে বহিষ্কার করবে।' হযরত জায়েদ তা শুনতে পেয়ে উপস্থিতভাবে তাকে যা বলার তা তো বললেনই, সঙ্গে সঙ্গে তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানিয়ে দিলেন।

ইসলামি রাষ্ট্রকে এজন্য লোকদেরকে বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণে তৈরি করতে ও সংশ্লিষ্ট কাজে বিশেষ দক্ষ, সাহসী ও সুকৌশলী বানাতে হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এর ওপর যেমন ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, অনুরূপভাবে মুসলিম জনগণের ইসলামি জীবনযাপন ও ইসলামি আইন-বিধানের পূর্ণ কার্যকারিতাও এর ওপর নির্ভর করে। তাই এই বিভাগটিই ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

CamScanner

তৃতীয় অধ্যায়

১. মোসাদ কী?

বর্তমান বিশ্বের সব থেকে দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার নাম মোসাদ (গঙঝঝঅউ)। বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে চালানো জরিপে এই তথ্য বহুবার শীর্ষ মিডিয়াগুলোতে এসেছে। মোসাদ ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা, যা দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সরাসরি পরিচালিত হয়ে থাকে। ফিলিস্তিনের জমিনে জবর দখল করে প্রতিষ্ঠিত ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী সংস্থাটির প্রধান। পৃথিবীর সব জায়গাতে যেকোনো পরিস্থিতিতে অপারেশন চালানোর ক্ষমতা রাখে ইসরাঈল সরকারের এই বিশেষ এলিট বাহিনী।

শাব্দিকভাবে মোসাদ হিব্রু ভাষার শব্দ। হিব্রু ভাষায় শব্দটি লেখে এভাবে המוסד ;আরবিতে লেখে الموساد অর্থ হয়- দ্য ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান। (হিব্রু ভাষায়: המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, অর্থ-"দ্য ইনস্টিটিউট অভ ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল অপারেশনস"; আরবি: الموساد للاستخبارات والمهام الخاصة *al-Mōsād lil-Istikhbārāt wal-Mahāmm al-Khāṣṣah*) বাংলা পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় 'গোয়েন্দা তথ্য এবং বিশেষ অভিযানের প্রতিষ্ঠান'।

মোসাদকে জানতে হলে ইহুদি জাতির ইতিহাস সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হবে। কারণ, মোসাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইহুদিস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য। যদিও তাদের রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খ্রিষ্টানদের সহযোগিতায়।

ইহুদিরা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়মিত তাড়া খেয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ঢুকতে থাকে। এর মধ্যে ইউরোপিয়ান একটি চালও

ছিল। খ্রিষ্টানরা যেহেতু ইহুদিদের পছন্দ করত না তাই তারাও চাচ্ছিল মুসলমানদের এলাকায় তাদের ঢুকিয়ে দিতে। আর এই সুযোগে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে যাযাবর জীবনের অবসান চাচ্ছিলে ইহুদিরা।

এতগুলো বছর তাদের ঐক্য ধরে রাখার বড় শক্তি ছিল ধর্ম। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়লেও ইহুদি সম্প্রদায়ের সব সময় স্বপ্ন ছিল তারা তাদের নিজ দেশ ইসরাঈলে ফিরে যাবে যদিও তখনো এর কোনো ভৌগোলিক অস্তিত্ব ছিল না। ইসরাঈল তাদের মাতৃভূমি ও ধর্মভূমিই শুধু নয়, তাদের স্বপ্ন ভূমিও বটে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্বপ্ন দেখেছে ইসরাঈল নামের দেশের। নেক্সট ইয়ার ইন জেরুজালেম - এই স্লোগান মাথায় রেখে বহু ইহুদি মারা গিয়েছে। ইসরাঈলের জন্য তারা সাধ্যমতো দান করেছে, ধর্ম ও বিশ্বাস দিয়ে নিজেদের এক করে রেখেছে। সংখ্যায় অত্যন্ত কম হওয়ার পরও ক্ষুরধার বুদ্ধি, কৌশল ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে নিজেদের বসিয়েছে।

২. মোসাদের জন্ম যেভাবে

আরব লীগের প্রত্যাখানের মুখে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে ইসরাঈলকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠার ১৯ মাসের মাথায় দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডাভিড বেন গুরিয়ন 'মোসাদ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে 'দ্য সেন্ট্রাল ইন্সিটিটিউট ফর কো-অরডিনেশন' নামে মোসাদের কর্যক্রম শুরু হয় তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালের মার্চে।

ইউরোপের জার্মানিতে হিটলারের ৬০ লাখ ইহুদি নিধনযজ্ঞ বা 'হলোকাস্টে'র দুঃস্বপ্ন তাড়িয়ে বেড়াত ইহুদিদের। ফলে আরও একবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দূর করতে যে কোনো পদক্ষেপ নিতে শুরু থেকেই প্রস্তুতি নেয় এই ইহুদি রাষ্ট্র। তারই একটি প্রকাশ্য পদক্ষেপ মোসাদ গঠন। ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার আগেই যেসব ইহুদি নিষিদ্ধ সংগঠন সংগ্রাম চালাচ্ছিল, তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে যে কাঠামো

গড়ে উঠেছিল, তাকে 'মোসাদ'-এর পূর্বসূরি বলা হয়। ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদে ১৯৩১ সালে ইহুদি নেতারা ইরগুন জাই লিউমি ও হাগানা নামে দুটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। এই সংগঠন দুটির হাত ধরেই মোসাদের জন্ম। মোসাদ সামরিক সার্ভিস নয়। যদিও অধিকাংশ কর্মকর্তাই ইসরাঈলের ডিফেন্স ফোর্সের।

১৯৪৯ সালে মোসাদের জন্ম হলেও ১৯৯৬ পর্যন্ত কেউই জানতো না এই সংস্থাটার প্রধানের কথা। ১৯৯৬ সালে যখন সাবতাইকে অপসারণ করে ডেনি ইয়াতমকে নিয়োগ দেওয়া হয় এক ঘোষণার মাধ্যমে, তখন প্রথমবারের মতো বিশ্ববাসী জানতে পারে এই সংস্থাটার প্রধান কে। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ২৮তম কম্যুনিস্ট সম্মেলনে যখন নিকিটা ক্রুশ্চেভ এক গোপন মিটিংয়ে 'স্টালিনকে' অভিযুক্ত ও অস্বীকার করে নিজেই প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করে, ওই বক্তব্যের এক কপি মোসাদ সিআইএর হাতে দিয়ে দেয়। এই প্রথম সিআইএ মোসাদের কার্যক্রম উপলব্ধি করে যাতে সিআইএ অভিভূত হয়। কারণ, সিআইএর মতো সংস্থাটিও এই রকম একটা সেন্সেটিভ সংবাদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিল।

৩. মোসাদ কী করে?

মোসাদ সাধারণভাবে বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা, গুপ্তহত্যা, বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণে সহায়তা, কাউন্টার টেররিজম, নিজস্ব লোক সংগ্রহ ও নেটওয়ার্ক তৈরি, বিদেশি কূটনীতিকদের ওপর নজরদারি, শত্রু এজেন্টদের সন্ধান, সাইবার ওয়ারফেয়ার পরিচালনা, নতুন প্রযুক্তি সংগ্রহ, ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন পরিচালনা, ড্রোন আক্রমণ, গুপ্ত কারাগার পরিচালনা, বিশ্বের বড় বড় করপোরেশনের নীতি-নির্ধারণের চেষ্টা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পিওনাজ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। মোসাদের এই কাজের বাজেটও কারও জানা নেই। মোসাদ তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এমএসএস, এফএসবি, আইএসআই, এমআইসিক্স, হিজবুল্লাহ এবং হামাসকে। এ ছাড়া সকল মুসলিম দেশ এবং তাদের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ মোসাদের চক্ষুশূল।

CamScanner

'মোসাদ কী করে' প্রশ্ন না করে বরং প্রশ্ন করা উচিত 'মোসাদ কী করে না?' ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক তারা তাদের কার্যসিদ্ধি করেই ছাড়ে। মুসলিম সমাজে মিশে গিয়ে বিভেদ তৈরি করে। আলেমদের সাথে সম্পর্ক করে, দুনিয়াপূজারি আলেমদের অর্থের বিনিময়ে, এমনকি মাদরাসা ছাত্রদেরকেও গোপনে অর্থায়ন করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে মোসাদ। রাজনীতির মাঠে একদলকে আরেক দলের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে, দলের দুর্নীতিবাজ নেতাদের হাত করে, দুর্নীতিপ্রবণ করে তোলতে, নানা কুপরামর্শ দিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে বিভাজন তৈরিতে মোসাদের জুড়ি মেলা ভার।

৪. মোসাদ কেন এসব করে?

বিশ্বজুড়ে এই অস্থিরতা সৃষ্টি, দ্বন্দ ও বিভেদ তৈরির কাজ কেন করছে মোসাদ? কেনইবা জীবনের ঝুকি নিয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিয়ে মোসাদ গোয়েন্দারা এইসব কাজ করে যায়? এই সরল প্রশ্ন অনেকের মনেই আছে। আসলে যতটা সরলভাবে এই প্রশ্ন করা হয় পৃথিবী কিন্তু ততটা সরল নয়। পৃথিবীতে সবাই ব্যক্তি হিসেবে নিজের কিম্বা জাতি হেসেবে নিজেদের ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে প্রলুব্ধ। কেউ কম কেউ বেশি। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই হলো অন্যদের সামনে সে নিজেকে আলাদা, অভিজাতরূপে উপস্থাপন করবে। এ চেতনা মানুষ থেকে মানুষে, সমাজ থেকে সমাজে, ধর্ম থেকে ধর্মে বিরাজমান। তারই ধারাবাহিকতায় ইহুদি ধর্মের লোকেরা অন্যদের ওপরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে একটু বেশিই মরিয়া। আগ্রাসী। জীঘাংসু। সমস্যাটা এখানেই। ইসলাম বলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে যৌক্তিক উপায়ে, সৃজনশীল মাধ্যমে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে এবং সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের স্বার্থে, মানবতার মুক্তির জন্য।

মোসাদ এসব করে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের জন্য। দুনিয়ার অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের ওপরে ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় জড়িত। যে কথা প্রচলিত মিডিয়ায় উঠে আসে না। উঠে আসতে দেওয়া হয় না। এমনকি সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজও এ ব্যাপারে

অজ্ঞ। কারণ সেক্যুলার দুনিয়ার সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ প্রচলিত মিডিয়া নির্ভর। আর প্রচলিত মিডিয়া অনেকটাই ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে আছে, "আমি ইসরাঈলের প্রতিটি সম্প্রদায়কে সমগ্র পৃথিবী থেকে এনে একত্রিত করব, তারা যেখানেই বসতি স্থাপন করুক না কেন। আমি তাদেরকে তাদেরই ভূখণ্ডে (ইসরাঈলে) সমবেত করব। এই ভূখণ্ডে আমি তাদেরকে এক জাতির আকারে গড়ে তুলব ইসরাঈলের পাহাড়ের ওপর, যেখানে একজনমাত্র রাজা তাদের ওপর রাজত্ব করবেন।"[১]

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ১৯৮৩ সালে চার্চের জেম বেকারের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আপনি একটু চিন্তা করুন, রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের পর (পাশ্চাত্য ইউরোপ যা ১৯৯৩ সালে আরও সুসংগঠিত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নামে একক পতাকা, একক মুদ্রা, ভিসাহীন ভ্রমণ, মাসীহ (দাজ্জাল) পুনরায় সেই লোকগুলোর ওপর আক্রমণ চালাবে, যারা তাদের নগরী জেরুজালেমকে ধ্বংস করেছিল। তারপর তিনি সেই বাহিনীগুলোর ওপর আক্রমণ চালাবেন, যারা মেগডন ও আরমাগেডনের উপত্যকায় সমবেত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জেরুজালেম পর্যন্ত এত রক্ত প্রবাহিত হবে যে, রক্ত ঘোড়ার লাগামের সমান হয়ে যাবে। এসব উপত্যকা যুদ্ধ সরঞ্জাম, জীবজন্তু, মানুষের জীবন্ত দেহ ও রক্তে ভরে যাবে।"

সাবেক মার্কিন সিনেটর পল ফান্ড লে বলেছেন, "একটি বিষয় আমার বুঝে আসছে না যে, মানুষ মানুষের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ কীভাবে করবে! কিন্তু সেদিন খোদা মানবীয় স্বভাবকে এই অনুমতি দিয়ে দেবেন যে, তোমরা তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রকাশ করে দাও। বিশ্বের উন্নত সবকটি শহর- লন্ডন, প্যারিস, টোকিও, নিউইয়র্ক, লসএঞ্জেলস ও শিকাগো অস্তিত্বের পাতা থেকে মুছে যাবে।"

টিভি বিশেষজ্ঞ হিস্টন বলেছেন, "বিশ্বের ভাগ্য সম্পর্কে মাসীহের (দাজ্জালের) ঘোষণা একটি আন্তর্জাতিক প্রেস কনফারেন্স থেকে প্রচার করা হবে। উক্ত কনফারেন্স স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভির পর্দায় দেখা যাবে।"

---

১. ইজাখিল: ৩৭:২১:২২

সাবেক মার্কিন সিনেটর মার্ক হেটফিল্ড বলেছেন, "পবিত্র ভূমিতে (জেরুজালেমে) ইহুদিদের পুনরাগমনকে আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি যে, এটি মাসীহ যুগের আগমনের লক্ষণ, যে যুগে গোটা মানবতা একটি আদর্শ সমাজের কল্যাণে সুখময় জীবন লাভ করবে।"

"ফোর্সিং গডস হ্যান্ডস" নামক গ্রন্থের লেখিকা গ্রেস হালসেল বলেছেন, '...আমাদের গাইড কুব্বাতুস-সাখরার (টুম স্টোন) প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, আমাদের তৃতীয় হাইকেলটি আমরা ওখানে নির্মাণ করব। হাইকেল নির্মাণে আমাদের সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত আছে। নির্মাণসামগ্রী পর্যন্ত এসে পড়েছে। সেগুলো একটি গোপন স্থানে রাখা হয়েছে। বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান-যেগুলোতে ইসরাঈলি কাজ চলছে-হাইকেলের জন্য দুর্লভ সব জিনিসপত্র তৈরি করছে। একটি ইসরাঈলি প্রতিষ্ঠান রেশমের সুতা তৈরি করছে। সেগুলো দিয়ে ইহুদি পণ্ডিতদের পোশাক প্রস্তুত করা হবে'। (হতে পারে এগুলোই সেই তীজান বা সীজানওয়ালা চাদর, যার উল্লেখ হাদিসে এসেছে)।"

লেখিকা আরও লিখেছেন, 'আমাদের গাইড বলল, একথা ঠিক যে, আমরা শেষ সময়ের কাছাকাছি চলে এসেছি, যেমনটি আমি বলেছিলাম যে, কট্টর ইহুদিরা মসজিদটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, যার ফলে মুসলিম বিশ্ব আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। এটি হবে ইসরাঈলের সঙ্গে একটি পবিত্র যুদ্ধ। এ বিষয়টি মধ্যখানে এসে হস্তক্ষেপ করতে মাসিহকে (দাজ্জাল) বাধ্য করবে'।

১৯৯৮ সালের শেষের দিকে একটি ইসরাঈলি সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে হাইকেলে সুলাইমানির চিত্র দেখানো হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের উপাসনালয়গুলোকে মুক্ত করা এবং তদ্‌সম্মুখে হাইকেল নির্মাণ করা। সংবাদপত্রে বলা হয়েছিল, এই হাইকেল নির্মাণের মোক্ষম সময়টি এসে পড়েছে। সংবাদপত্রে ইসরাঈলি সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল, তারা যেন অধর্মীয় ইসলামি দখলদারিত্বকে মসজিদের স্থান থেকে অপসারণ করে। পত্রিকাটি আরও দাবি করেছে, তৃতীয় হাইকেল নির্মাণ খুবই সন্নিকটে।

গ্রেস হালসেল আরও লিখেছেন, 'আমি লেন্ডা ও ব্রাউনের (ইহুদি) আবাসভূমিতে (ইসরাঈলে) অবস্থান করি। একদিন সন্ধ্যায় আলাপকালে বললাম, উপাসনালয় নির্মাণের জন্য মসজিদে আকসা ধ্বংস করে দিলে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ইহুদি বলল, আপনার আশঙ্কা যথার্থ। এমন যুদ্ধই তো আমরা কামনা করি। কারণ, সেই যুদ্ধে আমরা জয়ী হব। তারপর আমরা সমস্ত আরবকে ইসরাঈলের মাটি থেকে তাড়িয়ে দেব। আর তখনই আমরা আমাদের উপাসনালয়টিকে নতুনভাবে নির্মাণ করব'।

ইলহামের কিতাবের ষোলতম তথ্যে আছে, ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে। এভাবে প্রাচ্যের সম্রাটগণ অনুমতি পেয়ে যাবে যে, এই নদী পার হয়ে তোমরা ইসরাঈল পৌঁছে যাও।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর "ভিক্টরি উইদাউট ওয়ার" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকা সমগ্র বিশ্বের শাসকে পরিণত হবে এবং এই বিজয় তারা যুদ্ধ ছাড়াই অর্জন করবে। তারপর মাসিহ (দাজ্জাল) নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিবেন। যেন উল্লেখিত সন পর্যন্ত মাসিহের সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়ে যাবে আর আমেরিকার দায়িত্ব এসব ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করা পর্যন্ত। তারপর মাসিহ রাজ্য পরিচালনা করবে।

খ্রিষ্টানরাও কোনো একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। আর ইহুদিরা এক্ষেত্রে বেশি বিচলিত। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৬৭ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের আগে ইহুদিরা দুআ করত, "হে খোদা, এ বছরটি আমাদেরকে জেরুজালেমে থাকতে দাও। আর এখন তারা প্রার্থনা করছে, হে খোদা, আমাদের মাসিহ যেন শীঘ্র এসে পড়েন।"

মোটকথা, যেসব ভবিষ্যৎবাণী ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, ইহুদিরা সেগুলোকে দাজ্জালের জন্য প্রমাণ করতে চায়। এক্ষেত্রে তারা খ্রিষ্টানদেরকেও ধোঁকা দিচ্ছে যে, আমরা প্রতিশ্রুত মাসিহর অপেক্ষায়

CamScanner

করছি আর মুসলমানরা হলো মাসিহর বিরোধী। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত। মুসলমান ও খ্রিষ্টান উভয়েই ঈসা ইবনে মারিয়মের অপেক্ষায় অপেক্ষামাণ। পক্ষান্তরে ইহুদিরা যার অপেক্ষা করছে, সে হলো দাজ্জাল, ঈসা ইবনে মারিয়ম যাকে হত্যা করবেন। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে খ্রিষ্টানদের উচিত ছিল মুসলমানদের সঙ্গ দেওয়া - ইহুদিদের নয়। কেননা, ইহুদিরা তাদের পুরনো শত্রু।

আজকের পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ ইহুদিদের দ্বারা পরিচালিত ইহুদি স্বার্থের অনুকূলে একাট্টা হয়ে যাচ্ছে এবং বহু সংগঠন একটি অপরটির সাথে মিশে যাচ্ছে। যেসব সংগঠনের 'ব্যাকডোর' ইহুদিদের হাতে, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইহুদি মিশন বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে কাজ করেছে। ইহুদি মতাদর্শের সেবক নেতাদের মুখ থেকে যে আওয়াজ উত্থিত হচ্ছে, উক্ত সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের মুখ থেকেও একই ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। এরকম অনুকূল পরিবেশ তৈরিই মূলত মোসাদের কাজ। সে লক্ষ্যেই তারা এতদিন কাজ করেছে, এখনো করে যাচ্ছে।

৫. ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কি মোসাদের?

বহুল আলোচিত এই প্রশ্নের উত্তর জানতে ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখা জরুরি। কয়েক হাজার বছর ধরে ইহুদিরা জেরুজালেম এলাকায় বসবাস এবং জেরুজালেম দখলের স্বপ্ন দেখে আসছে। সে লক্ষ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। কিন্তু অগ্রসর প্রচেষ্টা তেমন দৃশ্যমান ছিল না। গত কয়েক শতক ধরে তাদের অগ্রগামিতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষকরে মুসলমানদের স্বকীয়তা ম্লান হওয়ার সময় থেকে। ১৯২৪ সালে খেলাফত পতনের পর থেকে ইহুদিদের জেরুজালেম কেন্দ্রিক বসবাসের চেষ্টা প্রকাশ্য হতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পর প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিনসহ বেশির ভাগ আরব এলাকা চলে যায় ইংল্যান্ড- ফ্রান্সের ম্যান্ডেটে। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বালফোর ইহুদিবাদীদেরকে লেখা এক পত্রে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। বেলফোর ঘোষণার

মাধ্যমে ফিলিস্তিন এলাকায় ইহুদিদের আলাদা রাষ্ট্রের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় এবং বিপুলসংখ্যক ইহুদি ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে।

১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। কিন্তু ১৯১৪ সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ২০ হাজারে উন্নীত হয়। এরপর প্রকাশ্যে ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসীদের ধরে এনে জড়ো করা শুরু হলে ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ৩৫ হাজারে পৌঁছে যায়। ১৯৩১ সালে ইহুদিদের এই সংখ্যা প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৮০ হাজারে পৌঁছায়। এভাবে ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে এবং ১৯৪৮ সালে সেখানে ইহুদিদের সংখ্যা ৬ লাখে উন্নীত হয়।

১৯১৮ সালে ব্রিটেনের সহযোগিতায় গুপ্ত ইহুদি বাহিনী "হাগানাহ" গঠিত হয়। এ বাহিনী ইহুদিবাদীদের অবৈধ রাষ্ট্র তৈরির কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথমে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদীদের সহায়তা করা হাগানাহ বাহিনীর দায়িত্ব হলেও পরবর্তীকালে তারা সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী বাহিনীতে পরিণত হয়। ফিলিস্তিনি জনগণের বাড়িঘর ও ক্ষেতখামার দখল করে তাদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করা এবং বাজার ও রাস্তাঘাটসহ জনসমাবেশ স্থলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের বিতাড়নের কাজ ত্বরান্বিত করা ছিল হাগানাহ বাহিনীর কাজ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব পাশ করে নিজেদের মাতৃভূমির মাত্র ৪৫ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের এবং বাকি ৫৫ শতাংশ ভূমি ইহুদিবাদীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে ১৯৪৮ সালেরয়ে ১৪ মে ইসরাঈল স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

CamScanner

কিন্তু তারপরও তারা তেমন শক্তিতে পরিণত হয়নি । পরবর্তী সময়ে ১৯৬৮ সালে বিশ্ব কাঁপানো ছয় দিনব্যাপী ইসরাঈল-মিসর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মিসর ইসরাঈলের কাছে হেরে যায়। ১৯৬৭ সালের ২৮ জুন ইসরাঈলের সৈন্যবাহিনী জেরুজালেম পুরোপুরি দখল করল। ইসরাঈলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোসি ডাইয়াং যিনি ইসরাঈলের সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দেন মিসর আর তার মিত্র বাহিনীকে পরাজিত করে তিনি ইসরাঈলী সৈন্যদের বলেন, "আমরা পবিত্র জায়গার কেন্দ্রীয়স্থানে ফিরে এসেছি। আমরা কখনও এই জায়গা ত্যাগ করব না।"

বাহ্যিকভাবে এই যুদ্ধ সামরিক যোগ্যতাভিত্তিক মনে হলেও এসব মূলত স্নায়ুবিক যোগ্যতা বা গোয়েন্দা তৎপরতারই ফসল। সব সময় সবক্ষেত্রে অস্ত্র-যুদ্ধ দিয়ে কাজ হয় না। যেমন ইথিউপিয়ার ইহুদিদের ইসরাঈলে ফিরিয়ে আনতে যুদ্ধ ঘোষণার কিছু নেই। এখানে প্রয়োজন মানসিক সামর্থ্য তথা বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল। কারণ, বিষয়টা যুদ্ধের চেয়েও কঠিন। যুদ্ধ করে দেশ লাভ করা গেলেও দেশ যদি পর্যাপ্ত জনসংখ্যা দিয়ে পূর্ণ না থাকে তবে সেদেশ আবার পরাধীন হতে বাধ্য। ব্যাপারটি বুঝেছিলেন ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট রিগান। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল ইহুদিকে ইসরাঈলে ফিরিয়ে আনতে। সামরিক কমান্ডারকে নয় তিনি ডাকলেন গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ প্রধানকে। বললেন, 'ইথিউপিয়ার ইহুদিদের আমার কাছে এনে দাও!'

... Very few Ethiopians came to Israel in the first thirty years of its existence. Even during the reign of Emperor Haile Selassie, the "Lion of Judea," who was Israel's close friend and ally, no serious effort was made to bring the Jews of Ethiopia to the Jewish state. Things started to change in 1973, when Israel's chief rabbi Ovadia Yosef published an unequivocal Halacha ruling that the Ethiopian Jews, ... every Israeli Hercules aircraft that lands here, loaded with military equipment, take off loaded with Jews. Mengistu agreed. And the exodus of Jews from Ethiopia started.

'ইসরাঈল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রথম ত্রিশ বছরে অল্পকিছু ইথিওপিয়ান ইহুদি ইসরাঈলে আসে। এমনকি সম্রাট হেইলি সেলাসির সময়েও, যাকে জায়নবাদের সিংহ বলা হয়। সেলাসি ছিলেন ইসরাঈলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং মিত্রপক্ষ। তাই ইথিওপিয়ানদের ইসরাঈলে আনতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। ১৯৭৩ সাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। যখন ইসরাঈলের প্রধান ধর্মগুরু ওভাদিয়া ইউসেফ এই মর্মে আইন জারি করলেন যে ইহুদিদের জন্য ইসরাঈল উত্তম বাসস্থান। পরিপূর্ণ ইহুদি হতে ইসরাঈলে আসতে হবে। দুই বছর পর ইসরাঈলের সরকার সে আইন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইথিওপিয়ান ইহুদিদের ইসরাঈলে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেয়। এরপর ১৯৭৭ সালে যখন মেনাখেম বিগিন প্রধান মন্ত্রী হন মোসাদের পরিচালককে ডাকেন। বলেন, 'ইথিওপিয়ার ইহুদিদের আমার কাছে এনে দাও!'

মোসাদ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিজুর নামের একটি বিশেষ শাখা শত্রুদেশে ইহুদিদের সুরক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। পরবর্তী সময়ে বিজুর নাম বদলে জাফরিরিম রাখা হয়। জাফরিরিম নতুন করে নির্দেশ পেয়ে কাজে নেমে পড়ে। মোসাদের ডেপুটি প্রধান ডেভ কিমহি ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবাতে গিয়ে হাজির হন। গোপন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংগঠন তেভেল এর প্রধান। তিনি ইথিওপিয়ার সরকার প্রধান মেঙ্গিসতু হেইলি মারিয়ামের সাথে দেখা করেন। সে সময় ইহুদি অভিবাসীদের ইথিওপিয়া ত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল। ওদিকে ইথিওপিয়া ছিল গৃহযুদ্ধে জর্জরিত। মেঙ্গিসতু বিদ্রোহীদের ব্যাপারে ইসরাঈলের সাহায্য চান। কিন্তু কিমহি বিদ্রোহীদের দমনে মেঙ্গিসতুর সাহায্যের আবেদন ফিরিয়ে দেন। তবে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে প্রতিজ্ঞা করেন। একটি শর্ত জুড়েও দেন। শর্ত হলো, মেঙ্গিসতু ইহুদিদের ইথিওপিয়া থেকে বের হবার অনুমতি দেবেন। আমরা দাবি করি বিমান ভর্তি অস্ত্র নিয়ে ইসরাঈলি বাহিনী আসবে। অস্ত্র নামিয়ে রেখে ইহুদি নাগরিকদের বিমান ভরে নিয়ে যাবে। মেঙ্গিসতু রাজি হয়। ইথিওপিয়া থেকে ইহুদিদের আসার পথ খুলে যায়।

CamScanner

৬. শেষযুগে জেরুজালেমে ইহুদিরাষ্ট্র হওয়ার কথা কুরআনে আছে!

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি হাদিসের দিকে চোখ বোলানো যাক। মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "বায়তুল মাকদিস আবাদ হওয়া মদিনার ক্ষতির কারণ হবে। আর মদিনার ক্ষতি মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করবে। মহাযুদ্ধ কস্তুনতুনিয়া [কনস্ট্যান্টিনোপল-তুরস্ক] বিজয়ের কারণ হবে। কস্তুনতুনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ হবে।" বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রাসুল সা. হাদিসটির বর্ণনাকারীর উরুতে কিংবা কাঁধের ওপর চাপড় মেরে বললেন, "এই মুহূর্তে তোমার এখানে উপবিষ্ট থাকার বিষয়টি যেমন সত্য, আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীও তেমনই সত্য।"[১]

এই হাদিসে বায়তুল মাকদিস আবাদ হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, ইহুদিবাদী 'ইসরাঈল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

উপরোক্ত হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী ইহুদিদের হাতে বায়তুল মাকদিস তথা জেরুজালেম আবাদ হবে শেষযুগে। আর শেষযুগে বা পৃথিবী ধ্বংসের কিছুকাল আগে পৃথিবীময় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। মানুষের নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক অরাজকতা, সাংস্কৃতিক নষ্টামি, সামাজিক ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা, জাতিগত বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করবে। মুসলমানদের জন্য এক ভয়ংকর সংকটময় পরিস্থিতি তৈরি হবে। সর্বশেষ ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক জেরুসালেমকে ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাঈলের রাজধানী ঘোষণা করা হয়। রাজধানী ঘোষণার মাধ্যমে হাদিসের সেই চূড়ান্ত বায়তুল মাকদিস আবাদ হয়ে গেছে ধরে নেওয়া যায়। কারণ, রাজধানী ঘোষণার পরপর সেখানে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ইহুদি সেনাদের উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। এরপর ইসরাঈলকে একক ইহুদি জনবসতি হিসেবেও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

---

১. সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১০ ও মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৪৫

ইহুদিদের এসব সিদ্ধান্তের পক্ষে যেমন বিশ্বমোড়ল আমেরিকা দাঁড়িয়েছে তেমনি এর বিরোধিতা আরবদেশগুলোর পক্ষ হতে তেমন করা হয়নি। সব মিলিয়ে অত্যন্ত নির্বিঘ্নে বায়তুল মাকদিস ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

জেরুজালেম এবং পবিত্রভূমির পরিণতি সম্বন্ধে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে ঘোষণা রয়েছে যে, যখন শেষ সময় ঘনিয়ে আসবে, ইহুদি সম্প্রদায়কে, যারা বহুভাগে বিভক্ত হয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, সেই অবস্থা থেকে 'মিশ্র জনগোষ্ঠী' হিসেবে 'পবিত্রভূমি'তে ফিরিয়ে আনা হবে। যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিকেও বর্তমান বিশ্বের অনেক স্কলার ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের ওই বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন, "তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, এ দেশে তোমরা বসবাস করো। অতঃপর যখন চূড়ান্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হব।" [সুরা বনী-ইসরাঈল ১৭:১০৪]

আল্লাহর সেই ঘোষণা ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। ইহুদিরা ইতোমধ্যে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরে এসেছে এবং সেটির ওপর নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সাফল্য, তাদেরকে এই রাষ্ট্রের ধর্মীয় বৈধতায় বিশ্বাসী করে তুলেছে। ইসলামের ব্যাখ্যা এই যে, ইসরাঈলের কোনো ধর্মীয় বৈধতা নেই। বরং, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রতারণার মাধ্যমে ইহুদিরা প্রতারিত হয়েছে, এবং তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে কঠোরতম ঐশ্বরিক শাস্তি নেমে আসার উপযোগী ক্ষেত্র। কিন্তু 'বনী ইসরাঈলের' ওপর চূড়ান্ত শাস্তি কার্যকর হওয়ার আগে, 'পবিত্রভূমি' তথা গোটা বিশ্বে এক বিশাল ক্রমবিকাশমান নাটকের আরো দৃশ্যাবলির বাস্তবায়ন এখন চলছে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসরাঈলের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। গ্যালিলি হ্রদ খুব শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে! ঈসা (আ.) খুব শীঘ্রই ফিরে আসবেন। আর তার প্রত্যাবর্তনের সাথে, বিশ্ববাসী ইসরাঈল রাষ্ট্রের ধ্বংসও অবলোকন করবেন।

CamScanner

মুসলিমদের কাছে যে সত্যটি রয়েছে, ইহুদিদের কাছেও তাই ছিল, কিন্তু তারা সেটিকে বিকৃত করেছে। কুরআনের মাধ্যমে যে অবিকৃত সত্যটি নাযিল হয়েছে সেটিকে, এবং ইব্রাহীম (আ.)-এর বিধাতার শেষ নবী হিসেবে মুহাম্মদ (সা:)-কে গ্রহণ করার জন্য মদীনার ইহুদিরা (হিজরতের পরে) দীর্ঘ ও পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিল — কিন্তু তারা একগুঁয়েমিবশত তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারপর তাদের সময় ফুরিয়ে গেল এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিবলা পরিবর্তন করে দিলেন। "এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ওই কেবলা থেকে, যার ওপর তারা ছিল? আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" [সুরা বাকারা ২:১৪২]

দুর্নীতিগ্রস্ত, ধর্ম-বিমুখ ও বিলাসিতামগ্ন নামধারী মুসলিমরা এখন ইসরাঈলের চারপাশের আরব-মুসলিম দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের সাথে সুবিধাবাদী আঁতাত গড়ে তোলা যায়োনিস্টদের সার্বিক কৌশলের একটা দিক। ওই বিলাসী শ্রেণি তাদের নিজেদের [অবৈধ] ক্ষমতা, শাসন-নিয়ন্ত্রণ, সুবিধা, অগ্রাধিকার ও সম্পদকে আঁকড়ে ধরে রাখতে গিয়ে ইসরাঈলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়। ইহুদিরা ওইসব উঁচু শ্রেণির মানুষের ওপর সাধারণ মুসলিমদের নির্যাতন করার জন্য এমনভাবে সার্বক্ষণিক চাপ দিতে থাকে যেন তারা ইসরাঈলের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। সেকারণে তাদের লোক দেখানো ইসরাঈল-বিরোধিতা ইহুদিদের জন্য কোনো হুমকি হিসাবে গণ্য হয় না। ইসরাঈল যখন 'পবিত্রভূমিতে' মুসলিমদের ওপর তার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, আর তার ফলে যখন আরব-মুসলিম জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তখন টিকে থাকার প্রয়োজনে ওই উচ্চ শ্রেণির শাসকবর্গ ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ক্রোধের অভিনয় করে। এই ইহুদি-আরব (শাসকশ্রেণির) কৌশল আজ চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মাঝে রয়েছে শয়তানী, কূটবুদ্ধি আর সুবিধাবাদ। আর এটা এমন এক জনসমষ্টির কৌশল, যারা ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মের সারসত্তাকে পরিত্যাগ করেছে। কৌশলগত দিক দিয়ে ইহুদিরা একদিন ঐসব আরব শাসক শ্রেণিকে পরিত্যাগ করবে যাদের সাথে তারা আজ সুবিধাবাদের

ভিত্তিতে আঁতাত করেছে। আরব শাসক শ্রেণিকে পরিত্যাগ করার কৌশলও অবশ্য ইতোমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। ইসরাঈল আরব-মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, যে যুদ্ধের ফলে ইহুদি রাষ্ট্রটির পরিধি প্রসারিত হবে। তখন পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসাবে (যুক্তরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে) ইসরাঈল এই সমগ্র অঞ্চলের [মধ্যপ্রাচ্য] ওপর শাসন করবে বলে অনেক স্কলারের বিশ্বাস।

পবিত্রভূমিতে' ওই শয়তানসুলভ কৌশল বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়েই ইসরাঈল মিসর, জর্ডান, তুরস্ক এবং সৌদী আরবে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী কিম্বা মডারেট ইসলামিদলগুলোকে নিজের সহযাত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে। এক বিশাল যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে চলেছে, যার মাধ্যমে তার সীমান্ত নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হয়ে 'বাইবেলীয় পবিত্রভূমিকে' ওই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করবে অর্থাৎ "মিশরের নদী থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত"। এর অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, একদিকে সুয়েজ খালের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে ইরানি তেল সম্পদের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া, সমগ্র উপসাগরীয় তেল সম্পদের ওপর ইসরাঈলের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ। যে তেল সম্পদের ওপর ইউরোপ, জাপান এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই নির্ভরশীল। ইসরাঈল-রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে গিয়ে ইহুদি ধর্মকে সদ্য বিকশিত, মূলত ধর্ম-বিমুখ এবং ক্ষয়িষ্ণু, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সাথে 'গাঁটছড়া' বাঁধতে হয়েছে। পৃথিবীর মঞ্চে ওই স্রষ্টা-বিমুখ পশ্চিমা জগত "মানবকুলের ওপর সকল উচ্চভূমি থেকে নেমে এসে" এবং "চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে"[১] জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে তাদের একক কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নতুবা, ইহুদি রাষ্ট্রটি ওই সর্বশক্তি সম্পন্ন অথচ নাস্তিক ও ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া গত ৫০ বছর টিকে থাকতে পারত না। ওই [পশ্চিমা] সভ্যতা 'ইয়াজুজ' ও 'মাজুজ' কর্তৃক সৃষ্ট ও লালিত সভ্যতা বলেও অনেক ইসলামি স্কলার মত দিয়েছে। যে সকল ইহুদিরা ইসরাঈল রাষ্ট্রকে বাইবেলীয় ইসরাঈলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মনে করে সমর্থন করেন, তারা সেই

১. কুরআন, সুরা আম্বিয়া ২১:৯৬

রাষ্ট্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ অভাগা ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর যে অবিচার এবং অত্যাচার করা হয়েছে সেদিকে নজর দিতে তারা বিস্ময়করভাবে ভুলে যান।

৭. খালেদ মিশালকে হত্যাচেষ্টা মোসাদের!

ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং মুসলিম বিশ্বের প্রাণের সংগঠন 'হামাস' এর রাজনৈতিক শাখার প্রধান খালেদ মিশাল। বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় এই নেতা জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে ১৯৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন জবরদখল করে প্রতিষ্ঠিত ইসরাঈল ১৯৬৭ সালে আরেকবার অবশিষ্ট ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালালে মিশালের পরিবার কুয়েত চলে যায়। পরবর্তী সময়ে মিশাল জর্দানে চলে যান এবং সেখানে হামাসে যোগ দেন। ২০০৪ সালে শেখ আহমাদ ইয়াসিন শহিদ হওয়ার পর তিনি হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান নিযুক্ত হন। তখন ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হামাস নেতা সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তারপর তিনি কাতার ও মিশরে নিজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তাকে হত্যা করার প্লান করা হয়। ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এ হত্যার নীলনক্সা করেন। এ সত্য উঠে এসেছে ইসরাঈলের সামরিক কর্মকর্তা মাইকেল বার জোহার এবং ইসরাঈলের সরকারি টিভির মহাপরিচালক নিসিম মিশাল রচিত MOSSAD- *THE GREATEST MISSIONS OF THE ISRAELI SECRET SERVICE* গ্রন্থে... Its goal was to kill Khaled Mash'al, the newly appointed head of the Hamas Political Bureau. Mash'al, a forty-one-year-old computer engineer, was a handsome man, sporting a well-groomed black beard. He was a rising leader of Hamas, which, in the previous few years, had become Israel's worst enemy. This terrorist organization, fueled by Islamic fanaticism, had replaced the PLO in the ruthless fight against Israel after Yasser Arafat and Yitzhak Rabin had made a move toward peace by signing the Oslo agreements together in September 1993. The senior officers of Mossad had proposed Mash'al as a

target for assassination after a deadly suicide bombing in Jerusalem on July 30, 1997. Two terrorists blew themselves up in the crowded Mahane-Yehuda market, killing 16 Israelis and wounding 169 others.

Prime Minister Benjamin (Bibi) Netanyahu called an emergency meeting of the cabinet that decided to kill one of the Hamas leaders. The *ramsad,* General Danny Yatom, who had been appointed to his post in 1996, was tasked by Netanyahu with designating which man should die.

অভিযানের মূল লক্ষ্য হামাসের নবনিযুক্ত রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান খালেদ মিশালকে হত্যা। ৪৫ বছর বয়সী খালেদ মিশাল একজন কম্পিউটার প্রকৌশলী। সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি ও সুদর্শন খালেদ মিশাল হামাসের রাইজিং স্টার বা উদিয়মান তারকা । তবে গত কয়েক বছরে তিনি ইসরাঈলের চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির মাধ্যমে আইজাক রবীন ও ইয়াসির আরাফাত শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কিন্তু ১৯৯৭ সালের ৩০ জুলাই জেরুজালেম বোমা হামলার পর মোসাদ মিশালকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা ওই হামলায় ১৬ জন ইসরাঈলী নিহত এবং ১৬৯ জন আহত হয়। ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিতানিয়াহু মন্ত্রী পরিষদের জরুরি বৈঠক ডেকে একজন হামাস নেতাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন তখন মোসাদের প্রধান ছিলেন ১৯৯৬ সালে নিয়োগ পাওয়া জেনারেল ড্যানী ইয়াতোম।

In the summer of 1997, some passersby in a Tel Aviv street saw two young men shaking cans of Coca-Cola, then pulling their tabs and opening them. The bubbly drink squirted out with a sizzling noise. For a moment, the people on the street cast annoyed looks at the two young men, and then kept moving. They could not guess that the two were Mossad agents, rehearsing Mash'al's killing: one of them would open a Coke can ..... on September 4, another terrorist attack shook Jerusalem: three

Hamas members blew themselves up on Ben-Yehuda Street, killing 5 Israelis, wounding 181. Israel could not wait any longer, it was time to act.

১৯৯৭ সালের আগস্টে নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক শেষে ইয়াতোম তেল আবিবের মোসাদ সদর দফতরে এক জরুরি বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকে সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। হামাস নেতাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তখন মোসাদের কাছে ছিল না। হামাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেন মুসা মো. আবু মারজুক। তাকে হত্যার সমস্যা হলো তার রয়েছে আমেরিকান পাসপোর্ট। তাকে মারলে আমেরিকার সাথে বিরোধ হতে পারে সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত হয় সেদিক থেকে খালিদ মিশাল সুইটেবল টার্গেট। কিন্তু সমস্যা হলো তার অফিস আম্মানে অবস্থিত। এদিকে ১৯৯৪ সালে জর্ডানের সাথে আমেরিকার শান্তি চুক্তি হয়েছে। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী রবীন প্রায়াত হলে জেনারেল ইয়াতোমের জর্ডানে অভিযান চালাতে বাধা কী? এমনটা অন্তর্গত মনোভাব হয়তো ছিল ইয়াতোমের। মিশাল জর্ডানে অবস্থান করলেও ইয়াতোম তাকে কতল বা হত্যা করা হোক বলে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কাছে প্রস্তাব দেন। গোয়েন্দা বাহিনী কায়সারও এতে অনুমোদন দেয় ।

নেতানিয়াহু খালেদ মিশালকে হত্যার অনুমোদন দেয় তবে শর্ত হলো আম্মানের সাথে যেন কোনো সংকটের সৃষ্টি না হয়। প্রধানমন্ত্রী চুপচাপ এই অপারেশনের নির্দেশ দেন। ইয়াতোম এই হত্যার দায়িত্ব কিডন গ্রুপকে দেন। এরাই কায়শারের এলিট গ্রুপ। মোসাদের গবেষণা বিভাগের কেমিস্ট্রির ডাক্তার খালেদ মাশালের শরীরে মারাত্মক বিষ প্রয়োগের পরামর্শ দেন। মোসাদের বায়োলজি ইনস্টিটিউটে এই বিষ উৎপন্ন ও উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। এই বিষের কয়েকটি ফোঁটা যদি কারো শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই বিষ তার প্রমাণ বের করা কঠিন। এমনকি ময়না তদন্তেও তা প্রমাণিত হবে না। এরকম বিষ অতীতে মোসাদ ব্যবহার করেছে। সেই বিষের শিকার হলেন পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের নেতা হাদাদ।

Six weeks before the operation, in August 1997, the first agents arrived in Jordan. They carried foreign passports and followed Mash'al's daily routine..... the operational plans. ১৯৯৭ সালের আগস্টে খালেদ মিশালকে হত্যার অভিযানের ছয় সপ্তাহ আগে প্রথম আততায়ীদল জর্ডানে গিয়ে পৌঁছায়। তারা বিদেশি পাসপোর্ট নিয়ে আসে এবং খালেদ মিশাল প্রতিদিন কী কী কাজ করে তা নিরিক্ষা করবে। যেমন মিশাল কখন সাধারণত বাসা থেকে বের হয়, তার গাড়ি চালায় কে? তার গাড়িতে কে কে থাকে, তার যাতায়াতের রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থা কেমন থাকে ইত্যাদি। খালেদ মিশাল গাড়ি থেকে নেমে যে ভবনে যান, তার দূরত্ব পথে যদি কারো সাথে কথা বলেন সেই সময়ের পরিমাপসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহই তাদের কাজ।

The advance team's report to Kidon headquarters summed up the results of the preliminary mission: Every morning, Mash'al came out of his house without bodyguards .....killing 5 Israelis, wounding 181. Israel could not wait any longer, it was time to act. এই অগ্রিম দল কিডন সদর দপ্তরে এসব নিয়ে একটি প্রতিবেদন পাঠায়, এই প্রতিবেদনে লেখা হয় প্রতিদিন সকালে খালেদ মিশাল কোনো দেহরক্ষী ছাড়াই বাড়ি থেকে বের হোন। তার গাড়িটি চালায় একজন সহকারী এবং সে প্রতিদিন আম্মানে ফিলিস্তিন রিলিফ ব্যুরোতে যান। মিশাল নেমে গেলে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার চলে যায়। সামান্য পথ মিশাল হেঁটে গিয়ে ওই ভবনে প্রবেশ করেন। এই ব্যুরোটি মূলত জর্ডানের রাজধানীতে হামাসের সদর দপ্তর। অগ্রগামী দল আরো জানায় সবচেয়ে ভালো হয় যদি মিশালকে সকালে হত্যা করা হয়। তিনি গাড়ি থেকে নেমে ব্যুরো বা ভবন পর্যন্ত যাওয়ার মাঝেই তাকে হত্যা করা সম্ভব।

পুরো গ্রীষ্মকাল ধরেই খালেদ মিশালকে হত্যার পূর্ব পরিকল্পনা করতে থাকে অগ্রগামী দল। সহায়তাকারী দলও আম্মানে আসা শুরু করেছে। তাদের জন্য বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। গাড়ি ঠিক হলো, কিন্তু হঠাৎ করেই ৪ সেপ্টেম্বর জেরুজালেমে সন্ত্রাসী হামলা হয়, হামাস আত্মঘাতী

হামলায় পাঁচ ইসরাঈলী নিহত এবং ১৮১ জন আহত হয়, ফলে ইসরাঈলের পক্ষে আর অপেক্ষা করার সময় নেই তাদেরকে খুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে টার্গেটে ।

September 24, 1997, a day before the operation. A couple of tourists linger by the pool of a big Amman hotel. The man is wearing ..... would be the only way to save them from certain death. ১৯৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর হলো অভিযানের আগের দিনটি। আম্মানের বিশাল একটি হোটেলের সুইমিং পুলে বেশ কয়েকজন টুরিস্ট, একজন লোক হোটেল কর্মচারীদের জানায় যে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। যেন অসুখ থেকে তিনি সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করছেন। তার চলাফেরা হাঁটার ভঙ্গি দেখলে মনে হবে তিনি এখনো অসুস্থ । এ কারণে তার সাথে সার্বক্ষণিক একজন মহিলা ডাক্তার রয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে মহিলা ডাক্তারটি তার রক্তচাপ ও পালস পরীক্ষা করছে। এই হৃদরোগী হলো মিশাখা বেন ডেভিড। ডেভিডের কাজটা হলো মোসাদের সদর দফতর এবং মাঠে নেমে পড়া গোয়েন্দাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা। দলের মহিলাটি প্রকৃতই ডাক্তার। এই ডাক্তার তার কাছে সব সময় একটি ইনজেকশন রাখে। এটি একটি এনটিউড ইনজেকশন। ইন্টিউড ইনজেকশন এই কারণে যে যদি কোনো মোসাদের এজেন্টের শরীরে মিশালকে ছোড়ার সময় যদি বিষ গায়ে লাগে। তাহলে ইন্টিউড ইনজেকশনের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে বিষমুক্ত করা যাবে।



While the phony patient and the doctor are waiting by the pool, the hit team is making .....exposed only after the operation was launched. কথিত হৃদরোগী এবং এই মহিলা ডাক্তার সুইমিং পুলের কাছে অপেক্ষমাণ। হিট টিম তাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখে নিচ্ছে। গত কয়েকদিন আম্মানে মোসাদের বেশ কয়েকজন গোয়েন্দা এসেছে। ঘটনাস্থল থেকে এজন্টেদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়াসহ আরও কিছু কাজ বর্তাবে তাদের ওপর। অবশেষে হিট টিমের দুই সদস্য যারা মোসাদের কিডন গ্রুপের সদস্য তারা এলো। তারা কানাডার টুরিস্ট

হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। একজনের নাম শান কেন্ডাল। আরেকজন বেরী বেডস। তারা একটি আন্তর্জাতিক মানের হোটেলে ওঠেছে। তাদের নিয়ে কিছু প্রশ্ন বেশ স্বাভাবিক। তারা এর আগে কখনোও কোনো আরব দেশে অভিযান পরিচালনা করেনি। প্রশ্ন হলো কেন তাদের এই কানাডার পাসপোর্ট ধরিয়ে দেওয়া হলো? যদি কখনো প্রমাণিত হয় তারা কানাডার নাগরিক নয় তখন কি হবে? তাদের ইংরেজিও এত চৌকষ নয়। তাদের উচ্চারণ ইসরাঈলিদের মতো। কিন্তু টিমের অন্যান্য ভুলের কাছে এই ভুল কিছুই না। তা ছাড়া ভুলটি প্রকাশ পেল অপারেশন শুরুর পর। এখন কিছুই করার নেই।

The hit was to take place at the entrance to the Shamia Center building, where Mash'al's office ..... spread on his skin and make him die of a "heart attack. "খালেদ মিশালকে হিট করা হবে তার অফিসে ঢোকার মুহূর্তে। শান ও বেরীর সঙ্গে মাশালের বিতণ্ডা খুব বেশি সময় ধরে হওয়ার কথা নয়। শান ও বেরী এগিয়ে যাবে মাশালের দিকে এবং মিশালের প্রতি স্প্রে ছুড়বে। সেই তরল স্প্রে। গাড়ি খুব কাছাকাছি প্রস্তুত থাকবে মিশালের গলায় স্প্রে করেই তারা গাড়িতে উঠে পালাবে। উল্লিখিত দুই কানাডীয় নাগরিক যা প্র্যাকটিস করেছে। শান কোকের ক্যান ধরে রাখবে এবং যখন মিশাল ফিরে তাকাবে তখন মাশালের শরীরে স্প্রে করবে। কাজটা যে তারা দুর্ঘটনাবশত করে ফেলেছে এমন একটা ভাব করবে। মিশাল মারা গেলে বলা হবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

September 25, 1997, D-Day.

The operation commander takes position.....they lose contact with their commander. And even worse—they don't see the little girl and the driver who runs after her.

১৯৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, অভিযানের দিন।

অভিযানের কমান্ডার মাশালের অফিসের সামনে রাস্তায় পজিশন নেয়। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল মোবাইল ফোন জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যাবে

না। প্রয়োজনে বডি ল্যাংগুয়েজের মাধ্যমে বা আভাসে ইঙ্গিতে কাজ চালাতে হবে। কমান্ডার একটি বিশেষ ক্যাপ পরে থাকবে। যদি অভিযান বাতিল হয় কমান্ডার তার ক্যাপ খুলে ফেলবে। ভবনের পিছনে পালানোর গাড়ি রেডি হয়ে আছে দুজন আঘাতকারীর জন্য। শান ও বেরী ঘটনাস্থলে। সেই যুগল ভবনের চত্বরে। সবকিছুই রেডি।

প্রতিদিন যে রুটিন মিশাল মেনে চলেন সেভাবেই ওইদিন সবকিছু এগোচ্ছিল। হঠাৎ মিশাল পত্নী তার দুই সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিতে বলেন। মিশাল প্রায়শই এটা করে থাকে। দুই শিশু তার বাবার গাড়িতে উঠে বসলো। বাবাও সাথে। কিন্তু মোসাদের সার্ভিলেন্স টিম ওই দুই শিশুকে দেখেনি। বরং গোয়েন্দারা বসদের জানালো মিশাল একাই অফিসে যাচ্ছে। বাচ্চারা বসেছিল পিছনের সিটে। গাড়ির কাচ টিন্টেট করা। ফলে মোসাদ গোয়েন্দারা বসদের জানালো মিশাল একাই অফিসে যাচ্ছেন।

মিশাল অফিসে এলেন এবং গাড়ি থেকে নেমে হাটতে লাগলেন, তিনি যখন সিঁড়িতে ওঠে প্রবেশপথের কাছাকাছি তখন দুই হিটম্যান তার দিকে এগিয়ে এলো। তারা দশ মিটার থেকে পাঁচ তিন মিটার কাছাকাছি এসে গেলো মাশালের। এরি মধ্যে গাড়িতে অপেক্ষমাণ ছোট মেয়েটি বাবা বলে চিৎকার দিলো এবং গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে বাবার দিকে এগুতে থাকলো। ড্রাইভারও গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলো এবং ছোট মেয়েটির পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। কমান্ডার ক্যাপটি মাথা থেকে সরিয়ে অভিযান স্থগিত করতে বলল। কিন্তু সবকিছু খুব দ্রুক ঘটে যেতে থাকলো। হিট টিমের দুই সদস্য কমান্ডারের ইঙ্গিত যেমন দেখেনি তেমনি ছোট্ট শিশু ও ড্রাইভারের এগিয়ে আসার ব্যাপারটিও লক্ষ করেনি। তারা অবশ্য একটি থামের পিছনে ছিল।

The hit men proceed with their mission. They reach Mash'al, and ..... Shawn and Barry rush toward the getaway car. দুই হিট টিম তাদের অভিযানে ব্যাস্ত। তারা মিশালের খুব কাছে। শান কোকের বোতল প্রশিক্ষণমতো ঝাকালো। অন্যদিন ট্যাবটা খুলে যায়

কিন্তু আজ সেটি খুলল না। হিট টিমের আরেক সদস্য বেরী মিশালকে স্প্রে করার জন্য হাত তুললো। এদিকে মাশালের ড্রাইভার মনে করল তার বসকে ছুরি মারা হচ্ছে। মিশাল তার ড্রাইভারের চিৎকার শুনে ফিরে তাকালো ঠিক এ সময় বেরী মিশালের কানে বিষ স্প্রে করল। হিট টিমের দুজন সদস্য বুঝলো যে সমস্যা একটা হবে তারা সটকে গিয়ে অফিসের পিছনে অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠলো।

খালেদ মিশালের বডিগার্ড তাদেরকে অনুসরণ করে পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর হামাসের দুই চৌকষ কর্মীর কাছে পরাস্ত হয় মোসাদের দুর্ধর্ষ ২ সদস্য। পিঠমোড়া করে বেঁধে জর্ডান পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয় তাদেরকে। এদিকে ততক্ষণেও ক্লিয়ার না খালেদ মিশালকে তারা কী করতে চেয়েছিল এবং তারা কারা?

আস্তে আস্তে অবস্থার অবনতি হতে থাকে মিশালের। শ্বাসতন্ত্র অকার্যকর হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু জর্ডানের বাঘা বাঘা ডাক্তাররাও এর কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তবে তারা এটা বুঝলেন যে মিশালকে ছোট কোনো ডিভাইস দিয়ে কানের ফুটোয় এমন কোনো একটা বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে তার রেসপিরেটরি সিস্টেম অচল হয়ে যাবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে। খুব ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে।

জর্ডান এর বাদশাহ হুসাইন এর কানে এ খবর গেল।

এরই মধ্যে কিছু সংবাদ মাধ্যম আবিষ্কার করে ফেলল যে ওই দুজন ছিল মোসাদের চর এবং হামাস প্রথম থেকেই মোসাদকে দায়ী করে আসছিল। তেলআবিবকে কিং হুসাইন হুমকি দিলেন, যে এটা জর্ডানের সার্বভৌমত্বের লংঘন এবং কোনোভাবেই আমরা এটা সহ্য করবনা। কদিন আগে করা ইসরাঈল-জর্ডান শান্তিচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে বলেও তিনি ঘোষণা দিলেন। তেলআবিব বাধ্য হয়ে গভীর রাতে কেবিনেট মিটিং বসালো, মোসাদ প্রধান উড়ে গেল আম্মানে।

কিং হুসাইন আম্মানে ইসরাঈলি দূতাবাস ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং মিশালকে প্রয়োগ করা বিষের এন্টিডোট না দিলে ইসরাঈলি এম্বাসি

তছনছ করে ফেলার হুমকি দিলেন। বললেন, 'আমাদের একজন সন্তানকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি সকল চুক্তি-নিয়ম লঙ্ঘন করে। সুতরাং, জেনেভা কনভেনশন এর কোনো মূল্য ইসরাঈলকে আমরা দেব না, যেকোনো মুহূর্তে রাষ্ট্রদূতকে গ্রেপ্তার করব।'

তেলআবিবের বুকে কাঁপুনি ধরে গেল এ কথায়। হেলিকপ্টারে করে এন্টিডোট হস্তান্তর করল মোসাদ এর লোকেরা আম্মানের কাছে। সেই এন্টিডোট প্রয়োগ করা হলো কোমায় প্রায় মৃত খালেদ মিশালকে।

তিনি আবার সুস্থ হয়ে ওঠা শুরু করলেন। এবার সেই ২ চরকে ছাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করল ইসরাঈল।

আম্মান এবারও চরম দাম বুঝে নিল। ইতিহাসের অন্যতম একটা কিলিং মিশনের ব্যর্থতা আর তার মূল্যে হয়রান হয়ে গেল ইসরাঈল। কিং হুসাইন শর্ত দিলেন হামাসের প্রতিষ্ঠাতাসহ গাজা ও পশ্চিমতীরের সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় ওই দুই হত্যাপ্রচেষ্টাকারী মোসাদ সদস্যকেও ছাড়া হবে না।

না চাইলেও বাধ্য হলো ইসরাঈল। শেখ আহমেদ ইয়াসিন (রহ.)-কে হেলিকপ্টারে করে আম্মানে রেখে গেল তারা। কয়েকটা হেলিকপ্টারে করে বহু ফিলিস্তিনি বন্দিকেও রেখে গেল আম্মানে। ঠিক সেই মুহূর্তেই বন্দি বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী ইসরাঈলি আরেকটা হেলিকপ্টারে করে ওই দুই মোসাদ সদস্যকে তেলআবিবে পাঠিয়ে দেয় জর্ডান।

পরদিন ভোরে জ্ঞান ফিরল খালেদ মিশালের। তিনি জ্ঞান ফিরেই শুনলেন হামাস এর প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ীর বেশে ইসরাঈল থেকে ফিরেছেন। কিং হুসাইন এবং হামাস অফিসিয়াল সংবাদ সম্মেলনে একে তাদের বিজয় বলে অভিহিত করলেন। সেদিনই জর্ডান আর্মির একটা হেলিকপ্টারে করে মাতৃভূমি ফিলিস্তিনের গাজায় ফিরলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মজলুম নেতারা। আনন্দ আর আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে প্রকম্পিত হলো পুরো গাজা। মোসাদ তাদের এই ঐতিহাসিক পরাজয় কোনোদিন ভুলবে না এবং এই ঘটনা বিশ্বে হামাসের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক অনেক বাড়িয়ে দেয়।

CamScanner

৮. ইরানের পরামাণু প্রকল্প ধ্বংসে মোসাদ!

স্বাধীনতার জন্য হুমকি এমন প্রতিবেশী দেশ কেউ চায় না। ইসরাঈলও তা চায় না। তার ওপর তারা বিশ্বজনমত অগ্রাহ্য করে, যুগের পর যুগ ফিলিস্তিনিদের নির্মম নির্যাতন করে এই ভূমি দখল করেছে। তাই ইসরাঈল, কাগজেকলমে হলেও মুসলিম রাষ্ট্র ইরানকে বড় ধরনের হুমকি মনে করে। পারমাণবিক শক্তি অর্জনে সচেষ্ট ইরানকে রুখতে তাই মোসাদ সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, "মোসাদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ইরানে। ২০০৭ সালের ১৫ জানুয়ারি ইরানের পারমাণবিক বিজ্ঞানী ড. আরদেশি হোসেনপুরকে হত্যা করে মোসাদ। মৃত্যুর ছয় দিন পর আল কুদস ডেইলি তার নিহতের খবর প্রচার করে। প্রথম দিকে তিনি গ্যাস বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন বলে ধারণা করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা সে দেশের প্রভাবশালী পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্টের কাছে এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। ওয়াশিংটনের প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা স্ট্রাটফোর হোসেনপুরকে মোসাদের টার্গেট ছিল বলে উল্লেখ করে। অবশ্য মোসাদ এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। হোসেনপুর ছিলেন ইরানের একজন জুনিয়র সহকারী অধ্যাপক। ২০০৩ সাল থেকে ইরানে মোসদের হয়ে কাজ করতেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী রেজা আসগারি। তিনি মুহাম্মাদ খাতামী প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ইরানের সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাকে সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসাননি।"

মাইকেল বার জোহার এবং নিসিম মিশাল রচিত MOSSAD গ্রন্থে একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়, ... Stratfor's director of analysis, Reva Bhalla, was quoted as saying: "With cooperation from the United States, Israeli covert operations have focused both on ..... out of the Western secret services, the Mossad included. স্টার্টফরস এর বিশ্লেষক বিভাগের পরিচালক রেভা ভাল্লা বলেছেন, আমেরিকার সহযোগিতায় ইসরাঈল ইরানের

পারমাণবিক প্রকল্পে মানব সম্পদ ধ্বংস ও নিষ্ক্রিয় করণের পাশাপাশি ইরানের সাপ্লাই চেইন বা সরবারহ ব্যাবস্থাকে ধ্বংসে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করছে। রেভা ভাল্লা বলেন, আশির দশকের শুরুতে ইরাকের ক্ষেত্রেও ইসরাঈল এরূপ ভূমিকা পালন করেছে। তখন মোসাদ ইরাকের তিনজন পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছিল। বাগদাদ সন্নিহিত অসরিক পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণে ইরাককে তখন পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প বিলম্বিত করতে মোসাদ পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে দাগানের মোসাদ বাহিনী নৃশংস পন্থা বেছে নিয়েছিল। দাগানের মোসাদ বাহিনী চেয়েছিল ইরান যেন কোনোভাবেই একটি পারমাণবিক বোমা বানাতে সমর্থ না হয়। আসলে কয়েক বছরের ব্যবধানে ইরান পারমাণবিক প্রকল্পে যে অনেক শ্রী বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ইসরাঈল আর মোসাদ তার হদিস সামান্যতমই অবহিত। পারমাণবিক প্রকল্পে ইরান প্রচুর অর্থ বরাদ্ধ দিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপকসংখ্যক বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করেছে। শুধু তাই নয় ইরান গোপন পারমাণবিক বেস তৈরি করেছে। সফিস্টেক পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে অথচ ইসরাঈল বিস্তারিত এর কিছুই জানে না। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো পারমাণবিক প্রকল্প নিয়ে ইরানের ছলকলা ও কৌশলাদি পশ্চিমা গোয়েন্দাদেরও বোকা বানিয়ে ছাড়ছে, মোসাদকেও।

Iran's shah, Reza Pahlavi, started building two nuclear reactors..... country as it fell under Ayatollah Khomeini's control and into the hands of his loyal mullahs. ইরানের রেজা শাহ পাহলভি ১৯৭০ সালে শান্তিপূর্ণ ও সামরিক প্রয়োজনে দুটি পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন করেছে। কিন্তু রেজা শাহ এর পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন ইসরাঈলকে বিন্দুমাত্র চিন্তায় ফেলেনি। কেননা ইরান ছিল তখন ইসরাঈলের ঘনিষ্ঠ মিত্র। ১৯৭৭ সালে ইসরাঈলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আইজারওয়েজম্যান তেলআবিবে ইরানের জেনারেল হাসান তৌকানিনের সম্মানে একটা পার্টিরও আয়োজন করেছিলেন। জেনারেল হাসান ইরানের সামরিক বাহিনী আধুনাকানয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ইরান ও ইসরাঈল মিত্র দেশ। ইসরাঈল ইরানকে তখন অত্যাধুনিক

অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করত। দুই দেশের মিত্রতার কারণে ওই সময় তাদের মধ্যে অতি গোপনীয় বৈঠকের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ইসরাঈলের ওয়াইজ ম্যান তখন ইরানকে বিশেষ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের অফার করেছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ড. জুমম্যান তখন বলেছিলেন তারা যে ক্ষেপণাস্ত্রের অফার ইরানকে দিয়েছিল তাতে পারমাণবিক ওয়ারহেড সংযোজন সম্ভব। এ কথা শুনে ইরানি মন্ত্রী তৌ ফানিয়ান খুবই চমৎকৃত ও উৎসাহিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো এই যে এসব অস্ত্র সরবরাহের আগেই ইরানে বিপ্লব সংঘঠিত হয়ে যায়। ইরানের নতুন রেভ্যুলুশানি সরকার রেজা শাহের সমর্থকদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। নতুন সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়ায় ইসরাঈলের সর্বাত্তক বিরোধিতা। ভগ্ন স্বাস্থের অধিকারী রেজা শাহ দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এবং তদস্থলে রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হলেন আয়াতুল্লাহ খোমেনি। দেশের শাসনভার বর্তায় খোমেনি সমর্থক মোল্লাদের ওপর।

Khomeini put an immediate end to the nuclear project, which he considered "anti-Islamic." .....the ban on "anti-Islamic" weapons.রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেই পারমাণবিক প্রকল্প ইসলাম বিরোধী আখ্যা দিয়ে দেশের সবগুলো পারমাণবিক প্রকল্প বন্ধ করে দেয়। যে ভবনে পারমাণবিক চুল্লি স্থাপিত ছিল তা বন্ধ এবং যাবতীয় যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেয়। কিন্তু ইরান ১৯৮০ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সাদ্দাম হোসেন ইরানের ওপর বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেন। যুদ্ধে ইরানের জাত শত্রু ইরাকের পক্ষে অপ্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার খোমেনিকে মারাত্মক ক্ষুব্ধ করে তুলে। আয়াতুল্লাহ খোমেনি অবশেষে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে শুরু করে ।

বইটির দ্বিতীয় পাঠ বা গল্পে Funerals in Tehran বা তেহরানে মৃত্যুর মিছিল শিরোনামে বেশকিছু পরমাণু বিজ্ঞানী হত্যার লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে। যেমন, On July 23, 2011, at four thirty P.M., two gunmen on motorcycles emerged on Bani Hashem Street in South Tehran, drew automatic weapons out of their leather jackets, and shot a man who was about to enter his home.

CamScanner

.....a brutal war to stop the secret nuclear weapons program. ২০১১ সালের ২৩ জুলাই ইরানের দক্ষিণ তেহরানের বনি হাশেম স্ট্রীটে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে মোটর সাইকেলে এসে দুই বন্দুকধারী এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তার বাড়িতে ঢোকার মুহূর্তে গুলি করে হত্যা করে । চামড়ার ব্যাগ থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বের করে হত্যা শেষে দুই আততায়ীই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। নিহত ব্যক্তির নাম দারিওইউস রেজাই নাজাদ। বয়স ৩৫। তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের একজন প্রফেসর । এবং ইরানের গোপন পরমাণু কর্মসূচির একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা।

ইরানের রেজাই নাজাদই প্রথম ইরানি বিজ্ঞানী নন যিনি এইভাবে আতাতায়ীর হাতে খুন হলেন। সরকারি তকমা লাগিয়ে ইরান শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু টেকনোলজির উন্নয়নে ব্রতী ছিলেন। ইরান দাবি করে আসছিল রাশিয়ার সহযোগিতায় তারা যে বুশহর চুল্লি নির্মাণে ব্রতি ছিল তার লক্ষ ছিল সৎ। কিন্তু এই বুশহর চুল্লির আড়ালে গোপনে ইরান পারমাণবিক আরো বেশ কিছু কার্যক্রম চালাচ্ছিলো। ওই চুল্লিতে ইরান শক্তিশালী প্রহড়ার অধীনে কাজ চালাতো এবং সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল এক কথায় কঠিন। সময়ের পরিবর্তনে ইরান তাদের আরো বেশ কিছু পরমাণু কর্মসূচির কথা স্বীকার করেছিল। যদিও শুরুতে তারা পরমাণু অস্ত্র ও উন্নয়নের কথা অস্বীকার করেছিল। যদিও পশ্চিমা গোয়েন্দারা ইরানের কিছু আন্ডার গ্রাউন্ডের সংস্থা অভিযোগ করে আসছিল যে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইরানের প্রথম পরমাণু বোমা বানানোর কাজে রত। এক্ষেত্রে একটাই পথ ছিল অজ্ঞাতনামা বাহিনীর ছদ্মবেশে নৃশংস অভিযান চালিয়ে ইরানের গোপন পরমাণু কর্মসূচির কর্মকাণ্ড স্তব্দ করে দেওয়া ।

On November 29, 2010, at seven forty-five A.M., in North Tehran, a motorcycle emerged .....Ahmadinejad appointed him Iran's vice president. ২০১০ সালের ২৯ নভেম্বর। সময় সকাল পৌনে আটটা। স্থান উত্তর তেহরান। ইরানের পরমাণু প্রকল্পের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মাজিদ শাহরিয়ার গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন।

এই সময় তার গাড়ির পিছনে উইনশিল্ডে হেলমেট পড়া মোটর সাইকেল আরোহী ছোট্ট একটি যন্ত্র বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়। মুহূর্তের মধ্যে সে ডিভাইস বিস্ফোরিত হয়। ৪৫ বছর বয়সী ড. মাজিদ নিহত হয় এবং তার স্ত্রী আহত হয়। একই সময় দক্ষিণ তেহরানে আরেক থেকে আরেকজন পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ফেরদাউস আব্বাসী দাভানীর গাড়িতে অনুরূপ ডিভাইস প্রতিস্থাপন করা হলে সেটিও বিস্ফোরিত হয়। এবং ড. আব্বাসী ও তার স্ত্রী আহত হন।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে দায়ী করে। উল্লেখ্য এই দুই বিজ্ঞানী অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইরানের পরমাণু প্রকল্পের প্রধান আলী আকবর সালেহী নিহত শাহরিয়ারকে শহিদ আখ্যা দিয়ে বলেন তারা মহৎ কাজের সাথেই যুক্ত ছিলেন। আর তা হলো মানব কল্যান। সালেহী পারমাণবিক প্রকল্পের বিষয়টি এড়িয়ে যায়।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনাজাদ নিহত দুই বিজ্ঞানীকে অসম্ভব প্রতিভাধর আখ্যায়িত করে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। ইতিমধ্যে ড. আব্বাসী আরোগ্য লাভ করলে তাকে আহমেদিনাজাদ ভাইসপ্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দেন। ইরানের বিজ্ঞানীদের যারা হত্যা করেছিল তাদের পরিচয় কখনোই জানা যায়নি।

On January 12, 2010, at seven fifty A.M., Professor Masoud Ali Mohammadi came out of his home..... reminds us of the Zionist methods." ২০১০ সালের ১২ জানুয়ারী। সকাল সাড়ে ৭ টায় উত্তর তেহরানের শরীয়তী স্ট্রীটের বাসা থেকে বের হয়ে গাড়ির লক খুলছিল প্রফেসর মাহমুদ আলী মুহাম্মাদী। তার গন্তব্যস্থল ছিল শরীফ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরী।যখনই তিনি তার গাড়ির লক খুলছিলেন তখন ভয়ংকর এক বিস্ফোরণে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। নিরাপত্তা বাহিনী এসে দেখতে পায় মুহাম্মাদীর গাড়ি বিধ্বস্ত এবং প্রফেসর মুহাম্মাদীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

পরে জানা গেল প্রফেসর মুহাম্মাদীর গাড়ির সাথেই লাগোয়া একটি মোটর সাইকেলে ব্যাপক পরিমাণ বিস্ফোরণ রাখা হয়ে ছিল। ইরানি গণমাধ্যম এবার তারস্বরেই বলতে লাগলো মোসাদ এজেন্টরাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনাজাদ ঘোষণা করেন এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড ইহুদিবাদী প্রক্রিয়ার কথাই স্বরণ করিয়ে দেয়।

In January 2007, Dr. Ardashir Hosseinpour was allegedly killed by Mossad agents .....years earlier, he had been awarded his country's highest distinction for military research. ২০০৭ সালের জানুয়ারীতে ড. আরদাশির হোসেনপুরকে হত্যা করা হয়। এ সময় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, তেজস্ক্রিয় বিষ দিয়ে ইসরাঈলের গোয়েন্দা বাহিনী তাকে হত্যা করেছে। লন্ডনের সান ডে মেইল টেক্সার্সভিত্তিক স্টার্টকর স্টাটেজি এন্ড ইন্টেলিজেনস থিংক ট্যাংকের বরাত দিয়ে এই খবরটি প্রকাশ করেন। ইরান সরকার এই খবরটি নিয়ে উপহাস করে। তাদের ভাষ্য ইরানের অভ্যন্তরে এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা মোসাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইরানি কর্মকর্তরা বলেন যে, প্রফেসর হোসেইনপুর তার বাড়িতে এক অগ্নিকাণ্ডের সময় ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। আর ইরান আরো গুরুত্ব দিয়ে জানায় প্রফেসর হুসাইনপুর কখনোই ইরানের পরমাণু কর্মসূচির সাথে জড়িত ছিলেন না। তিনি একজন বিখ্যাত তড়িৎ চুম্বক সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে জানা যায় যে, প্রফেসর হোসেইনপুর ইসফাহান সিক্রেট ইনস্টলশনে কাজ করতেন। সেখানে অপরিশোধিত ইউরোনিয়াম গ্যাসে পরিণত করা হতো। এই গ্যাস ইরানের ভূগর্ভস্থ নানতাজ কেন্দ্রে পারমাণবিক গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যবহৃত হতো। এই কেন্দ্রটি শক্তিশালী ও দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মৃত্যুর দুবছর পূর্বে হোসেইনপুরকে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে অবদান স্বরূপ ইরানের সর্বোচ্চ খেতাব দেওয়া হয়েছিল।

CamScanner

৯. সাদ্দামের সুপারগান প্রকল্প ধ্বংস করে মোসাদ!

প্রতিবেশী এবং মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ায় ইরাকের প্রতি ইহুদি রাষ্ট্র তথা মোসাদের ছিল জাত শত্রুতা। অন্যতম প্রধান নজরদারি কায়েম করা হয় তাই ইরাকে।

উইকিপিডিয়া বলছে... "সিআইএ'র সহায়তায় ইরাকে বাথ পার্টির শীর্ষনেতা আরিফ রহমান ও পরবর্তীকালে সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় আসলেও ইরাককে বিশ্বাস করত না ইসরাঈল। এজন্য ইরাকে ইসরাঈলের গোয়েন্দা তৎপরতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ইরাকে সিআইএ মোসাদের সহযোগি হিসেবে কাজ করেছে। ইরাকে অনেকগুলো বড় অপারেশন চালায় মোসাদ। এর একটি হচ্ছে সাদ্দামের আলোচিত সুপারগান প্রজেক্ট।

যুক্তরাজ্যের হ্যাম্পশায়ারের ফোর্ট নেলসন। সেই মান্ধাতা আমলের ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান ব্যবহৃত নানান অস্ত্র এই দুর্গে রাখা আছে। অস্ত্রাগার দুর্গটির সামনে দুটো বিশালাকার স্টিলের পাইপ দণ্ডায়মান। দেখলে মনে হতে পারে, যে কেউ চাইলে ওই স্টিলের পাইপ বেয়ে উঠে যেতে পারে অনেকটা দূর। দেখে খুব সাধারণ কোনো স্টিলের বড় পাইপ মনে হলেও আদতে কিন্তু এই দুটি পাইপের একটি অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল। বিশ্বে একটা সময় যে বিশাল বন্দুক বানানো শুরু হয়েছিল সেই বিশাল প্রকল্পের একটি ছোটো নমুনা হলো এই বিশাল স্টিলের পাইপ। একে বলা হলো 'সুপারগান' বা বিগ ব্যাবিলন। ১৫৬মিটার লম্বা ব্যারেল থেকে কক্ষপথে স্যাটেলাইট নিক্ষেপ করা যাবে এমনটা ভেবেই তৈরি করা হয়েছিল ওই সুপারগান।

এই সুপারগানের উদ্ভাবক হলেন কানাডার উদ্ভাবক জেরাল্ড বুল। বিশ্বের প্রথম সারির অস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনি অন্যতম। রকেট ব্যবহার না করে কীভাবে এই সুপারগান দিয়ে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানো যায় তাই ছিল তার অনেক গবেষণার মাঝে একটি গবেষণার বিষয়। ব্রিটিশ রয়েল আর্মারির সংরক্ষক নিকোলাস হলের ভাষ্যমতে, 'বুল ছিল একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে চমৎকার একজন মানুষ।

তার শারীরিক আকৃতি দেখে বোঝার উপায় ছিল না তিনি এত বিশাল সব অস্ত্র তৈরিতে সক্ষম।' কিন্তু মজার বিষয় হলো বিগ ব্যাবিলন যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরির কথা ছিল তা বাস্তবে হয়নি। তবুও এই বিশাল বন্দুকটি নিয়ে আজও আগ্রহের শেষ নেই ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে।

এমন একটা সময় আসলো যখন বিশ্বের অধিকাংশ সুপারপাওয়ার রাষ্ট্রগুলোই বুলের কাছে অনেক দাবি দাওয়া নিয়ে আসতে শুরু করল। কারণ ওই সময়টাতে প্রতিটি সুপারপাওয়ার রাষ্ট্রই একে অপরের শত্রু হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের ডামাডোলে। তখন বুল নিলেন এক অবাক করা সিদ্ধান্ত। তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফ্রান্সের দাবি পর্যন্ত মানলেন না, কিন্তু ইরাকের সাবেক শাসক সাদ্দাম হুসেইনের জন্য তিনি সুপারগান তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। আর ওই সিদ্ধান্ত শেষমেষ হত্যাকাণ্ডে গিয়ে শেষ হয়।

১৯৬০ সালের দিকে বুল কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের হয়ে সুপারগান তৈরির জন্য গবেষণা করেছিলেন। তখন প্রকৌশলীরা তার নকশা অনুযায়ী সুপারসনিক বিমান তৈরিরও চেষ্টা করেছিলেন। বুলের নকশা অনুযায়ী এই বিমানের জন্য কোনো দামি উইন্ড টানেল দরকার হবে না। স্রেফ একটি বড় বন্দুকের ভেতর থেকে উৎক্ষেপন করলেই হবে এমটাই ছিল বুলের ভাষ্য। কিন্তু তৎকালীন সময়ে সেই প্রকল্প আলোর মুখ না দেখলেও বুল কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ফান্ডের বিনিময়ে অনেক শক্তিশালী বোমা তৈরি করেছেন। যদিও তার ব্যক্তিগত ইচ্ছে ছিল স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য সুপারগান তৈরি করা, মিসাইল ছোড়ার জন্য না।

কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক অ্যান্ড্রু হিগিন্সের মতে, 'অল্প খরচের বিষয়টি খেয়াল রাখবার মতো বিষয় ছিল। একটা বিশাল বন্দুক ব্যবহার করে কোনো কিছু ছুড়ে দিলে একদিকে যেমন খরচ অনেক কম হয়, তেমনি আবার পুনরায় ব্যবহারও করা যায়। ছোটোখাটো ত্রুটি হলে তা ঠিকও করে নেওয়া যায়। যা বর্তমান পন্থাগুলোতে হয় না। রকেট উৎক্ষেপনকারী লাঞ্চারগুলো একবার নষ্ট হয়ে গেলে তা আর ঠিক করা যায় না।' ১৯৬১ সালের দিকে

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার যৌথ উদ্যোগে গঠিত প্রকল্প হাই অ্যালটুচিউড রিসার্চে(হার্প) কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি এবং তার সহকর্মীরা পৃথিবীর কক্ষপথে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য কয়েকবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যয় সামলাতে না পেরে শেষমেষ ১৯৬৭ সালে প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে অনেকেরই ধারণা বুল ওই সুপারগান বা স্পেসগান তৈরি করতে পেরেছিলেন হার্পে থাকাকালে।

অধ্যাপক হিগিন্সের মতে, 'হার্পের কাছে যে বন্দুকগুলো রয়েছে বুলের তৈরি করা তা দিয়ে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত কিছু ছুড়ে মারা যায়। তবে এই ছোড়ার ক্ষেত্রে যদি গ্যাস ব্যবহার করা হয় তাহলে আরও অনেকটা দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর এই বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ার জন্য একটি গাড়িও ব্যবহার করতে হয়।' অনেকের মতেই এই বন্দুক দিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে স্যাটেলাইট ছুড়ে দেওয়ার ব্যাপারটি হাস্যকর। কারণ তারা জি ফোর্সকে সামনে নিয়ে আসেন মূল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে হিগিন্স বলেন, 'সেনাবাহিনীর আর্টিলারি বোমাগুলোতে বর্তমানে জিপিএস এবং লেজার গাইডেন্স ব্যবস্থা থাকে। এমনকি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও করা থাকে বোমার অন্যান্য ফাংশানগুলোকে ঠিক রাখার জন্য। তাহলে ঠিক একই কায়দায় ওই জি ফোর্সকেও মোকাবিলা করা সম্ভব। তবে সবকিছুই যে ওই বন্দুক দিয়ে ছোড়া যাবে তা কিন্তু নয়।'

বুল যেভাবেই হোক তৎকালীন ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এই সুপারগানই হলো আগামীর ভবিষ্যৎ।

কিন্তু ১৯৭০ সালের দিকে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ক্ষমতাধর দেশই সুপারগান সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আর তখন প্রকল্প চালানোর জন্য বুল শুরু করেন অস্ত্র বিক্রি। আর সেই বিক্রিত অর্থ থেকে তিনি চালাতে থাকেন তা সুপারগান প্রকল্প। স্পেস রিসার্চ করপোরেশন নামে একটি কোম্পানি খুলে বসেন তিনি এবং সেখান থেকেই তিনি সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে অস্ত্র বিক্রি করেন। ১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি নীতিমালা ভঙ্গ করায় বুলকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ছয়মাস তাকে মার্কিন কারাগারে কাটাতে হয়। মুক্তি পাবার পর তিনি আবারও দক্ষিণ

আফ্রিকার কাছেই অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করেন এবং এবারে তাকে এই অস্ত্র বিক্রির জন্য ৫৫হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়। শেষমেষ কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর ভীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ব্রাসেলস, বেলজিয়ামে চলে যান এবং সেখান থেকেই ইউরোপের দেশগুলোতে অস্ত্র ব্যবসা শুরু করেন। ওই সময়টায় বুল ক্রমশ পশ্চিমা বিশ্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন।

১৯৮১ সালে ইরাকি সরকার বুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন অস্ত্র নির্মাণের জন্য। কারণ সাদ্দাম হুসেইন চাচ্ছিলেন বুলের বানানো অস্ত্র দিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ওই সময় সাদ্দাম হুসেইন ছিলেন ইরাকের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। বুল সাদ্দাম হুসেইনকে তার পরিকল্পনা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন নিশ্চিতভাবেই। অধ্যাপক হলের মতে, বুল বিশেষ করে সাদ্দাম হুসেইনের ওপর আগ্রহ বোধ করেছিলেন কারণ সাদ্দামেরও সমান আগ্রহ ছিল আর্টিলারি নিয়ে। তৎকালীন সময়ে সাদ্দাম হুসেইন পশ্চিমা বিশ্বের কাছে অতটা হুমকিস্বরুপ না থাকলেও আরব বিশ্বের নেতার হবার বাসনা তার বেশ ভালো করেই ছিল। আরব বিশ্বের নেতা হয়ে তিনি তার সমরাস্ত্র ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে। এমনকি সাদ্দাম হুসেইন কক্ষপথে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণেরও চিন্তা করেছিলেন।

শেষমেশ ১৯৮৮ সালে ইরাকি সরকার বুলকে ২৫ মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা দেয় ব্যাবিলন প্রকল্পের জন্য। বুলের জন্য এটাই ছিল প্রথম পরিপূর্ণ সুপারগান প্রকল্প। ব্যাবিলন প্রকল্প থেকে মোট তিনটি সুপারগান তৈরি করা হয়েছিল। বন্দুক তিনটির মধ্যে দুটি তৈরি করা হয় এক হাজার মিলিমিটার ক্যালিবারের বন্দুক ও অন্যটি তৈরি করা হয় ৩৫০ মিলিমিটারের, যার নাম দেওয়া হয়েছিল বেবি ব্যাবিলন। ১৫৬ মিটারের বিশাল আয়তনের ব্যাবিলন বন্দুকটির ওজন প্রায় দেড় হাজার টনেরও বেশি। সহজে বহনযোগ্য ছিল না বলে একটি পাহাড়ের ঢালে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে রাখা হতো বন্দুকটিকে। হিসেব অনুযায়ী এই বন্দুকটি ৬০০কেজি ওজনের গুলি প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে পর্যন্ত ছুড়তে পারত। আর এই এক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে শুধু কুয়েতই ছিল না, ইরানও ছিল এর আওতায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বুলের তৈরি করা ওই সুপারগানের অনেক ত্রুটি ছিল। যেগুলো তৎকালীন সময়ে অতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসা এক রিপোর্টে জানিয়েছিল যে, ওই সুপারগান দিয়ে মহাকাশে স্যাটেলাইট নিক্ষেপে প্রতি কিলোগ্রামে ব্যয় হবে এক হাজার সাত শত সাতাশ ডলার। অন্যদিকে বর্তমান প্রযুক্তিতে প্রতি কিলোগ্রাম পাঠাতে ব্যয় হয় বাইশ হাজার ডলার। বিগ ব্যাবিলনের বিভিন্ন অংশ তৈরি করা হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, সুইজারল্যান্ড এবং ইতালিতে। এমনকি খোদ যুক্তরাজ্য থেকেও তৈরি করা হয়েছিল এর উল্লেখযোগ্য অংশ। কারণ, যুক্তরাজ্যের ফোর্গমাস্টাররা পৃথিবীতে সবচেয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্টিল তৈরি করে থাকে।

যাহোক, সেই বিগ ব্যাবিলন বর্তমানে যুক্তরাজ্যে রয়েছে। ইরাকে আক্রমণের এক পর্যায়ে যুক্তরাজ্য এই বন্দুকটিকে নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। তবে বিজ্ঞানী বুলের ভাগ্য অতটা ভালো ছিল না। ১৯৯০ সালে ব্রাসেলসে তার নিজের বাসভবনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। বুলকে হত্যা করার কয়েক মাসে আগে তার বাসভবনে আরও একবার হামলা চালানো হয়েছিল কিন্তু তখন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

কানাডার বিজ্ঞানী গিরাল্ড বুল বিভিন্ন দেশে স্যাটেলাইট গবেষণায় কাজ করতেন। ইরাক স্যাটেলাইট উন্নয়ন প্রোগ্রাম 'প্রোজেক্ট ব্যাবিলন'-এর ডিজাইন করলে তাকে ১৯৯০ সালের ২২ মার্চ বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে তার বাড়ির বাইরে গুলি করে হত্যা করে মোসাদ।

এ ছাড়া মিশয়েল বার-জোহার এবং নিসিম মিশাল রচিত 'MOSSAD' গ্রন্থে এর সত্যতা পাওয়া যায়। ইসরাঈলী এই লেখকদ্বয় অবশ্য বেশ আক্রমণাত্মক ভাষায়ই ড. বুল এবং সাদ্দাম হোসেনের প্রসঙ্গটি আলোচনা করেন। যেমন, On March 23, 1918, at the height of World War I, a huge artillery shell exploded.....father of the great gun collapsed, and died on the spot. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯১৮ সালে ২৩ মার্চ প্যারিসের প্লেস ডিলা পাবলিকে বেশকিছু কামানের গোলা এসে পরে সুপারগানের স্বপ্ন ড. বুলের মধ্যে সব সময়

জাগরুক ছিল। জুলভার্ন যে ধরনের সুপারগানের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার চেয়ে বড়। গেট্যে তার উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে শয়তানের কাছে তার আত্মা বিক্রিতেও প্রস্তুত ছিলেন। হ্যাঁ, ড. বুলও এরকম একজনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। আর তিনি হলেন ইরাকের শাসক সাদ্দাম হোসেন।

আশির দশকে ইরাক ইরানের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত ছিল। বুল সাদ্দামের কাছে দুই শত জিসি ফোরটি ফাইভ গান বিক্রি করেন। এগুলো তৈরি হয় অস্ট্রিয়ায়। এগুলো জর্ডানের আকাবা বন্দর দিয়ে চোরাচালানে ইরাকে আসে। এটা ছিল সাদ্দাম ও ড. বুলের যৌথ প্রকল্পের শুরু।

ড. বুলের মতো সাদ্দাম হোসেনও ছিলেন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। বিশেষ করে ইসরাঈল যখন তামুজ পরমাণু চুল্লি বোমা মেরে ধ্বংস করে দেয়। তখন সাদ্দাম হোসেন খুবই ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন। তামুজ কেন্দ্রের মাধ্যমেই সাদ্দাম হোসেন পরমাণু অস্ত্রের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সাদ্দাম হোসেন ইসরাঈলের প্রতিও ঈর্ষা অনুভব করতেন। কেননা, ইসরাঈল মহাকাশে স্যাটেলাইট প্রেরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

ড. বুল সাদ্দামের কাছে অফার করলেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং দূরপাল্লার সুপারগান তাকে বানিয়ে দেবেন। বুল সাদ্দামকে প্রতিশ্রুতি দিলেন ইরাক মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাবেই। এবং যে ফায়াশেল বানিয়ে দেবে তা হাজার মাইলের বেশি অতিক্রম করবে। সাদ্দাম হোসেন উপলব্ধি করলেন ইসরাঈলের জনবসতিপূর্ণ এলাকায় হয়তো বোমা ফেলানোর সুযোগ তার হাতের মুঠোয়। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বুলের অফার গ্রহণ করলেন। ড. বুল এই প্রকল্পের নাম দিলেন প্রজেক্ট ব্যাবিলন। ড. বুল সাদ্দাম হোসেন এর কাছে ব্যাবিলন প্রজেক্ট এর জন্য একটি সুপারগানের পরিকল্পনা করেন। এর দৈর্ঘ্য হবে ১৫০ মিটার এবং ওজন হবে ২১০০ টন। ক্যালিবার ১ মিটার। দৈত্যাকার গান বানানোর আগে ড. বুল এর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এটি হবে পরীক্ষামূলক। তিনি এর নাম দিলেন বেবি ব্যাবিলন।

এই বেবি ব্যাবিলন অতীতের সব গানের চেয়ে বড়। এই গানটির দৈর্ঘ্য ছিল ৪৫ মিটার। সাদ্দামের আর্টিলারি কমান্ডার এর কার্যক্ষমতার

ব্যাপারেও সশ্রদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আসল গানটির সাথে তার তুলনাই চলে না। এক কথায় এক মহাবিস্ময়ে পরিণত করেন। আর ইরাকের মরুভূমিতে জন্ম হবে এর। ড. বুল তার জায়ান্ট গান বানানোর জন্য ইরাকের একটি দুর্গম পাহাড়ি এলাকা বেছে নিলেন। লোকেশন চূড়ান্ত করে ড. বুল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এর সরাঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য আদেশ দিলেন। এই বৃহৎ কামানের মূল হোতা অবশ্যই ব্যারেল। এই ব্যারেলে বুল প্রচুর পরিমাণে স্টিল টিউব ব্যবহারের পরিকল্পনা করেন। তিনি ইংল্যান্ড ও স্পেন, হল্যান্ড এবং সুজাইরল্যান্ড এ অর্ডার দিলেন। ওই সব দেশের সাথে তিনি ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। সুপারগানের বিষয়াট এড়িয়ে তিনি বলেন যে, একটি বড় মাপের তেলের পাইপ লাইনের জন্য এসব স্টিল প্রয়োজন। এই চাতুরীর কারণ কৌশলগত অস্ত্র বানানোর ব্যাপারে ইরাকের ওপর আন্তর্জাতিক কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। আর এসব উপকরণ প্রতিবেশী জর্ডানের নামে আমদানি করা হচ্ছিল। পাইপ যথারীতি ইরাকে আসা শুরু করল।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, অধিকাংশ কোম্পানি এবং দেশই বুঝতে পেরেছিল এই সমস্ত পাইপ তেল উত্তোলোনের জন্য নয়। বরং মারাত্মক কোনো অস্ত্র বানানোর জন্য। কিন্তু তাদের লোভের কারণে তারা প্রায় চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। এবং সেখানে তাদের বিরোধ ছিল আরো ফেনিয়ে ওঠুক। এ ব্যাপারে তারা ঐকমত্য ছিল। এইসব পাইপের ক্ষেত্রে রপ্তানি লাইসেন্স দেওয়া হয়। এবং মালবাহী জাহাজ ইরাকে পাঠানো শুরু করে। অধিকাংশ পাইপই ইরাকে এসে নির্বিঘ্নে পৌঁছে।

ড. বুলের টেকনিশিয়ানের প্রাইভেট আর্মি এবং প্রকৌশলীরা সুপারগানের অংশগুলো জোড়া লাগাতে শুরু করে। এই গানের মুখ নিবন্ধ করা হলো পশ্চিম ও ইসরাঈলের দিকে। কিন্তু ড. বুল এখনো সন্তুষ্ট নন । তিনি ইরাকের জন্য সেলফ প্রোপেল্ড দুটি গান বানালেন। একটির নাম আল মাজনুন এবং আল কাও। আল মাজনুনকে অবিলম্বে ইরাকের পদাতিক বাহিনীতে যুক্ত করলেন। ড. বুল একই সাথে ইরাকের স্কাড মিসাইলের

উন্নয়নের কাজ শুরু করেন। তিনি স্কাডের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করলেন। সেখানে আরও আধুনিক হয়ে উঠল। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইসরাঈলের বিরুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করার কথা। ড. বুল একে এক সীমা অতিক্রম করলেন ।

ড. বুলের ছেলের যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে তিনি স্বীকার করেন ইসরাঈলের গোয়েন্দারা তার বাবাকে এই ধ্বংসের খেলা থেকে সরে আসার জন্য সতর্ক করেন। কিন্তু এসব কানে নিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। শুধু ইসরাঈল এই বিজ্ঞানীকে থামাতে চেষ্ট করেছেন তা নয়। সিআইএ, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীও এই বিজ্ঞানীকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন। একই কথা প্রযোজ্য ইরানিদের ক্ষেত্রেও। ইরান ইরাক যুদ্ধের সময় ড. বুল নির্মিত অস্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। ফলে বিশ্বের বহু লোক এই বিজ্ঞানীকে স্তব্দ করে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।

ড. বুল যখন বিদেশিদের সতর্ক বার্তায় কোনো পাত্তাই দিচ্ছিলেন না তখন তা প্রতিরোধে তারাও নানা পন্থা ভাবলেন। যেমন ১৯৯০ সালে শীতকালে ব্রাসলেসে বুলের বাড়ি বেশ কয়েকবার ভাঙচুর করা হয়। হামলাকারীরা বাড়ি থেকে কোনো মালামালই নেয়নি। শুধু ফার্নিচার ভাংচুর করা হয়। ফলে এই হামলার উদ্দেশ্য বুলের সম্যক না বোঝার কারণ ছিল না। কেননা এটা ছিল একটা হুমকি। সাবধান হয়ে যাও। আমরা তোমাকে যা খুশি তা করতে পারি। আবারও ড. বুল এই হুমকি আমলে নিলেন না। গানের অংশ ঠিকই ইরাকে আসতে লাগল। এবং প্রতিপক্ষ আর বুঝতে বাকি রইল না ড. বুলকে এই প্রকল্প থেকে সরানো যাবে না।

১৯৯০ সালের ২২ মার্চ । বুল তার ব্রাসেলসের বাসায় ফিরছিলেন ফ্লাটের চাবি যখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে তিনি খুঁজছিলেন। তখন অন্ধকার থেকে একজন লোক এগিয়ে এলো। এক নিঃশব্দ বন্দুক তার হাতে। লোকটি তার মাথায় পর পর ৫টি গুলি করল। বিশালকার কামানের স্বপ্নপুরুষ ড. বুল কাত হয়ে পড়লেন এবং ঘটানস্থলেই মারা গেলেন।

১০. চকলেট খাইয়ে যাকে মেরেছিল মোসাদ!

মিশায়েল বার-জোহার এবং নিসিম মিশাল রচিত MOSSAD গ্রন্থে এমনি একটি লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ঘটনাটি হুবহু তাদের ভাষায়ই তুলে দেওয়া হলো।

It all started with a box of chocolates. Dr. Wadie Haddad, the head of the Popular Front for the Liberation of Palestine, was one of the most dangerous enemies of Israel. ..... The attacks by Haddad's group against Israel ceased almost completely, and the long battle with one of Israel's vilest enemies was definitely over. After Bull and Haddad, it was Shaqaqi's turn. ঘটনার শুরু এক বাক্স চকলেট দিয়ে। ড. ওয়াদি হাদ্দাদ ছিলেন পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্যা লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের প্রধান। ইসরাঈলিদের শত্রুদের তালিকায় তিনি শীর্ষে। তার সর্বোচ্চ দুর্ধর্ষ অভিযানের একটি হলো ১৯৭৬ সালের ২৭ জুন এয়ার ফ্রান্সের একটি প্লেন ছিনতাই করা। প্লেনটি তেলআবিব থেকে ফ্রান্স যাচ্ছিল। আরব, জার্মান ও দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কিছু সন্ত্রাসী ওই প্লেনের পাইলটকে বাধ্য করে সেটিকে উগান্ডার রাজধানী এন তেব্বেতে নামাতে। তাদের দাবি ছিল ইসরাঈলী ও ইহুদি জিম্মিদের তাদের জিম্মায় দিতে হবে। ইসরাঈলি কমান্ডোরা হাজার মাইল উড়ে গিয়ে এই দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। তারা পৌঁছে যায় এন তেব্বেতে। কমান্ডোরা বিশ্বের ভয়ংকর সন্ত্রাসীদের হত্যা করে জিম্মিদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

এনতেব্বের ঘটনার পর হাদ্দাদ উপলব্ধি করেন তার জীবন এখন বিপন্ন। এবং তার সদর দফতর বাগদাদে স্থানান্তরিত করেন। কেননা, বাগদাদে তিনি নিজেকে নিরাপদ ভেবেছিলেন। ইরাক থেকেই তিনি ইসরাঈলের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন।

ইসরাঈলের জাত শত্রুকে খতম করতে মোসাদ ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? খোঁজ শুরু হলো ড. হাদ্দাদের যাবতীয় দুর্বলতার। এভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হলো মোসাদ জানতে পারে চকলেটের প্রতি

হাদ্দাদের অপরিসীম দুর্বলতা। বিশেষ করে বেলজিয়ামের সেরা চকলেট। আবার এই খবরটি দেয় ফিলিস্তিনের একটি বিশ্বস্ত সূত্র। যাকে মোসাদ হাদ্দাদের পপুলার ফ্রন্টে ঢুকিয়েছিলেন।

মোসাদ প্রধান তার চকলেট প্রীতির কথা ইসরাঈলের নয়া প্রধানমন্ত্রী বেগিনের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি অবিলম্বে চকলেটের মাধ্যমে এই অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। মোসাদ এজেন্টরা হাদ্দাদের বিশ্বস্ত এক অনুচরকে এ কাজে নিয়োগ দেন। হাদ্দাদের ওই বিশ্বস্ত সহকর্মী তখন ইউরোপের একটি মিশনে ছিলেন। তিনি তার বসের জন্য বিশাল সাইজের গোবিতা নামের একটি চকলেট নিয়ে আসেন। মোসাদ বিশেষজ্ঞরা ওই চকলেটে প্রাণঘাতী বায়োলজিক্যাল বিষ ঢুকিয়ে দেন। মোসাদ এজেন্টরা আশা করেন যে, হাদ্দাদ এই চকলেট একাই খাবে কাউকে ভাগ দেবে না।

এজেন্ট বিষমাখা চকলেট হাদ্দাদকে দেন। তিনি একাই সবগুলো খান। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হাদ্দাদের খাওয়ার রুচি চলে যায়। এবং ওজন কমতে শুরু করে। রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তাররা জানান হাদ্দাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষিত প্রায়। বাগদাদের কেউ ধারণা করতে পারছিলেন না যে পপুলার ফ্রন্টের এই নেতার স্বাস্থ্যের কেন এত অবনতি? হাদ্দাদের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি। তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। অস্থি চর্ম বেরিয়ে আসার উপক্রম। একটি বিছানাই তার একমাত্র শয্যা হয়ে উঠল। তাকে জরুরিভিত্তিতে পূর্ব জার্মানের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো। সোভিয়েত ব্লকের অন্যান্য দেশের মতো পূর্ব জার্মানি ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ করে আসছিল। কিন্তু ড. হাদ্দাদের ক্ষেত্রে তাদের কোনো সহযোগিতা কাজে আসল না। তারা হাদ্দাদকে বাঁচাতে পারল না।

১৯৭৮ সাল ৩০ মার্চ ড. হাদ্দাদ ইন্তেকাল করেন। ডাক্তার বলেন অজ্ঞাত রোগ। ৪৩ বছর বয়সী এই সন্ত্রাসী নেতার মৃত্যুর পর তার বোনের কাছে লক্ষ লক্ষ ডলার রেখে যান। ফিলিস্তিনের জন্য তার পবিত্র যুদ্ধের জন্য বহু লোক বা প্রতিষ্ঠান তাকে টাকা দিত বলে ধারণা। পূর্ব জার্মান

ডাক্তাররা বলেন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কেউ অবশ্য এই ঘটনায় মোসাদকে দায়ী করল না। হাদ্দাদকে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ইরাককে বিষ প্রয়োগের জন্য দায়ী করল। কেননা, ড. হাদ্দাদ এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করেছিল। বেশ কয়েক বছর পর ইসরাঈলী লেখকদের ড. হাদ্দাদ সম্পর্কিত সত্য প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়।

এই লেখকরা (মাইকেল জোহার এবং নিসিম মিশাল) মনে করে ড. হাদ্দাদের অপরিণত বয়সে মৃত্যুতে মোসাদের হাত রয়েছে। এর ত্রিশ বছর পরে যখন ইয়াসির আরাফাত মারা যান তখন তার ঘনিষ্ঠজনরা এই মৃত্যুর জন্য ইসরাঈলকে দায়ী করেছে। ওই অভিযোগ কখনোই প্রমাণিত হয়নি। ইয়াসির আরাফাতকে ব্যাপক চিকিৎসা ও টেস্ট করেছিলেন তারই ফ্রান্স ডাক্তার। ড. হাদ্দাদের মৃত্যুর পর তার নেতৃত্বাধীন ভয়ংকর সংগঠনটির মৃত্যু ঘটে। হাদ্দাদের লোকজনের ইসরাঈল বিরোধী কর্মকাণ্ড চূড়ান্তভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

১১. ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ প্রধানকে হত্যা করে মোসাদ!

ইসলামিক জিহাদ ফিলিস্তিনের একটি সশস্ত্র স্বাধীনতাকামী দল। ইসরাঈলের ভেতরে একের পর এক গুপ্তহত্যা, আত্মঘাতি হামলা পরিচালনা করে তারা। ঘুম হারাম হয়ে যায় ইসরাঈলী কর্মকর্তাদের। স্বয়ং ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী ইসলামিক জিহাদ প্রধানকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। কুকর্মের জন্য মোসাদ তো সব সময়ই প্রস্তুত থাকে।

শাকাকীর সংগঠন ইসলামিক জিহাদ অনেকগুলো অপারেশন চালায়। ১৯৮৯ সালের ৬ জুলাই তেলআবিব থেকে জেরুজালেমগামী একটি বাসে হামলা চালায়। ১৬ জন ইসরাঈলি নিহত হয়। ১৯৯০ সালে ৪ ফেব্রুয়ারী কায়রোর সন্নিকটে একটি পর্যটন বাসে বোমা মেরে ৯ জনকে হত্যা করে। ২০০০ সালের ২০ নভেম্বর দক্ষিণ ইসরাঈলে বোমা হামলা করে ৮ জন ইহুদিকে হত্যা করে সেবার। ১৯৯৪ সালে গাজায় এক আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ৪ ইসরাঈলি সৈন্যকে পরপারে পাঠায়।

১৯৯৫ সালে ইসলামিক জিহাদের দুই সদস্য আত্মঘাতী হামলা করে ইসরাঈলের নেতান্না বাস স্টেশনের কাছে বেইট লিড জংশনের অদূরে। এতে ২১ জন ইসরাঈলী নিহত হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই সৈন্য। আহতের সংখ্যা ৬৮। ইসরাঈলের ইতিহাসে এটি একটি বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা। ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন ঘটনার পরপরই বেইড লীভে যান। এবং বোমা হামলার ঘটনায় খুবই কষ্ট পান। তিনি এই ঘটনার কয়েকদিন পর টাইম ম্যাগাজিন পড়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। কেননা সেই পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে শাকাকী উল্লেখ করেন যে, ফিলিস্তিনে আরব ইসরাঈলের যুদ্ধের ঘটনার পর এটাই সবচেয়ে বড় সামরিক আক্রমণ।

টাইম ম্যাগাজিন শাকাকীকে প্রশ্ন করেন, 'এই ঘটনায় মনে হচ্ছে আপনার মনে শান্তি হচ্ছে। আপনি এই প্রাণহানীতে সন্তুষ্ট?' শাকাকী জবাবে বলেন, 'এটা আমাদের লোকেদের মনে শান্তি ও সন্তুষ্টি এনে দিয়েছে।'

মাইকেল জোহার এবং নিসিম মিশাল রচিত MOSSAD গ্রন্থেও এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। যেমন,

... He had rightfully earned the death sentence that the Mossad carried out in a Malta street. After Shaqaqi's death, the Islamic Jihad almost collapsed, and it took years for the organization to recover from the death of its leader...

ক্রোধান্বিত প্রধানমন্ত্রী রবিন মোসাদ প্রধান সারতাই শাতিবকে নির্দেশ দেন ইসলামিক জিহাদ প্রধানকে হত্যার। শাকাকীর জন্য মৃত্যুদণ্ড যথার্থই ছিল যা মাল্টায় মোসাদ কার্যকর করেছে। শাকাকী মৃত্যুর পর ইসলামিক জিহাদের কর্মকাণ্ড প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। নেতা শাকাকীর মৃত্যুর পর দলের প্রায় পূর্বাবস্থা ফিরে আসতে বেশ কয়েক বছর কেটে যায়।

শাভিত দীর্ঘদিন ধরে খুঁজতে থাকেন শাকাকীকে। একটি পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী মোসাদ দামেস্কে শাকাকীর সদর দফতরে হামলা চালানোর

অনুমতি চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ব্যর্থ হন। কেননা রবীন চান না সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের সঙ্গে গোপনে শান্তির অন্বেষায় যে আলোচনা চালাচ্ছিলেন এক্ষণে এই শান্তির আলোচনা ভেস্তে যাক। কেনান ইসরাঈরের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পোত্তির সম্ভাবনা। ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী শাকাকীকে ধরতে বা হত্যা করতে বিকল্প রাস্তা খুঁজে বের করতে নির্দেশ দেন। মোসাদ প্রধান বলেন যে শাকাকী ভালো করেই জানেন যে তিনি হিটলিস্টে আছেন। তাই তিনি সিরিয়ার বাইরে খুব বেশি যান না। তারপর রবিন বলেন দামেস্কে কোনোভাবেই শাকাকীকে হিট করা যাবে না। করতে হয় সিরিয় সীমান্তের বাইরে গিয়ে করো।

এখন প্রশ্ন কোথায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত করবে? মাথা খারাপের যোগার মোসাদের শীর্ষ কর্মকর্তাদের। এরই মধ্যে সিরিয়ার বাইরে একটি সুযোগ এসে গেল। লিবিয়া থেকে দাওয়াত পেলেন শাকাকী। ফিলিস্তিনি বিভিন্ন সংগঠন সেখানে সম্মেলন করবে। প্রথমে শাকাকী ওই সম্মেলনে যেতে অস্বীকৃতি জানান । কিন্তু যখন শুনলেন তার জাত শত্রু আবু মুসা সেখানে যাচ্ছেন তখন তিনিও সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মোসাদ ধারণা করেন শাকাকী তার চির শত্রু মুসাকে এককভাবে মাঠ ছেড়ে দেবেন না। শাকাকী লিবিয়া যাচ্ছে বলে সিদ্ধান্ত হলো। একটি গোপন সূত্রে দামেস্ক থেকে জানাল লিবিয়া জাচ্ছেন শাকাকী। জেরুজালেমে ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী তার লোকদের নির্দেশ দিলেন সেখানেই তাকে হত্যা করার। ইউরোপীয় সূত্রগুলো দাবি করেন যে মোসাদের লোকজন অতঃপর শাকাকী বরাবরই লিবিয়া গেছেন মাল্টা হয়ে। মোসাদ প্রধান মাল্টাতেই তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা, লিবিয়ার চেয়ে মাল্টায় এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা সহজ। লিবিয়ার চেয়ে মাল্টা অনেক বেশি নিরিবিলি শহর। মোসাদ এজেন্ট শাকাকীর অপেক্ষায় ভ্যালেট্টা বিমান বন্দরে অবস্থান নেন। কেননা তিনি মাল্টায় কিছুটা সময় কাটাবেন বলে তার ধারণা। শাকাকী তার পিছু নেওয়াদের বোকা বানিয়ে অবশেষে তিনি মাল্টা এসে পৌঁছান।

ব্যাপক ছদ্মবেশ ধারণ করে শাকাকী ট্রানজিট লাউঞ্জে কিছুটা সময় কাটান। এবং কানেক্টিং ফ্লাইটে লিবিয়া যান।

২৬ অক্টোবর খুব সকালে শাকাকী আবার মাল্টায় ফিরে আসেন। এবং বরাবরের মতো ডিপ্লোমেট হোটেলে ওঠেন। তার কক্ষ নং ৩১৬। হোটেলে ওঠেই তিনি বাইরে বেরিয়ে যান। তিনি যেখানেই যান মোসাদের দুজন লোক তাকে নীল রঙের মোটর সাইকেলে করে ফলো করে। তিনি কয়েক ঘণ্টা দোকানে দোকানে কাটান। কেনাকাটা শেষে যখন তিনি হোটেলে ফিরছিলেন। তখন নীল রঙের মোটর সাইকেল তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে থামায়।

পরবর্তী সময়ে মোসাদ এজেন্ট জানায় শাকাকী এগিয়ে এলে তাকে খুব কাছ থেকে ৬টি গুলি ছোড়া হয় শব্দহীন বন্দুক দিয়ে। শাকাকী সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। হত্যাকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অবশ্য হত্যাকারী ছিল একজনই। অন্যজন মোটর সাইকেল চালু রেখে অপেক্ষা করছিলেন। আতাতায়ীরা কাছাকাছি একটি বীচের কাছে যান। এবং লাফ দিয়ে একটি স্পীড বোটে ওঠেন। স্পীড বোটটি গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়। এবং সেখানে অপেক্ষামাণ একটি জাহাজে ওঠে ওই জাহাজটি সরকারিভাবে হাইতা থেকে ইটালীতে সিমেন্ট বহন করছিল।

ঐ জাহাজেই অবস্থান করছিলেন শাবতাই শাবিত নিজে। এই অভিযানের খুঁটিনাটি অতি দূর থেকে মনিটর করছিলেন। পুরো রুটেই ছিল ওয়েল প্লান্ড। ফরে কেউ হত্যা করার পর মোসাদের ওই দুই সদস্যকে অনুসরণ করতে পারেনি। জাহাজে ওঠার পর ওই দুই এজেন্ট নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যান।

শাকাকী মৃত্যুর পর তার সহকর্মী ইসলামিক জিহাদের লোকজন এই রহস্যজনক ঘটনা উদ্‌ঘাটনে চেষ্টা করে। কে এই বিশ্বাসঘাতক যে মোসাদের কাছে শাকাকীর সফরের যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য পাচার করল?

হত্যাকারীরা শাকাকীর যাবতীয় গতিবিধি জানত। কবে তিনি মাল্টায় যাবেন ইত্যাদি। এমনকি তার ফ্লাইট নাম্বার তার ভূয়া পরিচয়পত্র,

CamScanner

দামেস্কে ও মাল্টায় তার ফেরার দিনক্ষণ পর্যন্ত। পাঁচ মাস অনুসন্ধান শেষে ইসলামি জিহাদ এক ফিলিস্তিনি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেন। এবং এই ছাত্র শাকাকীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। তাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দায়ীও করা হয়। ছাত্রটি প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে সবকিছু স্বীকার করে নেয়। উল্ল্যেখ্য বুলগোরিয়া পড়ার সময় মোসাদ উক্ত ছাত্রটিকে তাদের দলে ভেড়ায় এবং নিয়োগ দেয়। এবং মোসাদ গডফাদাররা তাকে দামেস্কে ফিরে যেতে বলে। এবং শাকাকীর দলে যোগদানের নির্দেশ দেয়। পরবর্তী চার বছরে শাকাকীর আস্থা অর্জনে করে এই ছাত্রটি। এবং শাকাকীর কর্মকাণ্ড জানত যে কয়েকজন তাদের একজনে পরিণত হয়।

.....Israel never assumed responsibility for the assassination. Prime Minister Yitzhak Rabin said: "I did not know about the assassination—but if it is true I shall not be sorry."

A short while afterward, Yitzhak Rabin himself was assassinated, not by a Palestinian terrorist but by a Jewish fanatic. ইসরাঈল কখনোই হত্যার কথা স্বীকার করেনি। ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী রবীন বলেছেন আমি শাকাকীর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কিছুই জানি না। তবে যদি হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়েই থাকে এজন্য আমি দুঃখিত নই। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে আইজাক রবীন নিজে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড কোনো ফিলিস্তিনি ঘটায়নি। ঘটিয়েছে এক ধর্মান্ধ ইহুদি।

১২. মোসাদের এজেন্ট হয় মিসর প্রেসিডেন্টের জামাতা!

সত্যিই মিশরের প্রেসিডেন্টের জামাতা মোসাদের এজন্ট হয়েছিল এবং সেটা ভয়ভীতি কিংবা চাপের মুখে নয়। সেই জামাতা নিজেই ইসরাঈল দূতাবাসে ফোন করে নিজে গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তার নাম আশরাফ মারওয়ান। ১৯৬৫সালে মিশরে হেলিওপোশি টেনিস কোর্টে হ্যান্ডসাম এক তরুণের সাথে পরিচয় হয় প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসেরের মেয়ের। মেয়েটির নাম মোনা এবং সে তার পরিবারের তৃতীয় মেয়ে। মোনা অতবেশি সুন্দরী নয়। তার

বোন হুদ অনেক সুন্দরী এবং মিশরের গির্জা হাই স্কুলের এ লেভেলের ছাত্রী। তবে মোনাও চটপটে, বুদ্ধিদীপ্ত এবং তার পিতার প্রিয় সন্তান। এদিকে তরুণটি স্বচ্ছল ও অভিজাত পরিবারের সন্তান। তরুণটি সদ্য গ্রাজুয়েট। বিষয় রসায়ন এবং সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেছে। এখন এই তরুণের জন্য মোনা মরীয়া। এই পরিচয় ও প্রণয়ের সূত্র ধরে মোনা তার পরিবারের সঙ্গে তরুণের পরিচয় করিয়ে দেয়। তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয় মোনার বাবার ।

প্রেসিডেন্ট নাসের মেয়ের পছন্দের ব্যাপারে হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। কিন্তু মোনা কিছুতেই অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। অবশেষে প্রেসিডেন্ট নাসের মোনার প্রেমিকের বাবাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললেন। তরুণের বাবা প্রেসিডেন্টরই গার্ড রেজিমেন্টের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা। দুজনে আলোচনা করে মোনা ও তার প্রেমিকের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করলেন। এক বছর পর ১৯৬৬ সালে জুলাইয়ে তাদের বিয়ে হয়। মোনার তরুণ স্বামীকে রিপাবলিক গার্ডের কেমিক্যাল বিভাগে বদলী করা হয়।

১৯৬৮সালের শেষার্ধে তাকে প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান বিভাগে বদলী করা হয়। প্রেসিডেন্ট নাসেরের এই মেয়ের জামাতার নামই আশরাফ মারওয়ান। এই নামটা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে ঝড় বয়ে গেল। শীর্ষ রাজনীতিকরা পর্যন্ত অনেকেই বলেন, অসম্ভব আশরাফ মারওয়ান কিছুতেই ইসরাঈলের গুপ্তচর হতে পারে না। বিষয়টি ইসরাঈলের সামরিক কর্মকর্তা মাইকেল বার জোহার (MICHAEL BAR-ZOHAR) এবং ইসরাঈলের সরকারি টিভির মহাপরিচালক নিসিম মিশাল (NISSIM MISHAL) রচিত MOSSAD- *THE GREATEST MISSIONS OF THE ISRAELI SECRET SERVICE* গ্রন্থে উঠে এসেছে, "....শ্বশুর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে অমর্যাদাকর আচরণ তাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ... His humiliation by Egypt's president had left him bitter and frustrated. He did not hesitate: he phoned the Israeli embassy and asked to speak to the military attaché. When an officer answered, Marwan

identified himself by his real name, and bluntly said that he wanted to work for Israel. He asked that his offer be forwarded to the people dealing with this kind of activity. The officer who received his call did not take him seriously and did not report the call; Marwan's second call also remained unanswered. But the story reached some Mossad officials. The chief of the Mossad European section, Shmuel Goren, received a phone call from Marwan. Goren knew who Marwan was, was aware of the man's important position, and asked Marwan not to call the embassy anymore; he gave him an unlisted number and immediately alerted some of his colleagues... তিনি ইসরাঈলি দূতাবাসে ফোন করে মিলিটারী এটাচীর সঙ্গে কথা বলতে চান। এক কর্মকর্তা তার ফোন ধরলে আশরাফ মারওয়ান তাকে তার প্রকৃত নামটাই বলেন। ইসরাঈলের পক্ষে তিনি কাজ করতে চান বলেও জানান। ইসরাঈল দূতবাস থেকে তকে জানানো হয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসরাঈলি দূতাবাসের ওই কর্মকর্তা বিষয়টি সিরিয়াসলি নেননি এবং ওই কর্মকর্তা দফতরকে তিনি কিছু জানাননি। আশরাফ মারওয়ান আবার যে একই বিষয়ে ফোন করেন তাও কেউ ধরেনি। বিষয়টি কীভাবে যেন মোসাদের লোকজন জেনে ফেলে। মোসাদের ইউরোপীয় বিভাগের প্রধান শামুয়েল গোরেনের সঙ্গে মারওয়ানের ফোনে কথা হয়। গোরেন জানতেন মারওয়ানকে। গোরেন মারওয়ানকে দূতাবাসে আর ফোন করতে নিষেধ করেন। গোরেন তালিকাহীন একটি নম্বরে আশরাফ মারওয়ানকে ফোন করতে বলেন এবং তার কয়েকজন সহকর্মীকে বিষয়টি জানিয়ে রাখেন।

গোরেনের টপসিক্রেট রিপোর্টটি মোসাদ প্রধান জামির এবং গোয়েন্দা নিয়োগ সংস্থার প্রধান রেহাভিয়া ভার্দির কাছে গিয়ে পৌঁছে। তারা মারওয়ানের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে একটা বিশেষ টিম গঠন করেন। তবে সহজেই অনুমেয় যে শত্রু দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কেউ যখন নিজের থেকে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ পেতে আগ্রহ দেখায় তাকে নিতে

আপত্তি কোথায়। তবে বিষটি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। তা ছাড়া এই পর্যায়ের লোকেরা ডাবল এজেন্টও হয়ে থাকে। দেখা গেল মিসরই প্রলোভন দেখিয়ে তাকে প্ররোচিত করেছে।

আবার এর উল্টো চিত্রও রয়েছে। শত্রু দেশের সংক্ষুব্ধ কেউ এজেন্ট হতে আগ্রহী হতেই পারে। তবে এই পর্যায়ের লোকদের হাতে অনেক গোপন ও স্পর্শকাতর তথ্যাদি থাকে যা অনেকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর সারা বিশ্বের গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের কাছেই এ ধরনের এজেন্ট সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত।

আশরাফ মারওয়ানকে নিয়ে Who killed the 20th century's greatest spy? শিরোনামে ব্রিটেনের দি গার্ডিয়ান পত্রিকা একটি সংবাদধর্মী ফিচার প্রকাশ করে। ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত ফিচারটি লেখেন সাংবাদিক সিমন পারকিন। ফিচারটি বাংলাদেশের জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে। নাসেরের জামাতা ছিলেন ইসরাঈলী স্পাই! শিরোনামে লেখাটি অনুবাদ করেন এনামুল হক। পাঠকের সুবিধার্থে পুরো লেখাটি নিচে তুলে দেওয়া হলো।

"আশরাফ মারওয়ানকে অনেকে বলে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্পাই। মিসরের এই বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী কার পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করতেন সেটা ঠিক স্পষ্ট নয়। কেউ বলে ইসরাঈলের পক্ষে, কেউ বলে মিসরের পক্ষে আবার কেউ বলে উনি ছিলেন ডাবল এজেন্ট। তার আরও একটা পরিচয় আছে। তিনি ছিলেন মিসরের প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়ক জামাল আবদুল নাসেরের জামাতা- তার তৃতীয় ও অতি আদরের মেয়ে মোনা নাসেরকে বিয়ে করেছিলেন। যাই হোক, ২০০৭ সালের ২৭ জুন তিনি লন্ডনে তার পাঁচতলার এ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে পড়ে মারা যান। এই মৃত্যু যে স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না তা নিয়ে সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ পুলিশের ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু কে বা কারা হত্যা করেছিল সে বিষয়টি এখনও রহস্যের অবগুণ্ঠনেই ঢাকা পড়ে আছে। কারণ, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মারওয়ান তার সমস্ত গোপন তথ্যই সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

ডাক্তারী পরীক্ষায় বলা হয়, মারওয়ান এয়োর্টা বা মহাধমনী ফেঁটে যাওয়ায় মারা যান। কিন্তু তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো ধোঁয়াশাময়। প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না এমন নয়, কাছাকাছি একটি ভবনের চারতলায় মারওয়ানেরই একটি কোম্পানির ৪ জন লোক বৈঠকে বসেছিল এবং সেখানে মারওয়ানের যাবার কথা ছিল। তারা তাদের বসের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওখান থেকে মারওয়ানের ২৪ কার্লটন হাউস টেরেসে মারওয়ানের এ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি পরিষ্কার দেখা যেত। চারজনের একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে : 'দেখ দেখ ড. মারওয়ান কী করছেন!' বাকি তিনজনের দুজন দ্রুত জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পায় মারওয়ান ব্যালকনি থেকে লাফ দিচ্ছেন। অপরজন জানালার কাছে ছুটে গিয়ে দেখে মারওয়ান পড়ে যাচ্ছেন।

মারওয়ান কি নিজে থেকে লাফ দিয়েছিলেন নাকি কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল? ময়নাতদন্তে তার রক্তে বিষণ্নতার ওষুধের নমুনা পাওয়া গিয়েছিল। তিনি যে ডাক্তারকে দেখাতেন তিনি জানিয়েছেন 'ইদানীং তিনি যথেষ্ট মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন এবং দুমাসে ১০ কেজি ওজন হারিয়েছিলেন। তবে আত্মহত্যা তিনি যে করেননি মনে করার কারণ আছে। তিনি কোনো চিরকুট রেখে যাননি। ওই দিন সন্ধ্যায় তার আমেরিকা রওনা হওয়ার কথা ছিল। কদিন আগে তিনি তার এক নাতির জন্মদিনে প্লেস্টেশন ৩ (ভিডিও গেম সরঞ্জাম) কিনে দিয়েছিলেন। পাঁচ নাতি-নাতনিকে নিয়ে মারওয়ান দম্পতির অবকাশে যাওয়ার কথা ছিল। মারওয়ানের অনেক পরিকল্পনা ছিল। তার বেঁচে থাকার কারণ ও যুক্তি ছিল। তার মানসিক বা মনস্তত্ত্বগত সমস্যার কোনো প্রমাণ মেলেনি। তার আত্মহত্যা করার ইচ্ছা হয়েছিল এমন প্রমাণও পাওয়া যায়নি। তবে হতবুদ্ধিকর ব্যাপার হলো মারওয়ানকে হত্যা করা হয়েছিল এমন বক্তব্যের সমর্থনেও কোনো প্রমাণ নেই।

অবশ্য আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়তো মারওয়ানের ছিল না। তবে তার মৃত্যুভীতি যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শেষের দিকে স্ত্রীকে একবার তিনি বলেছিলেন তাকে মেরে ফেলা হতে পারে। কারা মারতে

পারে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু না জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমার নানা ধরনের শত্রু আছে।' মৃত্যুর পূর্ববর্তী কয়েক মাস প্রতিরাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে তিনি দরজা ঠিকমতো লক করা হয়েছে কিনা পরখ করে দেখতেন। স্ত্রী মোনার ভাষ্য অনুযায়ী ওটা ছিল তার নতুন অভ্যাস যা পূর্ববর্তী ৩৮ বছরের দাম্পত্য জীবনে কখনও দেখা যায়নি।

তাকে সম্ভবত হত্যাই করা হয়েছিল এমন আরেকটি সূত্র পাওয়া গিয়েছিল। তিনি তার স্মৃতিকথা রচনা করছিলেন। প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। একটাইমাত্র জানা কপি ছিল। অবাক ব্যাপার, যেদিন তিনি মারা যান ওইদিন তার বুকশেলফ থেকে কপিটা উধাও হয়ে যায়। তিন খণ্ডের এই স্মৃতিকথাটির প্রতিটি খণ্ড ছিল ২০০ পৃষ্ঠার। মারওয়ান তার স্মৃতিকথা ডিকটেট করতেন এবং তা টেপে বাণীবদ্ধ থাকত। সেই টেপও উদ্ধার করা যায়নি। এক বিশেষজ্ঞের মতে, মারওয়ান দীর্ঘদিন মিসরীয়, ইসরাঈলী, ইতালীয়, আমেরিকান ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে কাজ করেছিলেন। স্মৃতিকথার মাধ্যমে তিনি কি এমন সব গোপন তথ্য ফাঁস করার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন যা রাজা বাদশা ও রাষ্ট্রনায়কদের বিব্রত করে তুলতে পারে? স্মৃতিকথার ওই কপিটির সত্যিই যদি অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে কে নিয়েছিল ওটা? ওই স্মৃতিকথার সঙ্গে তার মৃত্যুর কি কোনো যোগসূত্র আছে? মনে রাখতে হবে একই রকম পরিস্থিতিতে লন্ডনে তার মতো আরও দুজন মিসরীয়র মৃত্যু হয়েছিল। ২০০১ সালের জুন মাসে অভিনেত্রী সোয়াদ হোসনি তার স্মৃতিকথা রচনার জন্য জনৈক প্রকাশককে অনুরোধ জানানোর পর স্টুয়ার্ট টাওয়ারের ব্যালকনি থেকে পড়ে মারা যান। ১৯৭৩ সালের আগস্টে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের সাবেক প্রধান এল-লেইখি নাসিক একই টাওয়ারের ব্যালকনি থেকে পড়ে মারা যান। তিনিও স্মৃতিকথা লিখছিলেন। মারওয়ানসহ এই তিনজনের প্রত্যেকেরই মিসরীয় নিরাপত্তা সার্ভিসগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র ছিল।

মারওয়ানের মৃত্যুরহস্য নিয়ে অনেক তদন্ত হয়েছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এলিট স্কোয়াড স্পেশালিস্ট ক্রাইম ডাইরেক্টরেটসহ দুটি আলাদা আলাদা

স্কোয়াড তিন বছর ধরে অনেক তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। তারপরও অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। কাহিনিটা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই রহস্যময়। পরিস্থিতিটাও ছিল তেমনই– লাঞ্চের সময় লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে ব্যালকনি থেকে পড়ে যাওয়া, প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতি, অকুস্থলে নানা সূত্রের অস্তিত্ব। তারপরও মারওয়ান কাহিনির কোনো উপসংহার টানা যায়নি। অসংখ্য প্রশ্ন অনুত্তরই রয়ে গেছে। যেমন ধরুন–মারওয়ান যখন ব্যালকনি থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সে মুহূর্তে এহরন ব্রেগম্যান লন্ডনের কিংস কলেজের ওমার স্টাডিজ বিভাগে নিজ কার্যালয়ে বসা ছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন একটা ফোন কলের যে কলটি কখনই আসেনি। যার কাছ থেকে কলটি আসার কথা ছিল তিনি একজন স্পাই। কয়েক ঘণ্টা পর ব্রেগম্যান উইম্বলডনে ফিরে গিয়ে তার ফ্যামিলিকে নিয়ে নানদোস রেস্তরাঁয় লাঞ্চ করতে যান।

রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার সময় মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। ইসরাঈল থেকে করেছেন তার বোন। জানালেন, মারওয়ান মারা গেছে। খবরটা শুনে বিচলিত বোধ করলেন ব্রেগম্যান। তবে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না ব্যাপারটা। আগের কয়েকটা দিন মারওয়ানের কাছ থেকে আনসার ফোন বার্তা পেয়েছিলেন যার মধ্যে ভীতির সুর ছিল। ব্রেগম্যান জানতেন তার এই বন্ধু নিজের জীবন বিপন্ন বলে আশঙ্কা করতেন। ব্রেগম্যান আরও জানতেন তার এই আশঙ্কার জন্য তিনি নিজেও আংশিক দায়ী।

মারওয়ানের সঙ্গে ব্রেগম্যানের সম্পর্কটা বেশ জটিল। আগে মাত্র একবারই তাদের সশরীরে দেখা হয়েছিল চার বছর আগে লন্ডনের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। ব্রেগম্যান বেশ সতর্কতা অবলম্বন করে সেখানে গিয়েছিলেন। অলি-গলি দিয়ে পৌঁছেছিলেন যাতে তাকে কেউ অনুসরণ না করতে পারে। এই সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে দুজনের জীবন পরস্পরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছিল। মারওয়ানের জীবনে ব্রেগম্যানের আগমনের আগেই মারওয়ানের একটা পরিচিতি ছিল ধনী

ব্যবসায়ী ও চেলসি ক্লাবের দুর্দান্ত সমর্থক হিসেবে। চেলসি ক্লাবের সাড়ে তিন শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে তার একটি কোম্পানি চেলসি ও ফুলহাম ফুটবল ময়দান কিনে নিয়েছিল। ব্রেগম্যান আসার পর সবকিছু বদলে গেল।

আশরাফ মারওয়ানের জন্ম মিসরে ১৯৪৪ সালে। বাবা ছিলেন প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড ব্রিগেডে কর্মরত সেনা অফিসার। ২১ বছর বয়সে মারওয়ান কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্টক্লাস অনার্স ডিগ্রী নিয়ে কেমিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন। এরপর সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন যা তখন ছিল বাধ্যতামূলক। ১৯৬৫ সালে কায়রোর এক শহরতলীতে টেনিস খেলার সময় সপ্তদশী আকর্ষণীয় এক তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ইনি প্রেসিডেন্ট নাসেরের তৃতীয় ও আদরের কন্যা। দুজনের মধ্যে প্রেম গড়ে ওঠে। পরের বছর তারা বিয়ে করেন এবং এর মধ্য দিয়ে মারওয়ান এলিট মহলে প্রবেশ করেন। আরও দুবছর তার সামরিক বাহিনীতে কাটে। এর পর তিনি রসায়নে মাস্টার্স করতে লন্ডনে চলে যান।

সেখানে থাকতে শোনা যায় মারওয়ানকে যে পারিবারিক ভাতা দেওয়া হতো তাতে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। বলাবাহুল্য, আর্থিক দিক দিয়ে তিনি বরাবরই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হন যা ৪০ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মারওয়ানের সম্পত্তির ছত্রছায়া কোম্পানির নাম ছিল কাবরা ইনভেস্টমেন্ট। কাবরার আরবি অর্থ আরও বড় হও। শোনা যায়, বাড়তি আয় যোগাড় করতে গিয়ে তিনি এক কুয়েতি শেখের স্ত্রীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে পড়েন। এই মহিলা তাকে বাড়তি অর্থ যোগাতেন। কয়েক মাস পর ব্যাপারটা লন্ডনের মিসরীয় দূতাবাসের মাধ্যমে নাসেরের কানে যায়। তিনি জামাতাকে কায়রোয় তলব করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে মারওয়ানের কাছে তার কন্যার ডিভোর্স চান। কিন্তু মারওয়ান ও মোনা দুজনেই বেঁকে বসেন। পরে নাসেরের রাগ ঠান্ডা হয়। তবে তিনি হুকুম জারি করেন যে মারওয়ানকে কায়রোয় থাকতে হবে। শুধু কোর্স পেপার সাবমিট করার ও পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি লন্ডনে যাবেন।

১৯৬৯ সালের বসন্তে একবার মারওয়ান লন্ডনে গিয়েছিলেন। লোক দেখানো অজুহাত দেখিয়েছিলেন যে, পেটের পীড়ার জন্য হার্লি স্ট্রীটের এক ডাক্তারকে দেখাতে চান। লন্ডনে এসে তিনি ইসরাঈলী গোয়েন্দা সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই যোগাযোগ কীভাবে ঘটেছিল সে ব্যাপারে দু-তিন ধরনের নাটকীয় বিবরণ আছে যার একটির সঙ্গে আরেকটির মিল নেই। ইতিহাসবিদ হাওয়ার্ড ব্লাম তার ২০০৩ সালের বই 'দি ইভ অব ডেসট্রাকশন' এ উল্লেখ করেছেন, মারওয়ান তার সেই ডাক্তারকে এক্সরে রিপোর্ট দেখাতে গিয়ে একটা মোটা ফাইলও ধরিয়ে দেন যেখানে মিসর সরকারের রাষ্ট্রীয় নথিপত্র ছিল। তিনি ডাক্তারকে ফাইলটি লন্ডনে ইসরাঈলী দূতাবাসে পৌঁছে দিতে বলেন। তিনদিন পর মারওয়ান হ্যাবডস ডিপার্টমেন্ট স্টোরে হেঁটে যাওয়ার সময় মোসাদের এক এজেন্ট তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

কিন্তু মোসাদের সিনিয়র এজেন্টরা বলেছেন, ব্যাপারটা তা নয়। এরা সাবেক ইসরাঈলী গোয়েন্দা বিশ্লেষক ইউরি বার-জোসেফের কাছে যে বিবরণ দিয়েছেন এবং যা কিনা তার ২০১০ সালের বই 'হামালাচ'-এ সন্নিবেশিত আছে; সেটাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। সেই বর্ণনাটা এ রকম : মারওয়ান ইসরাঈলী দূতাবাসে গিয়ে সিকিউরিটি টিমের একজন সদস্যের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাকে অন্তত পক্ষে দুই দুইবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শেষে তাকে একটা মেসেজ রেখে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। মারওয়ান নিজের নাম-পরিচয় দেন এবং জানান, তিনি ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে কাজ করতে চান। তিনি যোগাযোগের জন্য কোনো ফোন নম্বর রেখে যাননি। তবে জানান যে, ওই দিনই বিকেলে আবার ফোন করবেন। বিকেলে ফোনও করেছিলেন তিনি তবে কোনো সাড়া পাননি। এবার মারওয়ান তার হোটেলের ফোন নম্বর দেন।

মোসাদের ইউরোপীয় প্রধান স্যামুয়েল গোরেন সে সময় লন্ডনে ছিলেন। গোরেন মারওয়ানের মেসেজটা দেখেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তাকে চিনে ফেলেন। মোসাদ সম্ভাব্য রিক্রুট হিসেবে ইতোমধ্যে তার ওপর একটা ফাইল খুলে বসেছিল। গোরেন মারওয়ানের দেওয়া নম্বরে ফোন করে

তাকে তার হোটেল রুমে থাকতে বলেন। পরে আবার ফোন বেজে ওঠে। এবার তাকে হোটেলের কাছাকাছি একটা ক্যাফেতে যেতে বলা হয়। মারওয়ান সেই কাফেতে প্রবেশ করেন। কাফের ভেতরে একটা টেবিলে জনৈক ব্যক্তি বসে পেপার পড়ছিলেন। তার কফির পেয়ালার পাশে মারওয়ানের ছবি রাখা ছিল; যে ছবিটা ৪ বছর আগে তার বিয়ের দিনে তোলা। মারওয়ান কাফেতে প্রবেশ করতেই লোকটি তার চেহারার সঙ্গে ওই ছবিটি মিলিয়ে দেখেন এবং প্রবেশপথের বাইরে দাঁড়ানো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মাথা নেড়ে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত দেন।

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্যাফেতে প্রবেশ করে সোজা মারওয়ানের কাছে গিয়ে বলেন, 'মি. মারওয়ান! আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমার নাম মিশা।' মারওয়ান উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলেন। যে লোকটা পেপার পড়ছিল তিনি গোরান। উনি উঠে চলে গেলেন। কেউ তা লক্ষ করল না। আর মিশার আসল নামের প্রথম অংশ দুবি। দুজনের আলাপচারিতার মধ্যে মারওয়ান মিসরের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে ইসরাঈলীদের কি ধরনের তথ্য দিতে পারেন মিশাকে তা জানালেন। মারওয়ান একটা খাম টেবিলের ও প্রান্তে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আমি আপনাদের কি দিতে পারি এটা তার একটা স্যাম্পল। এবার আমি কিছু চাচ্ছি না তবে আশা করব আমাদের পরের বারের সাক্ষাতে তা পুষিয়ে দেওয়া হবে।' তার ফি কত? ১ লাখ ডলার।

মারওয়ানের উদ্দেশ্য নিয়ে মোসাদের সন্দেহ ছিল। উনি কি ডবল এজেন্টের ভূমিকা নিয়ে ইসরাঈলকে অসত্য তথ্য পরিবেশন করতে চাইছেন নাকি গোপন তথ্য তার শ্বশুরের কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন; এর উত্তর দিয়েছেন মারওয়ান নিজে। মিশাকে তিনি বলেছেন, ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধে মিসরের পরাজয়ে তিনি আতঙ্কিত বোধ করছেন। তিনি সোজা বিজয়ীর পক্ষে থাকতে চান। এই বৈঠকের পর গোরানের সঙ্গে মিশা ফের মিলিত হন একটা ট্যাক্সিতে। দুজনে ওই ট্যাক্সি করে ইসরাঈলী দূতাবাসে যাবার পথে মারওয়ানের দেওয়া নথি পড়ে দেখেন। নথিগুলো নির্ভেজাল বলেই মনে হয়। গোরান সেদিন

বলেছিলেন 'এ ধরনের সূত্র থেকে এমন কিছু পাওয়া হাজার বছরের মধ্যে একবারই ঘটে।' আরেক মোসাদ এজেন্ট ইতিহাসবিদ হাওয়ার্ড ব্লাম বলেন, 'ব্যাপারটা এমন যেন আমরা নাসেরের শয্যাসঙ্গিনী কাউকে পেয়ে গেছি।' মোসাদের অভ্যন্তরে মারওয়ানের ডাকনাম ছিল 'এঞ্জেল'। তাকে যে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হতো এটাই তার প্রমাণ।

ওদিকে মিসরে মারওয়ান আগের মতোই আস্থা ভোগ করতে থাকেন। ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট নাসেরের মৃত্যুর পর ধারণা করা হয় যে তিনি ইসরাঈলী গোপন নথিপত্র নাসেরের উত্তরসূরি আনোয়ার সাদাতের হাতে দিতেন। এতে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বেড়ে যায়। মারওয়ান সম্পর্কে মোসাদের তখনও যদি কোনো সন্দেহ-সংশয় থেকে ছিল সেটা জোরালো হয়ে ওঠে ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে। এ সময় তিনি মিসরের আসন্ন হামলা সম্পর্কে একটা হুঁশিয়ারি বার্তা ইসরাঈলীদের কাছে পাঠান। ইসরাঈল হাজার হাজার রিজার্ভিস্ট এবং বেশ কয়েক ব্রিগেড সৈন্য সিনাইয়ে মোতায়েন করে। কিন্তু কোনো হামলা হয়নি। অথচ এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে ইসরাঈলের সাড়ে তিন কোটি ডলার ব্যয় হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালের ৪ অক্টোবর মারওয়ান মিসরের আসন্ন হামলা সম্পর্কে ইসরাঈলকে আবারও হুঁশিয়ারি দেন।

মারওয়ান সে সময় এক মিসরীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্যারিসে ছিলেন। ওখানে তিনি ইসরাঈলী এজেন্টকে ফোনে বলেন যে, তিনি বেশকিছু কেমিক্যালের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান। আসন্ন হামলা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দেওয়ার জন্য যে সাংকেতিক শব্দ দুই পক্ষ মিলে ঠিক করেছিল তা হলো 'বেশ কিছু কেমিক্যাল'। পরদিন সকাল ৮টায় ইসরাঈলী মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক হয়। সেখানে মারওয়ানের তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ইসরাঈল ট্যাঙ্ক মোতায়েন করতে শুরু করে। এবার মারওয়ানের তথ্যটা ঠিক ছিল। শুধু চার ঘণ্টার হেরফের হয়েছিল। মারওয়ান জানিয়েছিলেন মিসরীয়রা সূর্যাস্তের সময় আঘাত হানবে। কিন্তু ওদের হামলা শুরু হয় ৪ ঘণ্টা আগে বেলা ২টায়।

প্রশ্ন হলো মারওয়ান কেন ইসরাঈলের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত সেই উত্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে তার প্রকৃত আনুগত্য এবং তার ঘাতকদের পরিচয়। নগদ অর্থের সংকট এবং শ্বশুরের ওপর রাগ থেকেই কি তিনি ধনী হওয়ার জন্য ইসরাঈলের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, নাকি একজন নিখাদ দেশপ্রেমিক হিসেবে ডাবল এজেন্টের ভূমিকা নিয়ে তিনি ইসরাঈলকে এমন সব তথ্য পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন যাতে দেশটার সর্বনাশ হয়?

মারওয়ান যে ইসরাঈলের সঙ্গে কাজ করতেন তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। ২০০০-এর দশকের প্রথমদিকে স্ত্রী মোনা নাসের এ নিয়ে স্বামীর মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রথমে মারওয়ান ইসরাঈলীদের কাছে তথ্য পাচারের কথাটা অস্বীকার করে বসেন। পরে অবশ্য স্বীকার করেন। তবে বলেন, সেগুলো ছিল ভুল তথ্য। আসল সত্যি কোনটা ব্রেগম্যান বিশ্বাস করেন এই উত্তর তার জানা আছে। তবে আরেক প্রশ্ন তাকে পীড়িত করে তোলে : মারওয়ানের মৃত্যুর জন্য কি তিনি দায়ী?

এখানে প্রশ্ন আসে, কে এই ব্রেগম্যান? মারওয়ানের সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল তার?

এহরন ব্রেগম্যান একজন ব্রিটিশ-ইসরাঈলী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, লেখক ও সাংবাদিক। আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের ওপর বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অধিকারী। এর ওপর দশটিরও বেশি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে সর্বদা একটা তথ্যানুসন্ধানী মন কাজ করে চলে। মোসাদের বিখ্যাত 'এঞ্জেল' নামক এজেন্টটি যে আসলে মারওয়ান তা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিনি বের করেছিলেন এবং ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের ওপর লেখা তার একটি বইতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

'এঞ্জেলের' পরিচয় বের করার জন্য প্রথমে তিনি ইয়ম কিপ্পুর যুদ্ধের ওপর যত বই বা লেখালেখি বেরিয়েছিল সব ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেন। গোড়াতে তার মারওয়ানের ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়ে। এ নিয়ে যত বেশি ঘেঁটে দেখেছেন ততই তার সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। মারওয়ান তার সেই

পরম আকাঙ্ক্ষিত জন হয়ে দাঁড়ান যার পরিচয় সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার নিজের কাছে নিস্তার নেই।

সন্দেহটা যখন বদ্ধমূল হলো তখন থেকে ব্রেগম্যান এ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখালিখি শুরু করলেন। কিন্তু মারওয়ানের নাম সরাসরি কোথাও উল্লেখ না করে আভাসে-ইঙ্গিতে বললেন ১৯৯৯ সাল থেকে ব্রেগম্যান মারওয়ানকে তার লেখা নিবন্ধগুলো পাঠাতে শুরু করেন এই আশায় যে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আসবে। কিন্তু কিছুই আসেনি। শেষে ব্রেগম্যান এক কৌশল বের করেন। ইসরাঈলে গিয়ে সেখানকার সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল এলি জেইরার সঙ্গে দেখা করার আয়োজন করেন। কেন? জেনারেলের একটা স্মৃতিকথা বেরিয়েছিল যেখানে 'এঞ্জেলের' প্রসঙ্গ অসংখ্যবার উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে এঞ্জেলের (মারওয়ান) দেওয়া ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই জেনারেল চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। ব্রেগম্যানের ধারণা ছিল, জেইরা যদি কিছুতেই মারওয়ানের নাম কনফার্ম না করেন তা হলে তিনি তার স্মৃতিকথার সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজটা যিনি করেছিলেন তার দ্বারস্থ হবেন। তিনি হয়তো কনফার্ম করবেন।

২০০০ সালে ব্রেগম্যান সেই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করেন। তেল আবিবের এক কাফেতে দুজনে বসেন। অন্তরঙ্গ আলাপ হয়। এক পর্যায়ে ব্রেগম্যান সরাসরিই জিজ্ঞাস করে বসেন 'মারওয়ান কি স্পাই?' সম্পাদক অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে মৃদু হাসলেন। ব্রেগম্যান বলেন, 'আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম। মারওয়ানই এঞ্জেল।'

লন্ডনে ফিরে বই লেখার কাজে মনোনিবেশ করলেন ব্রেগম্যান। এ বিষয়ের ওপর তার প্রথম বই 'ইসরাঈলস্ ওয়ারস্' ২০০০ সালের শেষদিকে ছাপা হয়; যেখানে তিনি মারওয়ানের নামটা উহ্য রেখে 'এঞ্জেল'কে নাসেরের ডানহাত বলে উল্লেখ করেন। ব্রেগম্যান বইয়ের একটা কপি মারওয়ানকে পাঠিয়ে দেন। মারওয়ান কোনো জবাব দেননি। ২০০২ সালে ব্রেগম্যানের দ্বিতীয় বই বের হয় 'হিস্ট্রি অব ইসরাঈল'।

সেখানে তিনি লেখেন 'এঞ্জেল ছিলেন নাসেরের এক আত্মীয়। অনেক সময় তাকে 'জামাই' এই সাংকেতিক নাম উল্লেখ করা হতো।' তার এই শেষের কথাটা ছিল নির্জলা মিথ্যা যা তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে লিখেছিলেন মারওয়ানকে উস্কানি দেওয়ার জন্য। বইয়ের একটি কপিও তিনি মারওয়ানকে পাঠিয়ে দেন। উপহার হিসেবে লেখেন 'টু মারওয়ান, হিরো অব ইজিপ্ট।' এবারও মারওয়ান কোনো সাড়া দেননি। কিন্তু সাংবাদিকরা তার ওই বই থেকে যা পাবার পেয়ে গিয়েছিল। মিসরে এক সাংবাদিক মারওয়ানের এক সাক্ষাৎকার নিয়ে তাকে সরাসরি বইয়ের এসব বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মারওয়ানের জবাব ছিল : 'বইটা একটা অর্থহীন ডিটেকটিভ কাহিনি।'

ব্রেগম্যান তার এই মন্তব্য থেকে আরও নিশ্চিত হলেন যে এঞ্জেল আর মারওয়ান একই ব্যক্তি। কারণ, মিথ্যা হলে মারওয়ান মানহানির মামলা দায়েরের হুমকি দিতে পারতেন। তা না করে ওটাকে তিনি কল্পকাহিনি বলে উড়িয়ে দিলেন। ব্রেগম্যানের জেদ চেপে গেল। পরের সপ্তাহে মিসরের সাপ্তাহিক আল আহরাম আল-আরাবিক-এর কাছে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ইতিহাসবিদ হিসেবে নিজের সুনাম রক্ষা করার জন্য আমাকে বলতেই হচ্ছে মারওয়ান একজন গুপ্তচর।' এভাবেই মারওয়ানের নামটা প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্টভাবে গুপ্তচর হিসেবে উঠে আসে।

সাক্ষাৎকারটি ছাপা হওয়ার এক সপ্তাহ পর ব্রেগম্যান এক ফোনকল পান। আরবি একসেপ্টে মোটা গলায় অপরপ্রান্ত থেকে একজন বলে ওঠে : 'আমিই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আপনি বইয়ে লিখেছেন'। ব্রেগম্যান বলেন 'প্রমাণ কী?' উত্তর আসে 'আপনি আমাকে বই পাঠিয়েছেন... লিখেছেন...' তখন থেকেই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার শুরু। অসংখ্যবার ফোনে কথা হয়েছে, দেখা হয়েছে কেবল একবারই, ২০০৩ সালের অক্টোবর। মারওয়ান তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে তার সমস্ত কল মিসরীয় ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সার্ভিস রেকর্ড করে থাকে। ব্রেগম্যান উল্লেখ করেছেন যে, ২০০৭ সালে তাদের সম্পর্ক আরও বেশি নাটকীয় রূপ নেয়। মারওয়ানের আনসার ফোন বার্তাগুলোতে আতঙ্কের ছাপ থাকত।

মারওয়ানই যে এঞ্জেল তা উন্মোচন করে ব্রেগম্যান তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন সত্য। কিন্তু ওটা ছিল একজন ইতিহাসবিদের উক্তি। এমন বক্তব্য কোনো সরকারের উচ্চতর পর্যায় থেকে কখনও আসেনি। তবে মারওয়ান ইসরাঈলের একটি আদালতে এক হাই প্রোফাইল মামলার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। মামলাটি ছিল দুই সিনিয়র ইসরাঈলী অফিসারের- জেনারেল জেইরা এবং মোসাদের সাবেক প্রধান জামিরের মধ্যকার বিরোধ থেকে যার উৎপত্তি। জামির অভিযোগ করেছিলেন, জেইরা মারওয়ানের পরিচয় সাংবাদিকদের কাছে ফাঁস করেছিলেন। জেইরা জামিরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। মামলা বেশ কিছুদিন ধরে চলার পর ২০০৭ সালের ২৫ মার্চ বিচারক রায় দেন যে জাইরাই দোষী। কারণ, তিনি এঞ্জেলের পরিচয় অনুমোদিত ব্যক্তিদের কাছে ফাঁস করেছিলেন। তিন মাস পর রায়টা প্রকাশ করা হয়। সেখানে বিচারক প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে এঞ্জেল হিসেবে মারওয়ানের নাম উল্লেখ করেন। ব্রেগম্যান রায়ের রিপোর্ট দেখার সঙ্গে সঙ্গে মারওয়ানকে চিঠি লিখে জানান যে, তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। ১৪ জুন এই রায় বেরোনোর ১৩ দিনের মধ্যে মারওয়ান মারা যান।

১৩. মোসাদের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল একজন মুসলিম শাসক!

একজন মুসলিম শাসক মুসলমানদের সবচে বড় দুশমন ইহুদিবাদী ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল বলে গঙঝঝঅউ- ঞওঐউ এজউঅঞঔউঝঅঞ গওঝঝাওঙঘঝ ঙখ ঞওঐউ ওঝজঅঊখও ঝউঈজউঞ ঝউজঠওঈউ গ্রন্থে দাবি করা হয়। গ্রন্থটির রচয়িতাদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে।

"১৯৬৩ সালের এপ্রিলে মোসাদ প্রধান হন মেইর অমিত। অমিত তার পূর্বসূরি আইসারের মতো ছিলেন না। ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত ধাচের। আইসার ছিলেন প্রচারবিমুখ, রহস্যপ্রিয়। অন্যদিকে অমিত সেনাবাহিনী থেকে আসা মারমার কাটকাট স্বভাবের। যেহেতু সবকিছু সবাই জানে

সেহেতু আর গোপন করে আর লাভ কি-ধরনের। আইসার অবসর নিলেও ইসরাঈল প্রধানমন্ত্রী তাকে গোয়েন্দা বিষয়ক দপ্তরে উপদেষ্টা হিসেবে রেখে দেন। রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি ভেঙে অমিত মুসলিম রাষ্ট্র মরক্কোকে সহযোগিতা করতে যাচ্ছেন শুনে আইসার রাগে ফেটে পড়েন।

আইসারের আমলেই মরক্কোর সাথে মোসাদের গোপন সম্পর্ক তৈরি হয়। আয়াকোভ কারুজ ও রাফি আইটান নামের দুজন মোসাদ প্রতিনিধি প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন। অমিতের নেতৃত্বাধীন মোসাদ মরক্কোর রাজ পরিবারের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা পুরোদমে শুরু করে। ১৯৬৩ সালের শীতকালে মোসাদ গোয়েন্দাদের কাছে একটি গোপন সংবাদ আসে। সেটি হলো, মরক্কোর বাদশাহ হাসান দ্বিতীয় মনে করে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন। হত্যা ষড়যন্ত্রের নেপথ্য কারণ হলো বাদশাহ হাসান পাশ্চাত্য ঘেঁষা হয়ে উঠছেন। এখন বাদশাহ হাসান চাইছেন তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব মোসাদ নিক।

রাফি এইটান ও ডেভিড সমোরন নামের আরেক গোয়েন্দা গোপনে মরক্কোর রাজধানী রাবাত সফর করেন। তারা ভূয়া পাসপোর্টে সেখানে যান। একটা গোপন দরজা দিয়ে তাদের বাদশাহর প্রাসাদে ঢোকানো হয়। সেখানে তারা মরক্কোর ভয়ানক জেনারেল ওইউফকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওইউফকী মরক্কোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও যাবতয়ি নিষ্ঠুরতার জন্য সুপরিচিত। বাদশাহর বিরুদ্ধে কেউ গেলে ওইউফকী তাকে আর বাঁচিয়ে রাখেন না। গোয়েন্দা বিষয়ক পরামর্শের জন্য বাদশাহ হাসান এই জেনারেলের পরামর্শকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। মোসাদের এইটানের সঙ্গে বৈঠকের সময় জেনারেল ওইউফকী তার সঙ্গে কর্নেল ডলিমিকে নিয়ে এসেছিলেন।

এইটান ও ওইউফকী একটা চুক্তিতে উপনীত হন। চুক্তিটা হলো মোসাদ ও মরক্কোর গোয়েন্দা বিভাগ সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করবে এবং পরস্পর পরস্পরের দেশে স্থায়ী অফিস খুলবে। মোসাদ মরক্কোর গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণ দেবে। মরক্কো বিশ্বব্যাপী মোসাদ সদস্যদের

সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। বিভিন্ন তথ্য লেনদেনের সুবিধার্থে দুই দেশ সম্মিলিতভাবে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করবে। চুক্তিতে আরো বলা হয়, মরক্কোর বাদশাহ নিরাপত্তায় নিয়োজিতদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেবে মোসাদ। বাদশাহ হাসানের উপস্থিতিতে এই চুক্তির সীলমোহর করা হয়। 'এইটান' চুক্তি শেষে বাদশাহকে কুর্নিশ ও হাতে চুম্বন করে। কারণ, আরব বিশ্বে এই প্রথম কোনো স্বীকৃত বন্ধু পায় মোসাদ।

এই চুক্তির দু-সপ্তাহের মধ্যে ওইউফকী ইসরাঈলে যান। যাওয়া আসার পরিমাণ বাড়ে। সম্পর্ক গভীর হয়। এক পর্যায়ে ওইউফকী মোসাদ প্রধানের সাহায্য চান একজনকে ধরতে। সে হলো মরক্কোর বিরুধীদল নেতা মেহেদি বেন বারকা। বারকাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েও যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না মরক্কো। পলাতক বারকাকে জীবিত কিম্বা মৃত ধরিয়ে দিতে মোসাদের সাহায্য চায় মরক্কো। পরে মোসাদ বারকাকে খুঁজে পায়। ধোঁকা দিয়ে ফ্রান্সের প্যারিসে নিয়ে আসে। প্যারিসের লেফট ব্যাংক রেস্তোরায় ঢুকতেই ফ্রান্সের দুই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ দুজন মোসাদেরই হয়ে কাজ করেছিল। পরে তাকে ওইউফকীর হাতে হস্তান্তর করা হয়। গুম হয়ে যান বেন বারকা। কেউ একজন বলেছিল যে সে বেন বারকার বুকে ছুড়ি মারতে দেখেছে ওইউফকীকে। পরে এটা নিয়ে রাজনৈতিক হত্যায় ফ্রান্স জড়িত থাকার গুঞ্জন উঠেছিল। প্রেসিডেন্ট নিজেও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

১৪. কুর্দিদের উসকে দিতে মোসাদের চক্রান্ত!

ইরাক-ইরান-তুরস্কের সীমানায় কুর্দি নামক একটি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। তারা মুসলিম। সংখ্যায় যথেষ্ঠ। কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো রাষ্ট্র নেই। নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি তাদের দীর্ঘ দিনের। এ লক্ষ্যে তাদের মাঝে গড়ে ওঠে একাধিক সংগঠন। একেক সংগঠনের একেক রকম চাওয়া। একেক দিকে তাদের নজর। একেক দেশের সাহায্য তারা কামনা করে। বিভক্তির এই সুযোগ নিতে তৎপর হয় মোসাদ। কূটচাল চালে মোসাদ প্রধান মেইর অমিত।

১৯৬৫ সালের দিকে অমিত তার আত্মজীবনীতে লিখে "...আমাদের স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। উত্তর ইরাকের বিদ্রোহী নেতা মোল্লা মোস্তফা বারজানীর তাঁবুতে ইসরাঈলী সরকারি প্রতিনিধি ঢুকতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কুর্দিস্তানে অবস্থানকে বিশাল সাফল্য হিসেবে দেখা হলো। ইরাকের প্রধান ফ্যাক্টর হলো এই কুর্দিরা। এই একগুঁয়ে সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই প্রথমবারের মতো ইসরাঈলের একটা যোগসূত্র সৃষ্টি হলো। কুর্দিরা ইরাকী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কুর্দিরা ছাড়া ইরাকের আর দুটি ফ্যাক্টর হলো শিয়া ও সুন্নীরা। বারজানীর নেতৃত্বাধীন কুর্দিরা ইরাকের অভ্যন্তরে ব্যাপক এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। মোসাদ যদি কুর্দী বিদ্রোহীদের মদদ দিয়ে আরো শক্তিশালী করতে সমর্থ হয় তবে অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ইরাককে আরো ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে। ফলে ইরাকের শক্তি ক্ষয় হবে এবং ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা হ্রাস পাবে। কুর্দিদের সঙ্গে এই আতাত ইসরাঈলের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।"

প্রথমে তিনজন মোসাদ সদস্য কুর্দিস্থানে তিন মাস অবস্থান করে। বারজানী তাদেরকে ইনার সার্কেলের অংশ করে নেন। বারজানী যেখানেই যেতেন তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ফলে কুর্দিদের সব গোপন তথ্যাদি মোসাদের জানা হয়ে যায়। মোসাদ ও কুর্দিদের এই সম্পর্ক বেশ কয়েক বছর উষ্ণ ছিল। বারজানী ও কুর্দিদের সামরিক বাহিনীর প্রধান বেশ কয়েকবার ইসরাঈল সফর করেন। মেইর অমিত এবং সহকারীরা কুর্দিস্থান সফর করেন। ইসরাঈল কুর্দিদের তখন ব্যাপক অস্ত্র দেয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যুতে কুর্দিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

কুর্দিস্তান সফরকারী ইসরাঈলী গোয়েন্দাদের মধ্যে প্রথম সিনিয়র মোস্ট গোয়েন্দা হলেন বেনি জেভি। তার স্ত্রী গালিলা সন্তান প্রসবের লক্ষ্যে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। এই দম্পতির পুত্র সন্তান নাদাভের জন্মের সময় বেনি জেভি কুর্দিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে বারজানীর সঙ্গে সফর করেন। ঐ সময় বেনি জেভির কাছে সাংকেতিক ভাষায় এটি টেলিগ্রাম

পাঠান মেইর অমিত। অমিতের কোড নাম 'রিমন'। টেলিগ্রামে বলা হয় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ঠিক আছে।

বেনি জেভির ছেলে হবার খবরে বারজানী চারটি পাথর নিয়ে তাতে নানা কথা লিখে দেন। জেভিকে বললেন, 'আপনার ছেলের জন্য আমার এই উপহার। ছেলে বড় হয়ে যখন আমার দেশে আসতে চাইবে তাকে কেউ আটকাবে না। তার জন্য জমিও রাখা হবে কুর্দিস্তানে।'

MOSSAD- *THE GREATEST MISSIONS OF THE ISRAELI SECRET SERVICE* বইয়ে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

১৫. ইরাকের মিগ-২১ বিমান ছিনতাই করে নেয় মোসাদ

নিজেদের বিমানবাহিনীর সুবিধার জন্য শত্রুপক্ষের একটি যুদ্ধবিমান চুরি করে নিয়ে আসা, তাও মিগ-২১? শুনতে অবাস্তব মনে হলেও ইসরাঈলের দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদ ঠিক এ কাজটিই করেছিল। জেমস বন্ডের সিনেমার থেকেও চাঞ্চল্যকর ছিল সে অভিযান। 'অপারেশন ডায়মন্ড' ছিল সে অভিযানের নাম।

সোভিয়েত রাশিয়ায় তৈরি মিগ-২১ ছিল গত শতাব্দীর ষাটের দশকের সেরা ফাইটার জেট। ১৯৫৯ সালে উৎপাদন শুরু হওয়া মিগ-২১ রাশিয়ার বাইরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করত রাশিয়ার কৌশলগত মিত্র মিসর, সিরিয়া আর ইরাক। ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আমেরিকার সাথে ইসরায়েলের সম্পর্ক অনেক ভালো। আর স্নায়ুযুদ্ধের সে সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের বাইরেও ইসরাঈলকে ভাবতে হতো তাদের অস্তিত্ব নিয়ে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আরব দেশগুলোর সাথে ছিল ইসরায়েলের শত্রুতা, একাধিক যুদ্ধ হয়েছে তাদের সাথে। আর এসব যুদ্ধে আরব দেশগুলোর যুদ্ধবিমানের কাছে বেশ নাজেহাল হয় ইসরায়েলের যুদ্ধ বিমান। এ কারণে আরবদেশগুলোর হাতে থাকা মিগ-২১গুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইসরায়েলের একপ্রকার জেদ চেপে যায়। আর বিস্তারিত জানার জন্য তার চাই একটি মিগ-২১। কিন্তু ইসরাঈল চাইলেই রাশিয়ার কাছে

মিগ-২১ কিনতে পারবে না। ফলে তাদের হাতে উপায় থাকে একটিই, মিগ-২১ চুরি করে নিয়ে আসা!

যেমন ভাবা তেমন কাজ। মিগ-২১ চুরি করে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয় মোসাদের ওপরে। শত্রুর কাছ থেকে বিমান চুরির এই 'মহৎ'(!) উদ্যোগের কোড নাম হয় অপারেশন ডায়মন্ড। ষাটের দশকের শুরুতেই মোসাদ এ ব্যাপারে কাজ শুরু করে। ইসরায়েলের ঠিক পাশেই মিসর হওয়াতে তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল মিসর থেকে চুরি করা।

একজন মিসরীয় পাইলটকে রাজি করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় মোসাদ এজেন্ট জিন থমাসকে। থমাস আর তার এজেন্টরা আদিব হান্না নামে একজন মিসরীয় পাইলটকে টার্গেট করে তাদের কাজ করানোর জন্য। তারা তাকে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবার প্রস্তাবও দেয় মিগ-২১ নিয়ে ইসরাঈলে যাবার জন্য। কিন্তু হান্না তাদের কথায় রাজি তো হয়নি, উল্টো মিসরীয় কর্তৃপক্ষকে থমাসের এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেয়। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে থমাসসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ। এরপর তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয় অপরাধ প্রমাণিত হওয়াতে।

এ ঘটনার দুই বছর পর ইসরাঈল না চাইতেই এক সফলতা পায়। দুর্নীতিগ্রস্থ এক মিসরীয় পাইলট, ক্যাপ্টেন আব্বাস হেলমি, তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বিরোধের জের ধরে তার ইয়াক-১১ বিমান নিয়ে ইসরায়েলে পালিয়ে যায়। কোনোরকম চেষ্টা ছাড়াই ইসরায়েলের এই সফলতা আসলেও মাত্র দুমাস পরেই হেলমিকে হত্যা করা হয় দক্ষিণ আমেরিকায়। ধারণা করা হয়, মিসরীয় গোয়েন্দাবাহিনীই হত্যা করে তাকে। ইয়াক-১১ প্রশিক্ষণ বিমান হওয়াতে আর পাইলট মারা যাওয়াতে ইসরাঈল তাদের দরকারি কোনো তথ্যই পায়নি এ ঘটনা থেকে।

মিশরে ব্যর্থ হবার পর মোসাদ চেষ্টা করে ইরাকে। কিন্তু ইরাকেও প্রথমে ব্যর্থ হতে হয় মোসাদকে। তবে আগেরবারের মতো ভুল করেনি এবার মোসাদ এজেন্টরা। দুই ইরাকি পাইলটকে রাজি করাতে ব্যর্থ হলে

মোসাদ এজেন্টরা দুই পাইলটকে মারাত্মকভাবে আহত করে রাখে, যাতে তারা এ ব্যাপারে কাউকে কিছু জানাতে না পারে।

তবে মোসাদের ভাগ্য খোলে ১৯৬৪ সালে। ইরাকে বাস করা এজরা জেলখা নামের এক ইহুদি ইরানের তেহরানে ইসরাঈলের দূতাবাসে যোগাযোগ করেন এক ইরাকি পাইলটের ব্যাপারে। মোসাদের কাছে এজরা জেলখার সাংকেতিক নাম ছিল 'ইউসুফ'। জেলখা ছোট থেকেই পরিবারহীন, বড় হয়েছিলেন এক খ্রিষ্টান পরিবারের কাছে। কিন্তু সময়ের সাথে তিনি সেই পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠেন। তবে সেই পরিবারের এক কর্তা একবার তার সাথে খারাপ ব্যবহার করার পর তিনি তার ইহুদি পরিচয়ের গুরুত্ব বুঝে ইসরায়েলের সাথে যোগাযোগ করেন। জেলখা ইরাকে সেই পরিবারের সাথেই ছিলেন বাকি সময়, কিন্তু কাজ করেছেন মোসাদের স্লিপিং এজেন্ট হিসেবে।

মুনির রেদফা নামের সেই ইরাকি পাইলট ছিলেন ইরাকি বিমানবাহিনীর একজন পাইলট। কিন্তু শুধু খ্রিষ্টান হবার কারণে তিনি কর্মক্ষেত্রে অনেক বৈষম্যের শিকার হতেন। পদোন্নতি পেতেন না সহজে, পোস্টিং সব সময় দুর্গম এলাকায় হতো। ফলে ইরাক আর ইরাকী বাহিনীর ওপরে ক্ষিপ্ত ছিলেন তিনি। সুযোগ খুঁজছিলেন ইরাক ছেড়ে চলে যাবার। রেদফার রাগের আরেকটি কারণ ছিল, বিনা কারণে কুর্দিদের ওপরে হামলা করা। নিজের এসব হতাশা আর রাগের কথা জেলখাকে জানালে তিনি সে কথা ইসরাঈল কর্তৃপক্ষকে জানান। আর মোসাদ এটিকেই তাদের সবচেয়ে বড় সুযোগ হিসেবে দেখে।

মোসাদ তাদের একজন নারী এজেন্টকে পাঠায় রেদফার সাথে যোগাযোগের জন্য। প্রথমে রেদফার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে সেই এজেন্ট, রেদফার নিজের কাছ থেকেই তার হতাশা আর রাগের কথাগুলো শোনে সে। এরপরই মোসাদ এজেন্ট তার আসল পরিকল্পনা শুরু করে। বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে রেদফাকে রাজি করায় ইউরোপে মোসাদ এজেন্টদের সাথে দেখা করার ব্যাপারে। রেদফা রাজি হলে ইউরোপে মোসাদের একজন অফিসারের সাথে দেখা করেন তিনি। রেদফাকে ১

মিলিয়ন ডলার, ইসরাঈলের নাগরিকত্ব এবং চাকরির আশ্বাস দেওয়া হয় তার মিশন সফল করতে পারলে।

ধর্মীয় কারণে চাকরি নিয়ে হতাশাগ্রস্থ রেদফাকে রাজি করানোর এই সংস্করণটি ইসরায়েলের ভাষ্য। কিন্তু সাবেক ইরাকী গোয়েন্দা কর্মকর্তা আহমাদ সাদিক এবং মিসরীয় ইতিহাসবিদ নূর বারাদি পুরো ঘটনার ভিন্ন একটি গল্প বলেছেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইরাকের সাথে গ্রেট ব্রিটেনের বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর পরিস্থিতি উল্টে যায়, নতুন সামরিক শাসকরা পশ্চিমা দেশ বাদ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক মিগ-১৯ ও মিগ-২১ কিনে সোভিয়েত থেকে।

কিন্তু পরিস্থিতি আবার পাল্টে যায় ১৯৬৩ সালের আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের পরে। এবারের শাসকরা ছিলেন পশ্চিমাঘেঁষা, ফলে আমেরিকা আর ব্রিটেনের সাথে আবারো সম্পর্ক জোড়া লাগে। ১৯৫৮-৬৩ সালে সামরিক বাহিনীতে থাকা বেশির ভাগ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার চাকরি চলে যায় আগের সরকারের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে। এই সুযোগে মিগ-২১ এর প্রশিক্ষণ থাকা রেদফা হয়ে যান ইরাকের স্কোয়াড্রন-১১ এর ডেপুটি কমান্ডার। স্কোয়াড্রন-১১ ছিল ইরাকের মিগ-২১ এর একমাত্র স্কোয়াড্রন। রেদফার ধর্মীয় পরিচয় এখানে কোনো ভূমিকাই পালন করেনি, বরং দেশের প্রতি আনুগত্যই ছিল মূল।

অন্যদিকে ইসরাঈল ইরাকের পাইলটদের প্রভাবিত করে মিগ-২১ চুরি করার মিশন তখনও ছাড়েনি। তাদের সামনে সুযোগ আসে, যখন ১৯৬৫ সালে ১৫ জন ইরাকি পাইলট আমেরিকা যায় প্রশিক্ষণের জন্য। মোসাদ তাদের নারী এজেন্টদের ব্যবহার করে তরুণ পাইলটদের এক এক করে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। প্রথম চেষ্টায় একজন রাজি না হলে তাকে হত্যা করা হয়। তবে পাইলট হত্যার পর ইরাক তার পাইলটদের দেশে ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু ফেরার সময় তিনজন পাইলটের সাথে ফেরে তিনজন মোসাদ এজেন্ট, তাদের বান্ধবী হিসেবে। সেই তিনজন পাইলটের একজন রেদফা।

পাইলটদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের নিজেদের কবজায় আনাই ছিল মোসাদের মূল লক্ষ্য। রেদফার সাথে যে এজেন্ট ছিল, তার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। লিসা ব্রাট নামের সেই মহিলা এজেন্ট খুব সম্ভবত আমেরিকান ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। রেদফার আগে অন্য দুজন পাইলটকেও রাজি করানোর চেষ্টা করে তাদের সাথে আসা এজেন্টরা। কিন্তু তাদের কেউই রাজি না হওয়াতে হত্যা করা হয় দুজনকেই। এরপর যখন রেদফাকে প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন তিনিও প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু তাকেও হত্যার হুমকি দিলে তিনি শেষপর্যন্ত লিসার সাথে ইউরোপে গিয়ে অন্য মোসাদ এজেন্টদের সাথে দেখা করতে রাজি হন।

রেদফা স্বেচ্ছায় রাজি হন কিংবা ভয়ের জন্য সেটি নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে তিনি যে একপর্যায়ে রাজি হয়েছিলেন সেটি নিশ্চিত। তবে রেদফাও নিজের কিছু শর্ত জুড়ে দেন অন্য সবকিছুর সাথে। তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে ইরাক থেকে বের করে আনতে হবে। রেদফা পালিয়ে যেতে সফল হতে পারুক বা না পারুক, ইরাকে তার পরিবার থাকলে তাদের অচিন্তনীয় অত্যাচারের শিকার হতে হবে তার জানা ছিল। তাই তিনি সবকিছুর আগে তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চান।

মোসাদ তার প্রস্তাবে রাজি হলে রেদফা ইসরায়েলে যান পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে। সফলভাবে ইসরায়েলে প্রবেশ করতে পারলে যে বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন, সেটিও দেখে আসেন রেদফা। ইসরাঈলের তৎকালীন বিমানবাহিনী প্রধান ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন সম্ভাব্য ফ্লাইট পাথ নিয়ে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ রেদফাকে পুরো মিশনের বিপদগুলোও জানিয়ে দেয়। পুরো মিশনটি যে একপ্রকার সুইসাইড মিশন ছিল, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

সবকিছু ঠিকঠাক হলে মোসাদ তাদের এজেন্ট পাঠায় ইরাকে, রেদফার পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে ইসরাঈলে নিয়ে যাবার জন্য। নিরাপত্তার খাতিরে পরিবারের কাউকেই জানানো হয়নি আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে। রেদফা তার স্ত্রী ও কন্যা নিয়ে প্যারিসে যান। রেদফা তার স্ত্রীকেও কিছু

জানাননি এ ব্যাপারে। তাই তার স্ত্রী প্রথমে ভেবেছিলেন তারা ছুটি কাটাতে গিয়েছেন প্যারিসে! কিন্তু যখন মোসাদ এজেন্ট তার সাথে দেখা করে, তখন তিনি অবাক হয়ে যান। প্রথমে রেগে গিয়ে ইরাকী কর্তৃপক্ষের কাছে সবকিছু ফাঁস করে দেবার হুমকিও দেন। কিন্তু মোসাদ এজেন্টরা তাকে শান্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে নতুন পরিচয়ে ইসরায়েলি পাসপোর্ট নিয়ে সন্তানদের নিয়ে ইসরায়েলে যাবার জন্য রাজি হন রেদফার স্ত্রী।

অন্যদিকে ইরাকে মোসাদ এজেন্টরা দায়িত্ব পায় রেদফার পরিবারের অন্যদের ইরাক থেকে বের করার। কিন্তু সবার আগে অপেক্ষা করতে থাকে রেদফা, সে বিমান নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেই পরিবারের সদস্যদের ইসরায়েলে নেওয়া হবে। তার আগেই কিছু করলে যে কেউ সন্দেহ করে বসতে পারে, ভণ্ডুল হতে পারে পুরো পরিকল্পনা।

এদিকে ১৯৬৬ সালের জুলাইয়ে রেদফাকে স্কোয়াড্রন-১১ এর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ পান রেদফা। কিন্তু তারপরেও তিনি চাইলেই যেকোনো দিন তার এয়ারবেস থেকে ইসরায়েলে পালিয়ে যেতে পারেন না। তার সামনে সুযোগ আসে ১৯৬৬ সালের ১৬ আগস্ট। খুবই স্বাভাবিকভাবে তার দিনের কার্যক্রম করেন অন্যান্য দিনের মতোই। সেদিনের রুটিন ফ্লাইটে যাবার আগে গ্রাউন্ড ক্রুদের তিনি নির্দেশ দেন তার বিমানের জ্বালানি ট্যাঙ্ক পূর্ণ করে দিতে। জ্বালানি ট্যাঙ্ক পূর্ণ করার জন্য এয়ারবেসে থাকা রাশিয়ানদের অনুমতি লাগত, কিন্তু গ্রাউন্ড ক্রুরা স্বাভাবিকভাবেই বিদেশিদের খবরদারি খুব একটা পছন্দ করত না। তাই বেশির ভাগ সময় তারা রাশিয়ানদের জানাতই না সে ব্যাপারে। তারই সুযোগ নেন রেদফা। গ্রাউন্ড ক্রুরাও বিদেশিদের খবরদারির থেকে নিজের দেশের অফিসারদের কথা বিনা প্রশ্নে মানাটাই পছন্দ করতেন।

সর্বোচ্চ সম্ভব জ্বালানি নিয়ে রেদফা তার রুটিন ফ্লাইট শুরু করেন। কিন্তু বাগদাদ থেকে বের হতেই তিনি রুটিন ফ্লাইট পাথ থেকে মুখ ঘুরিয়ে রওনা দেন ইসরায়েলের দিকে। প্রথমদিকে ইরাকীরা বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারার সাথে সাথে রেদফাকে নির্দেশ দেয় ফিরে আসার। কিন্তু রেদফা ততক্ষণে তার রেডিও বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রায় ৩০ হাজার ফুট

ওপর দিয়ে তিনি আঁকাবাঁকাভাবে যেতে থাকেন ইসরায়েলের দিকে। অন্যদিকে, রেদফার পালানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর ইরাকে থাকা মোসাদ এজেন্টরা রেদফার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ইরানের সীমান্তের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর কুর্দি সেনাদের সাহায্যে তাদের ইরানে প্রবেশ করানো হয়। সেখান থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ইসরায়েলে।

এদিকে রেদফাকে ইসরায়েলে যেতে হলে জর্ডানের আকাশ দিয়ে যেতে হবে। জর্ডানের নিরাপত্তাবাহিনীর রাডারে তার বিমান ধরা পড়লে তারা মনে করে এটি সিরিয়ার বিমান। তারা সিরিয়ার সাথে যোগাযোগ করলে বলে সিরিয়া জানায় এটি তাদেরই ট্রেনিং বিমান! দুই পক্ষের ভুল বোঝাবুঝিতে আসলে ফায়দা হয় রেদফার। নিরাপদে চলে যান ইসরায়েলের কাছাকাছি।

ইসরায়েলে প্রবেশের সাথে সাথে ইসরাঈলি বিমানবাহিনীর মিরাজ বিমান এস্কোর্ট করে নিয়ে যায় রেদফাকে। অনেক উঁচু আর সর্বোচ্চ গতিতে চালানোর ফলে রেদফার মিগের জ্বালানি একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। নিরাপদেই কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই ইরাক আর জর্ডানকে ফাঁকি দিয়ে রেদফা অবতরণ করেন ইসরায়েলে। সফল হয় মোসাদের মিগ চুরির অভিযান! রেদফার নিয়ে যাওয়া মিগ-২১ টিকে নতুন করে রং করে ইসরাঈল, আর সাংকেতিক নম্বর হয় ০০৭। সংখ্যাটা যে জেমস বন্ডের অনুকরণে সেটি বুঝতে আশা করি কারোরই কষ্ট হবার কথা না। তবে আন্তর্জাতিক মিডিয়াসহ জনসাধারণের জন্য খুব কম তথ্যই প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। পুরো মিশনের সাথে জড়িতদের বেশির ভাগ মানুষ সম্পর্কেই কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি তারা। ছবি বা অন্যান্য তথ্যও খুব একটা প্রকাশ করেনি ইসরাঈল।

রেদফার নিয়ে যাওয়া মিগ-২১ নিয়ে ইসরায়েলিরা পরবর্তী সময়ে অনেক গবেষণা চালিয়েছে। এর শক্তি আর দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করে। মিগের বিরুদ্ধে নিজেদের বিমানগুলোর লড়াইয়ের ব্যাপারে নতুন করে প্রশিক্ষণ দেয় ইসরাঈল। রেদফার মিগ অভিজ্ঞতাও সেক্ষেত্রে তাদের

সাহায্য করেছিল। আর রেদফার এই অবিশ্বাস্য অভিযানের ফলেই ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী একের পর এক সাফল্য পায়। কোনো বিমান না হারিয়েই আরবদের ছয়টি মিগ-২১ ধ্বংস করে ইসরাঈল।

১৯৬৮ সালে আমেরিকাকে মিগ-২১ ধার দেয় ইসরাঈল, যেন আমেরিকাও তাদের নিজেদের মতো করে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে। ইসরায়েলে রেদফা বীর হলেও ইরাকে তিনি বিশ্বাসঘাতক। রেদফার এই বিশ্বাসঘাতকতার দাম দিতে হয় ইরাকের খ্রিষ্টানদের। ২০০৩ সালের আগে ইরাকের বিমানবাহিনীতে কোনো খ্রিষ্টান যোগ দিতে পারেনি!

[তথ্যসূত্র : Ian Black and Benny Morris (2007). Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Service]

১৬. সিরিয়া থেকে ইহুদি তরুণীদের ফিরিয়ে আনে মোসাদ

শিয়াপ্রধান সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পিতা হাফিজ আল আসাদ ইহুদিদের প্রতি কট্টোর মনোভাব পোষন করতেন। অবশ্য শিয়ারা সাধারণ মুসলমানদের প্রতিও চরম কট্টোরতা প্রদর্শন করে। কিন্তু ইহুদিদের প্রতি এরকম কট্টোর পরিবেশে থেকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন ছিল। এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালে সিরিয়া থেকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাঈলে জীবন বাচানোর আকুতি জানিয়ে চিঠি আসে। এ সম্পর্কে মাইকেল বার জোহার এবং নিসিম মিশাল তাদের MOSSAD- *THE GREATEST MISSIONS OF THE ISRAELI SECRET SERVICE* গ্রন্থে বলেন, ... Two years ago, a message had come from Syria. It had been sent by the leaders of the dwindling Jewish community. The autocratic regime of President Hafez Al-Assad, who had seized power in 1970, oppressed and persecuted the local Jews. Many of them had trickled out of the country, leaving behind a tiny, aging community. The young and able men had escaped from Syria, leaving behind Jewish girls who had no hope of finding husbands. Their best option was to escape to Israel.

Some of the girls, Zamir told the Cosa Nostra, had tried to escape via Lebanon, with the help of smugglers they had bribed. Some of them had been captured, beaten, tortured, even shot. A few had still managed to get to Beirut. All of them had the address of a safe house in the Lebanese capital. Local

Mossad helpers had taken care of them until they could be brought to Israel.

One night, in the winter of 1970, an Israeli missile boat approached the port of Jounieh, north of Beirut, and local fishermen brought over the twelve Jewish girls who had fled Syria...

মৃতপ্রায় ইহুদি সম্প্রাদয় নেতাদের পাঠানো হাফেজ আল আসাদ সিরিয়ার ইহুদিদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালাচ্চেন। এই ছিল বার্তা। ১৯৭০ সালে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতায় আরোহী হাফেজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় আধমরা ইহুদি সম্প্রাদয়। বহু ইহুদি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সিরিয়া ত্যাগ করেছে বটে। কিন্তু কতিপয় পুচকে ও বর্ষিয়ান ইহুদিরা আটকে আছে সিরীয়ায়। তরুণ সম্প্রাদয়ও সিরিয়া থেকে পালিয়েছে। ফলে রয়ে গেছে কুমারী তরুণীরা। এখন কে তাদের বিয়ে করবে এটা একটা বিরাট সমস্যা। এই কুমারী মেয়েগুলো যদি পালিয়ে ইসরাঈলে যেতে পারে তাহলে তাদের ঘর সংসার হবে।

... কর্নেল আব্রাহামের পরবর্তী কয়েক বছরে আমনোন গোনেন পূর্বসূরির অনুরূপ বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সিরিয়া আটকে পড়া বহু ইহুদি সেয়েকে বিভিন্ন রুটে ইসরাঈলে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তবে সিরিয়া লিবিয়ার সীমান্ত খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এদিকে আরব চোরাচালান ও জেলেদের বিশ্বাস করা কঠিন। ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী তার গোত্রের মেয়েদের ইসরাঈলে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। তিনি মোসাদ প্রধান জামিরকে নির্দেশ দিলেন যেকোন মূল্যে সিরীয়ায় বসবাসরত ইহুদি মেয়েদের ফিরিয়ে আনতে ।

কোমা নস্ট্রার চারজনের সাথে মোসাদ প্রধান জামির বৈঠক করেন সেখানে তিনি বলেন ওরা সিরিয়ার নাগরিক কিন্তু ওই ইহুদি মেয়েদের উদ্ধারের দায়িত্ব তোমদের। এটাই তোমাদের এসাইনমেন্ট।

জামিরের নির্দেশের পরও প্রবল বিতর্কের সূচনা হয়। কেউ কেউ প্রায় চিৎকার করে মোসাদ এজেন্টদের এই কাজ নয়। ইহুদি এজেন্টদের এই দায়িত্ব দেওয়া হোক। অনেক কর্মকর্তা বেজায় ক্ষেপা বলেন মোসাদ কোস ঘটকালি সংগঠন নয়। এই কাজে মোসাদ গোয়েন্দারা ঝুঁকি নেবে। কেননা, আরবরা নিষ্ঠুর জাতি। তাদের মোকাবিলা করা খুবই কঠিন। কয়েকটি ইহুদি কুমারী মেয়েদের পাত্রের অভাবে বিয়ে হচ্ছে না বলে এত বড় ঝুঁকি মোসাদ নিতে পারে না। মোসাদ প্রধান এতসব বিতর্কের পরও ভড়কে গেলেন না। তিনি বললেন শত্রুদেশে আটক ইহুদি সম্প্রাদয়কে রক্ষা করা এবং তাদের উদ্ধার করা মোসাদের কার্য তালিকায় রয়েছে। মোসাদের জন্মলগ্ন থেকেই তারা এই ধরনের কাজ করে আসছে। ... ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে সিরিয়ার কুমারী ইহুদির মেয়েদের ইসরাঈলে আনার প্রক্রিয়া শেষ হলো। অভিযানের সমাপ্তি টানতে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার হাইফার নৌঘাটিতে এসেছিলেন। গোল্ডা মোসাদের ক্লাডিয়েসহ তার বন্ধুদের ধন্যবাদ দিতেই এসেছিলেন। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোসাদ এবং নৌবাহিনী সিরিয়ার কুমারীদের ২০টির মতো অভিযান পচিালনা করেন। এবং সবগুলো অভিযানই সফল হয়। প্রায় ১২০ জন তরুণকেও ইসরাঈলে ফিরিয়ে আনা হয়। এই সকল অভিযানের কথা ৩০ বছর গোপন রাখা হয়।

১৭. ইয়াসির আরাফাতকে হত্যায় মোসাদের যত দুর্ধর্ষ অপারেশন

গ্রিস ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের আকাশে প্রবেশ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর দুটি এফ-১৫ যুদ্ধ বিমানের রাডারে ধরা পড়ল ফিলিস্তিনি যাত্রীবাহী ডিএইচএফ-৫ বাফেলো প্লেনটি। রাডারের বিপ বিপ

শব্দ কানে আসা মাত্রই ফাইটার দুটো দিক ঘুরিয়ে রওনা দিল সোজা প্লেনটির উদ্দেশ্যে। কাছাকাছি যেতেই দৃষ্টিগোচর হলো প্লেনটির লেজের নীল ও বাদামী বর্ণের প্রতীক এবং সিরিয়াল নাম্বার। কোনো সন্দেহ রইল না এটিই সেই প্লেন, গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী যার মাঝে আছেন ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামের নেতা ইয়াসির আরাফাত। পাইলট দুজনের মধ্যে যিনি সিনিয়র, তিনি রেডিওতে যোগাযোগ করলেন বিমান বাহিনীর কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে। শেষবারের মতো জানতে চাইলেন, "আমরা কি প্লেনটি ধ্বংস করব?"

ঘটনাটি ১৯৮২ সালের ২৩ অক্টোবর বিকেল বেলার। ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ, মেজর জেনারেল ডেভিড ইভরি বসে আছেন রজধানী তেল আবিবের কেন্দ্রে, বিমান বাহিনীর ভূগর্ভস্থ প্রধান কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে, যার ছদ্মনাম ক্যানারি। এফ-১৫ ফাইটার প্লেনের পাইলট যখন আরাফাতকে বহন করা বিমান ধ্বংস করার অনুমতি চাইলেন, তখন তার কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল ক্যানারির লাউড স্পীকারে। সবাই ঘুরে তাকাল ইভরির দিকে। সবাই নিশ্চিত ছিল, তিনি সাথে সাথেই অনুমতি দেবেন। কিন্তু মেজর জেনারেল ইভরি, যার এমনিতে যেকোনো জটিল বিষয়ে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারার ব্যাপারে সুখ্যাতি আছে, সেদিন সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেলেন।

ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগঠন, পিএলও'র চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতকে হত্যার এই পরিকল্পনাটি মাত্র আগের দিনই প্রস্তুত করেছিল ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। সে সময় পিএলও-তে মোসাদের দুজন গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। তাদের কাছ থেকে মোসাদ সংবাদ পায়, ২৩ তারিখ বিকেলে ইয়াসির আরাফাত একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বিমানে চড়ে গ্রিস থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। দীর্ঘদিন ধরেই ইসরাঈল ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিল। এ তথ্য পাওয়ামাত্রই তারা কাজে লেগে গেল।

মোসাদের মধ্যে যে বিভাগটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে হত্যার দায়িত্বে নিযুক্ত, তার নাম সিজারিয়া। আরাফাতের অবস্থান জানার সাথে সাথেই

সিজারিয়ার পক্ষ থেকে দুজন এজেন্টকে গ্রীসে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। সে সময় এথেন্স এয়ারপোর্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব একটা মজবুত ছিল না। এজেন্ট দুজন প্রায় বিনা বাধায় ব্যক্তি মালিকানাধীন প্লেনগুলো যেখানে পার্ক করা থাকে, সেখানে পৌঁছে যায়। আরাফাত ঠিক কোন প্লেনটিতে ওঠে, তা নিশ্চিত করার জন্য তারা সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

ওদিকে তেল আবিবে এরিয়েন শ্যারন তার অধীনে থাকা ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের (আইডিএফ) চিফ অফ স্টাফ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাফায়েল এইতানকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন আরফাতকে হত্যার মিশন যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য। রাফায়েল এইতানের নির্দেশে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী, তেল নোফ বিমান ঘাঁটিতে তাদের দুটি এফ-১৫ ফাইটার জেটকে প্রস্তুত করে রাখে, যেন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তারা যাত্রা শুরু করতে পারে।

বিমান বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ ডেভিড ইভরির সব সময়ই সাবধানী এবং সচেতন কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাতি ছিল। তিনি জানতেন যদি ভুলক্রমে আরাফাত নেই এরকম কোনো যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তাহলে সেই ঘটনার রাজনৈতিক প্রভাব কতটা ভয়াবহ হতে পারে। কাজেই তিনি নিজে গিয়ে পাইলট দুজনের সাথে কথা বললেন। তিনি তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিলেন, আমার সম্মতি ছাড়া তোমরা আক্রমণ করবে না। পরিষ্কার? এমনকি, যদি যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা হয়, যদি তোমরা আমার নির্দেশ শুনতে না পাও, তাহলেও তোমরা আক্রমণ করবে না।

২৩ তারিখ দুপুর ২টা ৫ মিনিটে এথেন্স থেকে সিজারিয়া এজেন্টদের একজন মোসাদের হেডকোয়ার্টারে ফোন করল। সে জানাল, তারা ইয়াসির আরাফাতকে সনাক্ত করেছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী আরাফাত তখন তার সঙ্গীসাথিসহ একটি ডিএইচসি-৫ বাফেলো বিমানে চড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ফাইটার জেটের পাইলটরা যেন সহজে প্লেনটিকে সনাক্ত করতে পারে, সেজন্য সে প্লেনটির লেজের নীল এবং বাদামি

বর্ণের প্রতীকের বিবরণ এবং এতে লেখা রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটিও জানিয়ে দিল। তার দেওয়া তথ্য মোসাদ সাথে সাথে বিমান বাহিনীর কন্ট্রোল সেন্টার, ক্যানারিতে পাঠিয়ে দিল।

অভিজ্ঞ বিমান বাহিনী প্রধান ডেভিড ইভরি কিন্তু এত সহজে নিশ্চিত হতে পারলেন না। তার মনের মধ্যে সন্দেহ উঁকি দিয়ে যেতে লাগল। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, ওই সময়ে আরাফাত কেন মিসরে যাবেন? গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী সে সময়ে আরাফাতের গ্রীসে বা মিসরে যাওয়ার মতো কারণ ঘটেনি। তা ছাড়া যদি গিয়েও থাকেন, তাহলেও তিনি কেন বাফেলো বিমানে চড়বেন? তার মতো পদমর্যাদার একজন ব্যক্তির জন্য বাফেলো বিমানগুলো মোটেও সম্মানজনক ছিল না।

সন্তুষ্ট হতে না পেরে ইভরি আবারও তথ্য নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিলেন। সিজারিয়ার এজেন্ট দুজন আবারও জানাল, তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, প্লেনে চড়া ব্যক্তি ইয়াসির আরাফাতই। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, গোয়েন্দাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য আরাফাত লম্বা দাড়ি রেখেছেন, কিন্তু তারপরেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তিনি আরাফাত ছাড়া অন্য কেউ নন।

বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে সিজারিয়া এজেন্টরা মোসাদ হেডকোয়ার্টারে ফোন করে জানাল, আরাফাতকে বহনকারী প্লেনটি আকাশে উড়েছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ইভরি প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান রাফায়েল এইতানের কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশ পেলেন, "ধ্বংস করে দাও প্লেনটি।" ইভরি তার পাইলটদেরকে উড়তে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তার সন্দেহ তখনও দূরীভূত হয়নি। তিনি আবারও ফোন করলেন মোসাদের কাছে। তাদেরকে বললেন, ভিন্ন কোনো উৎস থেকে নিশ্চিত করতে যে, ওই ব্যক্তি আসলেই আরাফাত, তার মতো দেখতে অন্য কেউ না।

ইভরি পাইলটদের মানসিক অবস্থার কথা জানতেন। তিনি জানতেন, এরকম মুহূর্তে ফাইটার প্লেনের পাইলটরা যেকোনো অযুহাতে মিসাইল নিক্ষেপের জন্য উদগ্রীব থাকে। রেডিওতে সামান্য শব্দ হলেও তারা সেটাকেই সম্মতি হিসেবে ধরে নিতে চায়। তাই উড়তে নির্দেশ দেওয়ার

পরেও তিনি আবার তাদের সাথে যোগাযোগ করে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যেন তারা কোনো অবস্থাতেই তার পরিষ্কার নির্দেশের আগে আক্রমণ না করে।

এদিকে রাফায়েল এইতান, মোসাদ এবং সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী, 'আমান' বারবার ইভরির কাছে ফোন করে খোঁজ নিচ্ছিল, অপারেশনের অগ্রগতি কতটুকু? যদিও সিজারিয়ার এজেন্টরা তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেছিল, কিন্তু ইভরি তাদেরকে বলছিলেন যে, তখনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি আসলেই প্লেনে আরাফাত আছেন কিনা। ঠিক এরকম সময় স্পীকারে পাইলটের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে যে, তারা বাফেলো প্লেনটির দেখা পেয়েছেন। কিন্তু ইভরি তখনও দ্বিতীয় উৎস থেকে নিশ্চয়তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাই তিনি আক্রমণ না করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

ইভরির পক্ষে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তার ওপর আইডিএফ প্রধান রাফায়েল এইতান এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী এরিয়েন শ্যারনের সরাসরি নির্দেশ ছিল প্লেনটি ধ্বংস করার জন্য। তিনি যদি তা না করেন, তাহলে তাকে কঠিন জবাবদিহিতার মুখামুখি হতে হবে। ইভরি যখন কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না, ঠিক তখন বিকেল ৫টা বাজে ক্যানারির একটি ফোন বেজে উঠল। এটি ছিল সরাসরি মোসাদের হেডকোয়ার্টারের সাথে সংযুক্ত একটি সুরক্ষিত লাইন।

ইভরি ফোন রিসিভ করলেন। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল গম্ভীর কিন্তু বিব্রত একটি কণ্ঠস্বর। জানানো হলো, মোসাদ ভিন্ন একটি উৎস থেকে নিশ্চিত করেছে যে, ইয়াসির আরাফাত আসলে গ্রিসেই যাননি। কাজেই যে ব্যক্তি প্লেনে উঠেছেন, তিনি আরাফাত হতে পারেন না। সম্ভবত তিনি একই চেহারার অন্য কেউ। ইভরি বাফেলো বিমানটিকে অনুসরণ করতে থাকা পাইলটদেরকে জানালেন, তারা যেন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে।

৫টা ২৩ মিনিটে আরেকটি রিপোর্ট এল ক্যানারিতে। মোসাদের দ্বিতীয় আরেকটি উৎস এবং আমানের একটি উৎস পৃথক পৃথকভাবে নিশ্চিত

করল, প্লেনে চড়া ব্যক্তি আসলে ইয়াসির আরাফাতের ভাই ফাতহি আরাফাত। ফাতহি ছিলেন একজন ডাক্তার এবং ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। সেদিন তিনি ৩০ জন শিশুকে সাথে করে গ্রিস থেকে মিসরে যাচ্ছিলেন তাদের চিকিৎসার জন্য, যারা মাত্র এক মাস আগে লেবাননের সাবরা-শাতিলা শরণার্থী শিবিরে খ্রিষ্টানদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু আহত হয়েছিল গুরুতরভাবে।

চেপে রাখা নিশ্বাসটা ছেড়ে দিলেন ইভরি। তার আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। একাধিকবার সতর্কভাবে তথ্য যাচাই করার নির্দেশ না দিলে এটা হতে পারত ইসরায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুলগুলোর মধ্যে একটি। আহত শিশুতে পরিপূর্ণ প্লেনকে মিসাইল দিয়ে ধ্বংস করলে বিশ্বব্যাপী তার প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারত। ইভরি শেষবারের মতো যোগাযোগ করলেন এফ-১৫ পাইলটের সাথে। তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, "ফিরে এসো। ঘরে ফিরে এসো।"

ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করার এটাই একমাত্র বা প্রথম ইসরায়েলি প্রচেষ্টা ছিল না। এর আগে পরে অনেকবারই তাকে হত্যার চেষ্টা করেছে ইসরাঈল। আরাফাতকে হত্যাচেষ্টার এসব পরিকল্পনা এবং সেগুলো থেকে আরাফাত কীভাবে বারবার রক্ষা পেয়েছেন, তার বিস্তারিত উঠে এসেছে সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত সাংবাদিক রনেন বার্গম্যানের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি তার প্রকাশিত বই Rise and Kill First: The Secret History of Israels Targeted Assassinations এর একটি অধ্যায়।

ইসরাঈল ভিত্তিক সাংবাদিক রনেন বার্গম্যান এ পর্যন্ত ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের শত শত কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং হাজার হাজার গোপন নথিপত্র দেখেছেন। তার নিজের ভাষায়, এসব নথিপত্রে ইসরায়েলের ইতিহাসের এমন এক গোপন দিকের সন্ধান পাওয়া যায়, যা এমনিতেই ভয়ংকর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা ইসরায়েলের জন্যও আশ্চর্যজনক। ইসরাঈল রাষ্ট্রটিকে টিকিয়ে

রাখতে গিয়ে এর কর্মকর্তারা যে পরিমাণ হত্যা এবং গুপ্তহত্যা করেছেন, তা ইউরোপের যেকোনো রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। অনেক সময়ই তারা এসব পরিকল্পনা এবং এগুলোর বাস্তবায়ন করেছেন বেসামরিক জনগণের ক্ষয়ক্ষতির তোয়াক্কা না করেই।

তবে বার্গম্যান এটাও উল্লেখ করেন, সব সময়ই যে তাদের কর্মকর্তারা একচেটিয়াভাবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন না। তাদের মধ্যে অনেক সময়ই অভ্যন্তরীণ বিতর্ক ছিল যে, তারা ঠিক কতটুকু কঠোর হবেন? রাষ্ট্রীয়ভাবে কতটুকু সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড চালাবেন? এই প্রক্রিয়ায় কতটুকু পর্যন্ত বেসামরিক জনগণের ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করবেন? ঠিক কোথায় তারা তাদের সীমারেখা টানবেন?

১৯৫৯ সালে তরুণ ইয়াসির আরাফাত যখন আল-ফাতাহ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন প্রথমে ইসরাঈল তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ফাতাহ যখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে, তখন মোসাদের ইউরোপ শাখার প্রধান রাফি এইতান (আইডিএফ প্রধান রাফায়েল এইতান না, ভিন্ন ব্যক্তি) সর্বপ্রথম মোসাদের পরিচালক মেইর আমিতকে পরামর্শ দেন সিজারিয়াকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য, যেন তারা আরাফাতকে হত্যা করে।

ইয়াসির আরাফাত বামপন্থি ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সে সময় পূর্ব জার্মানির সাথে তার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। এইতান তখন অমিতকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তারা খুব সহজেই আরাফাতের জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করতে পারবেন। অমিত সে সময় এই প্রস্তাবে রাজি হননি। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশক ধরে মোসাদসহ ইসরায়েলি বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানরা অনেকেই আরাফাতকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই নেতাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়াটা ছিল ইসরায়েলের স্থিতিশীলতার জন্য খুবই জরুরি।

১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে যখন পূর্ব জেরুজালেম এবং পশ্চিম তীরে ইসরায়েলিদের ওপর গেরিলা

আক্রমণ চলছিল, তখন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ইসরায়েলি সেনারা আরাফাতের বাসায় হানা দিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মাত্র কয়েক মিনিট আগেই তাদের আগমন টের পেয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন আরাফাত। ইসরায়েলি সৈন্যরা যখন তার বাসায় প্রবেশ করে, তখনও টেবিলের ওপর থাকা তার খাবারগুলো থেকে গরম ধোঁয়া উড়ছিল।

আরাফাতকে হত্যাচেষ্টার সবগুলো অভিযান কিন্তু এত সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ছিল না। ১৯৬৮ সালে ইসরায়েলের গোয়েন্দা বাহিনী তিন মাস ধরে এক ফিলিস্তিনি বন্দিকে ব্রেইন ওয়াশ করে তাকে দিয়ে ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করানোর প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। কিন্তু তাকে ছেড়ে দেওয়ার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সে অস্ত্রসহ স্থানীয় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ইসরায়েলের গোয়েন্দা বাহিনীর এই প্রকল্পের কথা ফাঁস করে দেয়।

এসব ঘটনায় ইয়াসির আরাফাতের জনপ্রিয়তা উল্টো আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু ফিলিস্তিন না, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রেও তার সমর্থন এবং গ্রহণযোগ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্ব জার্মানির নেতা এরিখ হনেকার তাকে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মতোই বিপ্লবী হিসেবে সম্মান করতেন। তার গোয়েন্দা বাহিনী আরাফাতকে নিয়মিত গোপন তথ্য এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করত। এমনকি সিআইএ-ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোপনে ভিন্ন পরিচয়ে আরাফাতকে সাহায্য করত। এসব কারণে ইয়াসির আরাফাত ধীরে ধীরে ইসরায়েলিদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে থাকেন। তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা ইসরায়েলের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে।

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুন গতিপথ লাভ করে ১৯৮১ সালে, যখন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নেন এরিয়েন শ্যারন। দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তিনি ইয়াসির আরাফাতকে ইসরায়েলের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং নতুন করে তাকে হত্যার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। তার নির্দেশে ইসরাঈল আয়োজন করে ভয়ংকর এক অভিযান 'অপারেশন অলিম্পিয়া', যা সফল হলে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস হতো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারি পিএলও লেবাননের বৈরুত স্টেডিয়ামে তাদের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছিল। সে অনুষ্ঠানে ইয়াসির আরাফাতসহ পিএলও এবং ফাতাহ'র প্রধান প্রধান নেতারা উপস্থিত থাকার কথা ছিল। ইসরাঈল পরিকল্পনা করে, সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চের নিচে শক্তিশালী বোমা স্থাপন করে ফিলিস্তিনের সব নেতাকে একসাথে নির্মূল করে ফেলা হবে।

পরিকল্পনা ঠিকভাবেই এগোচ্ছিল। এমনকি মঞ্চের নিচে বোমাও স্থাপন করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ইসরায়েলের ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ আমানের একদল কর্মকর্তাসহ প্রধানমন্ত্রী বেগিনের সাথে গিয়ে দেখা করেন এবং তাকে বোঝান যে, এরকম ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটালে পুরো বিশ্ব একসাথে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। ফলে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে শ্যারনের এই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।

ভয়ংকর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও শ্যারন সেখানেই থেমে থাকেননি। ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করার জন্য তিনি গঠন করেন নতুন একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, যার নাম 'সল্ট ফিশ'। এর দায়িত্ব দেন তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং বিশেষ অভিযানে বিশেষজ্ঞ দুই কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ইউজি দাগান এবং মোসাদের সাবেক ইউরোপীয় প্রধান রাফি এইতানকে। আমানের সাহায্যে তারা আরাফাতের অবস্থান জানার জন্য বৈরুতের টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলোতে আড়িপাতা যন্ত্র স্থাপন করেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল, আরাফাতের অবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে সেখানে বিমান হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করা হবে।

কিন্তু ইয়াসির আরাফাত ততদিনে বেশ সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, যেসব বাড়িতে তিনি কিছুক্ষণ আগেই ছিলেন, অথবা কিছুক্ষণ পরেই যেসব বাড়িতে তার যাওয়ার কথা ছিল, সেগুলোতে একের পর বিমান হামলা আর যা-ই হোক, কাকতালীয় হতে পারে না। কাজেই তিনি কোনো নিয়মিত সময়সূচি অনুসরণ করা বন্ধ করে দিলেন।

তার থাকার কোনো নির্দিষ্ট স্থান রইল না, হঠাৎ করেই তিনি কোনো স্থানে হাজির হতেন, আবার হঠাৎ করেই সেখান থেকে চলে যেতেন।

১৯৮২ সালের জুলাই মাসে 'সল্ট ফিশ' আরাফাতকে হত্যার নতুন একটি পরিকল্পনা করল। সেসময় ইসরায়েলের একটি বামপন্থি পত্রিকার সম্পাদক ইউরি আভনারি বৈরুতে গিয়ে ইয়াসির আরাফাতের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আয়োজন করছিলেন। ইসরায়েলের বামপন্থিদের অনেকে শুরু থেকেই ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, কাজেই আরাফাত এই সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হলেন। ইসরাঈল জুড়ে এ সাক্ষাৎকারের উদ্যোগটি প্রচণ্ড সমালোচনার শিকার হচ্ছিল, কিন্তু সল্ট ফিশ সিদ্ধান্ত নিল, তারা সাক্ষাৎকারে বাধা না দিয়ে বরং এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আরাফাতকে হত্যার চেষ্টা করবে।

জুলাই মাসের তিন তারিখে ইউরি আভনারি তার এক রিপোর্টার এবং এক ফটোগ্রাফারসহ ইসরায়েলের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বৈরুতে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাদের অজান্তেই তাদেরকে অনুসরণ করে বৈরুতে ঢুকে যায় সল্ট ফিশের একদল গুপ্তঘাতক। ইয়াসির আরাফাত অবশ্য অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, মোসাদ তাকে হত্যা করার এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না। কাজেই তার সহকারীরা সাংবাদিকদেরকে নিয়ে বৈরুতের অলিগলিতে ঘুরতে ঘুরতে শেষপর্যন্ত যখন নিশ্চিত হন যে, তারা অনুসরণকারীদেরকে খসিয়ে দিতে পেরেছেন, তখনই কেবল তারা আরাফাতের আস্তানায় যান। ফলে কোনো রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়াই সেবার সাংবাদিকরা আরাফাতের সাক্ষাৎকার নিয়ে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

যত দিন যেতে থাকে, এরিয়েন শ্যারন এবং আইডিএফ প্রধান রাফায়েল এইতান আরাফাতকে হত্যা করার জন্য সল্ট ফিশ এবং ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর ওপর তত বেশি চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। বারবার ব্যর্থ হওয়ায় শ্যারনের জন্য আরাফাতকে হত্যা করাটা অনেকটা ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি একের পর এক ভয়ংকর পরিকল্পনা করতে থাকেন, যেগুলোতে বেসামরিক জনগণেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে আরাফাত রক্ষা পেয়ে যান প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, তার অবিশ্বাস্য রকমের সৌভাগ্য। আর দ্বিতীয়ত, ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর প্রধান ডেভিড ইভরি এবং সল্ট ফিশের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ইউজি দাগানের সতর্ক এবং সুবিবেচক সিদ্ধান্ত।

আইডিএফ প্রধান রাফায়েল এইতান বুঝতে পারছিলেন, ইয়াসির আরাফাতের অবস্থান জানা সত্ত্বেও এবং তার ও শ্যারনের পরিষ্কার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যেসব স্থানে ব্যাপক প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল, সেসব স্থানে ইভরি এবং দায়ান ইচ্ছে করেই আক্রমণ করছিলেন না। বরং তারা অযুহাত দেখাচ্ছিলেন যে, ইন্টালিজেন্স রিপোর্ট যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য না। কাজেই আগস্টের ৪ তারিখে যখন এইতানের কাছে বৈরুতের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি বাড়িতে আরাফাতের সম্ভাব্য একটা মিটিংয়ের তথ্য এল, তিনি দায়ান এবং ইভরিকে না জানিয়ে সরাসরি বিমান বাহিনীর অপারেশন্স বিভাগের প্রধান এভিয়েম সেলার কাছে গেলেন।

এভিয়েম সেলাকে নিয়ে এইতান একটি এফ-৪ ফাইটার জেটে চড়ে বসলেন। সেলা যখন জানতে চাইলেন তারা কোথায় যাচ্ছেন, এইতান সোজাসুজি উত্তর দিলেন, "আমরা বৈরুতে বিমান হামলা করতে যাচ্ছি।" সেলা চমকে উঠলেন, কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। তারা উড়ে চললেন পশ্চিম বৈরুতের একটি অফিস ব্লকের উদ্দেশ্যে, যেখানে সল্ট ফিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ইয়াসির আরাফাতের একটি মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট বিল্ডিংটির ওপরে পৌঁছে এইতান পরপর দুটি বোমা নিক্ষেপ করেন। কিছুক্ষণ পর ঘুরে এসে তিনি আরো একটি বোমা নিক্ষেপ করেন বিল্ডিংটির ধ্বংস নিশ্চিত করার জন্য, এরপর খুশি মনে ফিরে চলে গেলেন। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য, সেদিনও ইয়াসির আরাফাত নির্ধারিত সময়ে মিটিংয়ে হাজির না হওয়ায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

ততদিনে শ্যারন বুঝতে পেরেছিলেন, আরাফাতকে প্রকাশ্যে হত্যা করা খুব একটা সহজ হবে না, তা ছাড়া প্রকাশ্যে হত্যা করলে আরাফাত ফিলিস্তিন এবং বিশ্ববাসীর কাছে শহিদের মর্যাদা পেয়ে যাবেন। তাই শ্যারন সিদ্ধান্ত নিলেন, আরাফাতকে এমনভাবে হত্যা করতে হবে, যেন

সেটাকে দুর্ঘটনা বলে মনে হয়। অপারেশন সল্ট ফিশের কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনলেন তিনি। এর নামও পরিবর্তন করে নতুন নাম দিলেন অপারেশন 'গোল্ডফিশ'। কিন্তু তাদের প্রধান লক্ষ্য একটাই রয়ে গেল- ইয়াসির আরাফাত।

এরকম সময়ই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, আরাফাতকে হত্যা করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হবে গভীর সমুদ্রের ওপর তার প্লেন মিসাইল দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া। তারা ভূমধ্যসাগরের ওপর একটি নির্দিষ্ট এলাকাও বাছাই করে ফেললেন, যা কোনো রাডারের আওতাভুক্ত না, কিন্তু যার ওপর দিয়ে বাণিজ্যিক বিমান নিয়মিত যাতায়াত করে। ফলে সেখানে যদি মিসাইলের মাধ্যমে হামলা করা হয়, তার কোনো প্রমাণ থাকবে না। তা ছাড়া ওই স্থানের সমুদ্রের গভীরতাও এত বেশি ছিল যে, ধ্বংসস্তুপ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হবে, ফলে বিমান বিধ্বস্ত হলেও সেটা সন্ত্রাসী হামলা ছিল, নাকি নিছকই দুর্ঘটনা, সেটা কেউ কখনও জানতে পারবে না।

গভীর সমুদ্রের বুকে অপারেশনের পরিকল্পনা হওয়ায় ইসরায়েলি বিমান বাহিনীকে সেসময় একটি বোয়িং ৭০৭ বিমানের মধ্যে রাডার স্থাপন করে সমুদ্রের ওপর অস্থায়ী উড়ন্ত কমান্ড পোস্ট সৃষ্টি করতে হয়েছিল, দায়িত্ব ছিল সেই কমান্ড সেন্টারের মধ্য থেকে অপারেশন পরিচালনা করা। আর শ্যারনের নির্দেশে চারটি এফ-১৬ এবং এফ-১৫ ফাইটার জেটকে সদা প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, যেন নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই তারা উড়ে গিয়ে আক্রমণ করতে পারে। ১৯৮২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত নয় সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী এই অপারেশনের আওতায় অন্তত পাঁচটি প্লেন ধ্বংস করার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে অপারেশনগুলো বাতিল করা হয়েছিল।

অপারেশনগুলো বাতিলের পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী আমানের গবেষণা বিভাগের পরিচালক আমোস গিলবোয়া। কারণ, তার দায়িত্ব ছিল যেকোনো

অপারেশনের পর তার রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক ফলাফল কী হতে পারে, তা বিশ্লেষণ করা। তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী প্লেন ধ্বংস করার মতো এ ধরনের অধিকাংশ পরিকল্পনাই যদি সফল হতো, তাহলে শেষ পর্যন্ত তা ইসরায়েলের জন্য ক্ষতিকর হতো।

এরিয়েল শ্যারন এবং রাফায়েল এইতান ছিলেন ইয়াসির আরাফাতকে হত্যার ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু অন্য সবাই তাদের সাথে সব বিষয়ে একমত ছিলেন না। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তারা কখনো রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল করে যোগাযোগে ব্যাঘাত ঘটিয়ে, কখনো ভুল তথ্য দিয়ে, কখনো প্লেন খুঁজে না পাওয়ার অযুহাত দেখিয়ে হামলাগুলো ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। বেশিদিন হয়তো তাদের পক্ষে এরকম করা সম্ভব হতো না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ততদিনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ইসরায়েলি জনগণও এরিয়েন শ্যারনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

আন্তর্জাতিক সমালোচনায় এবং জনগণের চাপে বৈরুত শরণার্থী শিবিরে সংঘটিত বর্বর হত্যাকাণ্ডে এরিয়েন শ্যারনের ভূমিকা তদন্ত করার জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়েছিলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেগিন। যদিও কমিশন খ্রিষ্টানদেরকেই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে, কিন্তু তারা এটাও উল্লেখ করে যে, শ্যারনই তাদেরকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। ফলে শেষপর্যন্ত শ্যারনকে পদত্যাগ করতে হয়। এবং ইসরায়েলিরাও ধীরে ধীরে এটা মেনে নেয় যে, ইয়াসির আরাফাত একজন আন্তর্জাতিক নেতা, যাকে হত্যা করার মাধ্যমে ফিলিস্তিন সংকটের কোনো স্থায়ী সমাধান অর্জিত হবে না।

শ্যারনের সাথে আরাফাতের দ্বন্দ্ব অবশ্য সেখানেই শেষ হয়নি। ২০০১ সালে শ্যারন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রথম দিকে যদিও বুশ প্রশাসনের সাথে সমোঝতায় এসে শ্যারন অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ স্থগিত করেন এবং আরাফাতকে হত্যার লক্ষ্য থেকে সরে আসেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আবারও তার পুরনো নীতিতেই ফিরে যান। ২০০৪ সালের ২২শে মার্চ অবরুদ্ধ গাজাতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী

হেলিকপ্টারের গানশিপ থেকে গুলি করে হত্যা করে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সংগঠন হামাসের প্রধান শেখ আহমেদ ইয়াসিনকে।

এর পর পরই এপ্রিলের ২৩ তারিখে সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এরিয়েন শ্যারন জানান, বুশ প্রশাসনের সাথে তার পুরনো সমঝোতা অনুযায়ী চলতে তিনি বাধ্য নন। সেই অঙ্গীকার এখন আর কার্যকর না। সাংবাদিকরা যখন তাকে আবার জিজ্ঞেস করে, এর অর্থ কি তিনি প্রয়োজনে ইয়াসির আরাফাতের ওপরেও আক্রমণ করবেন? উত্তরে শ্যারন বলেন, "আমি মনে করি না, ব্যাপারটি এর চেয়ে আর পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।"

শ্যারনের নীতির এই পরিবর্তনের কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ-সবল ইয়াসির আরাফাতের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। এককালের দুর্ধর্ষ গেরিলা নেতা ইয়াসির আরাফাত, যিনি অসংখ্যবার বিশ্বের অন্যতম দক্ষ গোয়েন্দাবাহিনীর হত্যাচেষ্টাকে ফাঁকি দিয়েছেন, হঠাৎ করেই রহস্যজনকভাবে অসুস্থ হয়ে স্ট্রোক করেন। ১১ই নভেম্বর, ২০০৪ সালে ফ্রান্সের একটি হাসপাতালে মৃত্যু ঘটে তার। তার শরীরে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় বিষাক্ত পদার্থ পোলোনিয়ামের অস্তিত্ব ছিল কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আজও শেষ হয়নি। শেষপর্যন্ত ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পেছনে কি এরিয়েন শ্যারনই দায়ী ছিলেন? সে রহস্যের হয়তো কোনো দিনই সমাধান হবে না।

ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের নেতা ইয়াসির আরাফাত কী মোসাদ বা সিআইএ'র হয়ে কাজ করেছেন? এমন প্রশ্ন প্রচলিত আছে। ইসরাঈলকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে ইয়াসির আরাফাতকে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করেছে সিআইএ। এজন্য বৃদ্ধ বয়সে এক খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইয়াসির আরাফাতের সাথে। বিয়ের পর তিনি ইসরাঈল প্রশ্নে অনেক নমনীয় ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি হয়েছিল ফিলিস্তিন ও ইসরাঈলের মধ্যে। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তাকে। জাতীয়তাবাদী নেতা ইয়াসির আরাফাতকে নমনীয় হতে মোসাদ সিআইএ'র সহায়তা নিয়েছে। তার মৃত্যুকে অনেকে হত্যাকাণ্ড বলছেন।

১৮. অপারেশন এন্টাবে :
ইতিহাসের দুর্ধর্ষ এক কমান্ডো অভিযান

মিশরের শার্ম আল শেখ থেকে রাতের আঁধারে, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে একত্রে আকাশে উড়লো চারটি সি-১৩০ হারকিউলিস বিমান। তাদের পেছন পেছন আকাশে উড়লো আরো দুটি বোয়িং-৭০৭ বিমান, যাদের একটির মধ্যে ছিল চিকিৎসা সামগ্রী আর অপরটিতে ছিলেন অপারেশনের সেনাপতি জেনারেল ইয়েকুতেই অ্যাডাম। বিমানগুলো লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে আন্তর্জাতিক আকাশসীমার মধ্য দিয়ে উড়ে চললো। তবুও মিসরীয়, সুদানিজ কিংবা সৌদি আরবের বিমান বাহিনীর রাডারে ধরা পড়লো না। কারণ রাডারের শনাক্তকরণ এড়াতে সেগুলো উড়েছিল সমুদ্রপৃষ্ঠের মাত্র ১০০ ফুট ওপর দিয়ে!

আন্তর্জাতিক সময়ে তখন রাত এগারোটা বাজে। একটি সি-১৩০ অবতরণ করল উগান্ডার এন্টাবে বিমানবন্দরে। চিকিৎসাসামগ্রী বহনকারী বিমানটি জ্বালানির জন্য অবতরণ করে কেনিয়ার নাইরোবি বিমানবন্দরে। একে পাহারা দিচ্ছিল অপর তিনটি হারকিউলিস বিমান, যেগুলোর মধ্যে ছিল কমান্ডো সৈন্যদের কয়েকটি ইউনিট। আর জেনারেল অ্যাডামের বিমানটি এন্টাবে এয়ারপোর্টের ওপরে আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল পুরো অপারেশন নজরদারি করতে। এদিকে কার্গো বিমানটির পেছন দিকের বিশাল দরজাটি অবতরণের আগেই খোলা হয়। কোনো রকম কালক্ষেপণ না করেই কার্গো থেকে নেমে আসে একটি সুদৃশ্য কালো মার্সিডিজ গাড়ি। গাড়িটি ঠিক উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইদি আমিনের গাড়ির মতোই! একই সময়ে এই গাড়ির সাথে যোগ দেয় আরো চারটি ল্যান্ড রোভার। গাড়িবহর ধীরে ধীরে এগোতে থাকে এন্টাবে বিমানবন্দরের পুরোনো টার্মিনালের দিকে, ঠিক যেভাবে ইদি আমিনের গাড়ি বহর এগোয় সেভাবে। তবে এই বহর প্রেসিডেন্টের গাড়িবহর ছিল না। গাড়িতে ছিল একদল ইসরায়েলি প্যারাকমান্ডো, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বড় ভাই ইয়োনাথান নেতানিয়াহু।

CamScanner

প্রেসিডেন্টের গাড়িবহর দেখলে টার্মিনালের সিকিউরিটি গার্ডরা সহজেই ছেড়ে দেবে, এটাই তো হবার কথা। কিন্তু গার্ডদের স্পষ্ট মনে আছে যে, কিছুদিন আগেই ইদি আমিন একটি সাদা মার্সিডিজ ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। তাই কালো দেখেই সন্দেহ হলো। কিন্তু গাড়ি সার্চ করার আগেই সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার থেকে গুলি করে নিঃশব্দে হত্যা করা হলো দুজন গার্ডকে। গাড়িবহর কোনো বিপত্তি ছাড়াই পুরনো টার্মিনালের দিকে এগোয়, যেখানে রয়েছে জিম্মিরা। আক্রমণের পরিকল্পনা পূর্বনির্ধারিত। কোনো রকম ভুলের অবকাশ নেই। একটু এদিক-ওদিক হলেই মারা পড়তে পারে একাধিক জিম্মি। তাই কমান্ডোরা সবধরনের সতর্কতা অবলম্বন করলেন। অন্যদিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা গাড়িবহরের কথা টেরও পায়নি হাইজ্যাকাররা। তার জানতো না যে খুব শীঘ্রই তারা মারা পড়তে যাচ্ছে।

গাড়িবহর টার্মিনালের কাছে পৌঁছামাত্র প্যারাকমান্ডোরা গাড়ি থেকে দ্রুত বাইরে নেমে আসে এবং ঝড়ের বেগে টার্মিনালের মেইন হলের দিকে এগিয়ে যায় যেখানে জিম্মিরা ছিল। মেইন হলে গিয়েই তারা মাইকে ইংরেজি এবং হিব্রুতে জিম্মিদেরকে মাটিতে শুয়ে পড়ার আহ্বান জানায় এবং নিজেদের পরিচয় দিয়ে আশ্বস্ত করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক ফরাসি যুবক ইংরেজি বা হিব্রু কোনোটিই জানতো না এবং হুট করে দাঁড়িয়ে যায়। কমান্ডোরা তাকে হাইজ্যাকার মনে করে মুহূর্তে গুলি করে হত্যা করে। এরই মাঝে অপহরণকারীদের একজন, উইলফ্রেড বোস মেইন হলে প্রবেশ করে এবং কমান্ডোদের দিকে গুলি চালায়। কমান্ডোরা পাল্টা গুলি করে বোসকে হত্যা করে। শ্বাসরুদ্ধকর গোলাগুলি চলে ত্রিশ মিনিট যাবত। মেইন হলে চারজনকে হত্যা করে পাশের কামরায় থাকা বাকি তিন সন্ত্রাসীকেও গুলি করে হত্যা করে কমান্ডোরা। গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে দিশেহারা হয়ে একজন জিম্মি দৌড়ে টার্মিনালের বাইরে বেরোতে গেলে হাইজ্যাকারদের গুলিতে নিহত হয়। আহত হয় আরো এক জিম্মি। আর এরই সাথে সফলভাবে শেষ হয় অপারেশন 'রেইড অন এন্টাবে'। ১০২ জন বন্দিকে অক্ষত শরীরে উদ্ধার করা হয়।

একটু পিছনে ফেরা যাক। ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইহুদিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তারা ড. ওয়াইজম্যানের নেতৃত্বে লন্ডনে কাজ শুরু করে দেয়। ওয়াইজম্যান ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা, রথশিল্ড পরিবার ও লয়েড জর্জের সমর্থনে লর্ড বেলফুরের সহানুভূতি লাভ করেন। ইহুদিরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের পর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আবাসভূমি স্থাপনের ব্যাপারে মিত্রপক্ষের অঙ্গীকার চাচ্ছিল। ব্রিটেন প্রথমে তাদের উগান্ডায় বসতি স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তারা ফিলিস্তিন ছাড়া অন্য কোথাও যেতে অস্বীকৃতি জানায়। ইতোমধ্যে ড. ওয়াইজম্যান কৃত্রিম উপায়ে এসেটিলিন আবিষ্কার করে ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অবদান রাখেন। ব্রিটেন যখন বুঝতে পারে যে, ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিতব্য ইহুদি আবাসভূমি সুয়েজ খালের পাশে অবস্থিত হবে বলে এর ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ব্রিটেনের প্রভাব বলয়ে থাকবে তখন পররাষ্ট্র সচিব লর্ড বেলফুর আশ্বস্ত হন। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বেলফুর ঘোষণার মাধ্যমে ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইহুদিরা শুরু করে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। এই চেষ্টারই সামান্য কিছু অংশ এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। আধিপত্য বিস্তারের অংশ হিসেবে বর্তমানে তারা ব্রিটেনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে বেশি বন্ধু বলে মনে করে। মোসাদের কার্যক্রম যেখানে সরাসরি পরিচালনা করা সম্ভব নয়, সেখানে তারা সিআইএ'র মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। সিআইএ মোসাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে চাইলেও খুব কমই যেতে পেরেছে। তারাও মোসাদের কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বিশ্বের প্রভাবশালী পত্রিকা ও নিউজ এজেন্সি ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় মোসাদের অপকর্ম সাধারণত গণমাধ্যমে আসে না।

তবে নাটকের শেষটা তখনও বাকি! ঘটনার সূত্রপাত ইতিহাসের বৃহত্তম বিমান ছিনতাই থেকে। ১৯৭৬ সালের ২৭ জুন ইসরায়েলের তেলআবিব বিমানবন্দর থেকে ২৪৬ জন যাত্রী ও ১২ জন ক্রু নিয়ে উড্ডয়ন করে 'এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট-১৩৯'। যাত্রাপথে গ্রীসের এথেন্স বিমানবন্দর থেকে

আরো ৫৮ জন যাত্রী তোলে বিমানটি। এথেন্স থেকে রওনা হয় প্যারিসের উদ্দেশে। কিন্তু এই ৫৮ জনের মাঝে দুর্ভাগ্যক্রমে চারজন হাইজ্যাকার ছিল। এদের দুজন 'পপুলার ফ্রন্ট ফর লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন'এর সদস্য। অন্য দুজন জার্মানির গেরিলা সংগঠন 'রেভ্যুলশনারি সেলস' এর গেরিলা যোদ্ধা উইলফ্রিড বোস এবং ব্রিজিত কুলমান। উড্ডয়নের মাত্র ১৫ মিনিটের মাথায় হাইজ্যাকাররা বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং প্যারিসের বদলে লিবিয়ার বেনগাজিতে চলে যায়। সেখানে জ্বালানি সরবরাহের পর পুনরায় আকাশে উড়ে ফ্লাইট-১৩৯ এবং ২৮ জুন উগান্ডার এন্টাবেতে গিয়ে পৌঁছে।

এন্টাবেতে উগান্ডান বাহিনী হাইজ্যাকারদের সহায়তা করে। আরো তিনজন হাইজ্যাকারের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষারত ছিল সেখানে। তারা জিম্মিদের এন্টাবে বিমানবন্দরের পরিত্যক্ত টার্মিনাল ভবনে সরিয়ে নেয় এবং সেখানে প্রহরায় রাখে। ইদি আমিন তখন প্রতিদিনই একবার এসে হাইজ্যাকারদের সাথে দেখা করে যেতেন। সেদিনই সন্ধ্যায় তারা বন্দিদের মুক্তির দুটি শর্ত উপস্থাপন করে।

১. ফ্লাইট-১৩৯ বিমানের জন্য পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মুক্তিপণ।

২. ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি ৪০ জন সহ মোট ৫৩ জন বন্দির মুক্তি।

১ জুলাইয়ের মধ্যে শর্ত পূরণ না হলে জিম্মিদের হত্যা করা শুরু হবে। এই বিমান অপহরণ এবং জিম্মির ঘটনায় বিশ্ব রাজনীতি ততদিনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ইউরোপিয়ান দেশগুলো ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও আরব দেশগুলো ছিল নিশ্চুপ। এরই মাঝে এই শর্তগুলো প্রকাশিত হলে দ্রুত দর কষাকষি শুরু করে ইসরায়েলি মন্ত্রীসভা। তবে অপহরণের ৪৮ ঘণ্টা পর, ৩০ জুন ঠিক ৪৮ জন জিম্মিকে মুক্তি দেয় অপহরণকারীরা। এই ৪৮ জনের কেউই ইসরায়েলি কিংবা ইহুদি ছিল না। এদিকে পহেলা জুলাই চলে আসলেও ইসরায়েলি মন্ত্রীসভা কোনো নীতিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি। তারা তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের মাধ্যমে ইদি আমিনের সাথে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা

করেন। তাতেও কাজ না হলে ইসরাঈল সরকার ১ জুলাই অতিরিক্ত সময়ের আবেদন করে অপহরণকারীদের নিকট। অপহরণকারীরা ইদি আমিনের অনুরোধে এই সময় ৪ জুলাই বিকাল পর্যন্ত বর্ধিত করে এবং একইসাথে আরো ১০০ অ-ইসরায়েলিকে মুক্তি প্রদান করে। এই ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জনকে সেদিনই প্যারিস নিয়ে যাওয়া হয়। ডোরা ব্লুচ নামক একজন ব্রিটিশ ইহুদিকে অসুস্থতার জন্য প্যারিস না পাঠিয়ে কাম্পালার এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১ জুলাই ইসরায়েলের বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর বের হয় যে মন্ত্রিসভা বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। এই গুজবের সত্যতা যদিও জানা যায় না, তবে সিনেমার দুর্দান্ত সব সেনা অভিযানের মতোই এক দুঃসাহসিক উদ্ধার অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয় মোসাদ।

হ্যাঁ, পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা মন্ত্রিসভাকে আশ্বস্ত করে যে, তারা জিম্মিদের মুক্ত করে নিয়ে আসতে নিখুঁত এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। তাদের পরিকল্পনায় ১০০ জন প্যারাকমান্ডো যোগ দেবে ইতিহাসের অন্যতম দুঃসাহসিক উদ্ধার অভিযানে।

অভিযানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি বিষয়, তা হচ্ছে বন্দিদের সঠিক অবস্থান এবং হাইজ্যাকারদের নির্ভুল সংখ্যা। এক্ষেত্রে মোসাদ তাদের অবিশ্বাস্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। তারা টার্মিনাল ভবনের নকশা উপস্থিত করে এবং হাইজ্যাকারদের সংখ্যা নিশ্চিত করে। এ দুটো নিশ্চিত হবার পর বাকি কাজটা কমান্ডোদের জন্য সহজ হয়ে যায়। চারটি সি-১৩০ কার্গো বিমান এবং দুটি বোয়িং-৭০৭ বিমান নেওয়া হয়। মোট ১০০ জন কমান্ডো সদস্য এন্টাবেতে গেলেও তাদের মধ্যে ২৯ জনের একটি অ্যাসাল্ট ইউনিটই মূল অপারেশন পরিচালনা করে। এই ইউনিটের নেতৃত্বে ছিলেন ইয়োনাতান নেতানিয়াহু। উগান্ডান বাহিনীর আক্রমণ থেকে এই ইউনিটকে রক্ষা করার জন্য কর্ণেল মাতান, কর্ণেল উরি এবং মেজর শলের নেতৃত্বে আরো তিনটি ইউনিট উপস্থিত ছিল এন্টাবেতে। তা ছাড়া আকাশে এন্টাবেকে প্রদক্ষিণ করতে থাকা একটি বোয়িং এ জেনারেল অ্যাডাম ছাড়াও ছিলেন

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড্যান শরমন, যিনি এই পুরো অভিযানের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

অপারেশন সফল হলে কমান্ডোরা দ্রুত জিম্মিদের বিমানে তুলতে থাকে। এ সময় তারা উগান্ডার বেশ কিছু মিগ বিমান ধ্বংস করে দেয়, যেন উগান্ডান বিমান বাহিনী তাদের পিছু নিতে না পারে। তবে জিম্মিদের বিমানে তোলা শেষ হবার আগেই তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে উগান্ডার সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য। শুরু হয় দ্বিতীয় দফায় গোলাগুলি। এবার আগেরবারের চেয়ে আরো কম সময় গোলাগুলি চলে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বেশি। ৪৫ জন উগান্ডান সেনা সদস্য মারা যায়। কমান্ডোদের অ্যাসাল্ট ইউনিটের প্রধান ইয়োনাথান নেতানিয়াহু মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আহত হয় আরো পাঁচ কমান্ডো সদস্য। সবাইকে বিমানে ওঠানো শেষ হলে কমান্ডোরা এন্টাবে ছেড়ে ইসরায়েলের উদ্দেশে যাত্রা করে।

এই অভিযানে ক্ষিপ্ত হয়ে উগান্ডান কয়েকজন সেনা সদস্য কাম্পালায় থাকা সেই ব্রিটিশ ইহুদি ডোরাহ ব্লচকে হত্যা করে।

পাঁচদিন পর, ৯ জুলাই, ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠক বসে। সেখানে ইসরাঈলকে নিজেদের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘনকারী বলে অভিহিত করেন উগান্ডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওরিস আবদুল্লাহ। তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইমও এই ঘটনাকে একটি সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন বলে ঘোষণা দেন। লিবিয়া, বেনিন, তানজানিয়া, মিসর এই অভিযানের সমালোচনা করে। ইউরোপীয় দেশগুলো অন্যদিকে এই অভিযানকে প্রয়োজনীয়তা বলে উল্লেখ করে।

অপারেশন 'রেইড অন এন্টাবে'র যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির তালিকা-

১. তিনজন জিম্মি মারা যায় এবং আহত হয় ১০ জন।

২. হাইজ্যাকারদের সাতজনই মারা যায়।

৩. কমান্ডো বাহিনীর একজন মারা যায়, পাঁচজন আহত হয়।

CamScanner

৪. ৪৫ জন উগান্ডান সেনা সদস্য মারা যায়, ধ্বংস হয় ৩০টি সোভিয়েত নির্মিত মিগ বিমান।

ক্ষয়ক্ষতি আর তাৎক্ষণিক বিশ্ব জনমত, সবকিছু ইসরায়েলের পক্ষেই ছিল। মাঝে হাইজ্যাকারদের সাথে মিত্রতা রাখতে গিয়ে অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় উগান্ডা। তবে সবকিছু বিবেচনা করে এই অপারেশনকে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ধার অপারেশন বলে গৌরবান্বিত করা হয়। তৎকালীন প্রায় সকল শক্তিশালী দেশই এই অভিযানের প্রশংসা করে এবং বিস্ময়ও প্রকাশ করে বটে। আমেরিকান সেনাবাহিনীর কমান্ডো অপারেশন 'অপারেশন ঈগল ক্ল' এই এন্টাবে অপারেশন দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়। তবে ঈগল ক্ল ব্যর্থ হয়েছিল। তথাপি 'রেইড অন এন্টাবে' হাইজ্যাকারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক সাহসী দৃষ্টান্ত হিসেবে যুগে যুগে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

১৯. ৯/১১ কি মোসাদের কাজ?

নাইন ইলেভেনের দায় কার এ বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি। যদিও সিআইএ'র একসময়ের বিশ্বস্ত আরব ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন, তার দল আল কায়েদা ও আফগানিস্তানের মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষকদের সশস্ত্র সংগঠন তালেবানকে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করেছে। আর এর শাস্তি হিসেবে দখল করে নেওয়া হয়েছে ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ দেশ আফগানিস্তান। ইসরাঈল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ২০০১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জেরুজালেম পোস্টের ইন্টারনেট সংস্করণে বলা হয়, হামলাকালীন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে ৪ হাজার ইহুদি কাজ করত। কিন্তু বিমান হামলায় মাত্র একজন নিহত হয়েছে। পরে আরো দুজনের নিহতের কথা বলা হয়। ওই দিন এত বিপুলসংখ্যক ইহুদি কীভাবে নিরাপদে ছিল তার জবাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি বা দেয়নি। অথচ যে সময় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা হয়েছে প্রতিদিন ওই সময়ে অনেক ইহুদি অফিসে উপস্থিত থাকত। ব্যতিক্রম শুধু হামলার দিন। সিআইএ বরাবরই এই হামলায় মোসাদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে আসছে। তবে মোসাদ এই হামলার পরিকল্পনাকারী নয় এর পক্ষে

গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ সিআইএ বা মোসাদ দেয়নি। নাইন ইলেভেন সম্পর্কে লন্ডনের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য ইনডিপেনডেন্টের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সংবাদদাতা রবার্ট ফিস্ক বলেছেন, '৯/১১ সম্পর্কে যে সরকারি ভাষ্য দেওয়া হয়েছে তার সামঞ্জস্যহীনতা নিয়ে আমি ক্রমেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছি। এটা স্পষ্ট নয়, পেন্টাগনে হামলা চালানো বিমানের অংশগুলো (ইঞ্জিন ইত্যাদি) কোথায় গেল? ইউনাইটেড-৯৩ বিমানের (যা পেনসিলভানিয়ায় বিধ্বস্ত হয়েছে) সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মুখ কেন বন্ধ করে দেওয়া হলো? এই বিমানের ধ্বংসাবশেষ কেন কয়েক মাইল দূরে ছড়িয়ে ছিল? একটি মাঠে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এটির তো অখণ্ড থাকার কথা ছিল।"

২০. দেশে দেশে মোসাদ

দক্ষিণ আমেরিকায় মোসাদ : অনেক দিন থেকে নাজি ওয়ারে (নাজি বা নাৎসি ছিল হিটলারের বাহিনীর নাম। এই বাহিনী প্রায় ৬০ লাখ ইহুদি হত্যা করেছিল। এই হত্যাকাণ্ডকেই নাজি ওয়ার বা নাজিদের যুদ্ধ বলা হয়) অভিযুক্ত এডল্ফ ইচম্যানকে খুঁজছিল মোসাদ। ১৯৬০ সালে আর্জেন্টিনায় তার খোঁজ পাওয়া যায়। ওই বছরের ১১ মে মোসাদের এজেন্টদের একটি টিম তাকে গোপনে আটক করে ইসরাঈল নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে উত্তর ইউরোপে ক্যাম্প গঠন ও পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ইহুদিদের হত্যার অভিযোগ আনা হয়। ইসরাঈলের আদালতে একটি সাজানো বিচারের মাধ্যমে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। একই অভিযোগে জোসফ মেনজেলকে আটকের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৫ সালে নাজি ওয়ারে অভিযুক্ত লাটভিয়ার বৈমানিক হার্বার্টস কুকার্সকে উরুগুয়ে থেকে ফ্রান্স হয়ে ব্রাজিল যাওয়ার পথে মোসাদের এজেন্টরা হত্যা করে। ১৯৭৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও কূটনৈতিক এবং চিলির সাবেক মন্ত্রী অরল্যান্ডো লেটেলারকে ওয়াশিংটন ডিসিতে গাড়িবোমায় হত্যা করে চিলির ডিআইএনএ'র এজেন্টরা। পরবর্তী সময়ে জানা যায়, এটি ছিল মোসাদের একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তার সাথে তার সহকারী রনি কার্পেন মোফিট্টও খুন হন। রনি কার্পেন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

পশ্চিম ইউরোপে মোসাদ :

১৯৬০ সালে ফ্রান্সের মিরেজ ফাইভ জেড বিমানের প্রযুক্তিগত দিকের বিভিন্ন দলিল চুরি করে নেয় মোসাদ। পরে ইসরাঈল ওই প্রযুক্তিকে আরো উন্নত ও যেকোনো আবহাওয়ার উপযোগী করে জে-৭৯ নামের ইলেক্ট্রিক টার্বোজেট ইঞ্জিন তৈরি করে। ফ্রান্স শিপইয়ার্ডে পাঁচটি মিসাইল বোট দিতে ফ্রান্সের সাথে চুক্তি করে ইসরাঈল। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ফ্রান্সে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার আগে ইচ্ছাকৃতভাবে মিসাইল বোট সরবরাহ করেনি মোসাদ। ১৯৬৮ সালের একটি ঘটনা। ইসরাঈলের একটি শিপে ২০০ টন ইউরেনিয়াম অক্সাইড সরবরাহ করতে একটি কার্গো বিমান যাত্রা শুরু করেছিল। জার্মানি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিমানটি তাদের রাডারের বাইরে চলে যায়। পরে তুরস্কের একটি পোর্টের রাডারে এটি ধরা পড়লে ওই কার্গো বিমান থেকে বলা হয় পথ হারিয়ে তারা এ দিকে চলে এসেছে ও তাদের জ্বালানি ফুরিয়ে গেছে। গালফ থেকে জ্বালানি নিয়ে তারা আবার ফিরে যাবে। পরে তারা নিরাপদে ওই ইউরেনিয়াম অক্সাইড ইসরাঈলের একটি শিপে খালাস করে। এটি ছিল লেকেম ও মোসাদের একটি যৌথ অপারেশন। এটি অপারেশন 'প্লামব্যাট' নামে পরিচিত। ইউরেনিয়াম অক্সাইড পারমাণবিক বোমার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৭২ সালে মোসাদ জার্মানির বিভিন্ন টার্গেট ব্যক্তির কাছে পত্রবোমা পাঠিয়েছিল। চিঠি খুললেই বোমা ফুটবে ও সে মারা যাবে। অধিকাংশ চিঠিই পাঠানো হয়েছে নাজি যুদ্ধে অভিযুক্ত এলোস বার্নারের কাছে। অবশ্য মোসাদের এ প্রচেষ্টা জানাজানি হয়ে যায় এবং ব্যর্থ হয়।

পূর্ব ইউরোপ :

যুদ্ধে নিঃশেষিত বসনিয়া হার্জেগোভিনিয়ার রাজধানী সারাজেভো থেকে বিমান ও স্থলপথে ইহুদিদের ইসরাঈলে স্থানান্তর করা হয় মোসোদের পরিকল্পনায়।

মিসর ও সিরিয়া :

টার্গেট দেশ মিসরে ওলফগ্যাং লজের নেতৃত্বে গোয়েন্দা মিশন পাঠায় মোসাদ ১৯৫৭ সালে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি মিসরে গামাল আবদেল

নাসেরের সামরিক বাহিনী ও তার যুদ্ধোপকরণ ও কৌশল জানতে গোয়েন্দা তৎপরতায় নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৪ সালে লজের চেয়ে বড় মিশন নিয়ে মিসরে গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু করেন মোসাদের আরেক স্পাই ইলি কৌহেন। তার সহযোগিতায় ছিল হাই প্রোফাইলের বেশ কয়েকজন স্পাই। ইলি কৌহেন ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে সিরিয়ায় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে তথ্য পাঠানোর সময় হাতেনাতে গ্রেফতার হন। মিসর ও সিরিয়ায় মোসাদ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও লিঙ্ক স্থাপন করেছিল। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইসরাঈলের বিপক্ষে ছিল মিসর, জর্দান ও সিরিয়া। এই যুদ্ধটি 'সিক্স-ডে ওয়ার' নামে পরিচিত। যুদ্ধ শেষ হলেও এর রেশ ছিল দীর্ঘ দিন। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই মিসরের ছোট দ্বীপ গ্রিন আয়ারল্যান্ডে ইসরাঈল ডিফেন্স ফোর্স আকস্মিক হামলা চালায়। মোসাদ এই অভিযানের নাম দেয় অপারেশন বালমাস সিক্স। পরবর্তী সময়ে অনেক ইসরাঈলি ইহুদি ও পর্যটকরা সিনাই হতে মিসর আসে অবকাশ যাপনের জন্য। মোসাদ নিয়মিত এসব পর্যটকের নিরাপত্তা দেখভালের জন্য গোয়েন্দা পাঠাত। ধারণা করা হয় এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে লেবানন যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইরান :

ইসরাঈল ইরানকে বড় ধরনের হুমকি মনে করে। মোসাদ মনে করত ২০০৯ সালের মধ্যে ইরান পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হবে। আবার অনেকের ধারণা এই সালটি ছিল ২০১০। মোসাদের ডিরেক্টর মীর দাগান তার এক বক্তৃতায় এ কথা স্বীকারও করেছেন। ফলে মোসাদের তৎপরতা ইরানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সিআইএ এ কাজে মোসাদকে সহযোগিতাও করছে। ২০০৭ সালের ১৫ জানুয়ারি ইরানের পারমাণবিক বিজ্ঞানী ড. আরদেশি হোসেনপুরকে হত্যা করে মোসাদ। মৃত্যুর ছয় দিন পর আল কুদস ডেইলি তার নিহতের খবর প্রচার করে। প্রথম দিকে তিনি গ্যাস বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন বলে ধারণা করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা সে দেশের প্রভাবশালী পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্টের কাছে এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। ওয়াশিংটনের প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা স্ট্রাটফোর হোসেনপুরকে মোসাদের টার্গেট ছিল বলে

উল্লেখ করে। অবশ্য মোসাদ এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। হোসেনপুর ছিলেন ইরানের একজন জুনিয়র সহকারী অধ্যাপক। ২০০৩ সাল থেকে ইরানে মোসাদের হয়ে কাজ করতেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী রেজা আসগারি। তিনি মুহাম্মাদ খাতামি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ইরানের সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাকে সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসাননি।

দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় মোসাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ছাপা হয়। যার শিরোনাম ছিল "যেভাবে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্রের তথ্য চুরি করে ইসরাঈলি গোয়েন্দারা।" টাইমস অব ইন্ডিয়ার বরাত দিয়ে তৈরি প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে। নিচে ফিচারটি তুলে ধরা হলো...

"মোসাদের এজেন্টরা আগে থেকেই জানতো তাদের কী কী করতে হবে এবং এসব কাজে কতক্ষণ সময় লাগবে। পারমাণবিক তথ্য কেন্দ্রটির অ্যালার্ম সিস্টেমগুলো অকেজো করা, অন্তত দুটি বড় দরজা ভাঙা, কয়েক ডজন বড় বড় ভল্টের দরজা ভাঙা এবং অন্তত আধা টন গোপন তথ্য নিয়ে শহর থেকে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়া- এই ছিল তাদের অভিযানের মূল কাজ। আগে থেকেই তাদের এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পুরো এই অভিযানে তাদের সময় লেগেছে ছয় ঘণ্টা ২৯ মিনিট।

ওই পারমাণবিক কেন্দ্রটিতে সকালের শিফটের ইরানি গার্ডরা ডিউটিতে আসে স্থানীয় সময় সকাল সাতটায়। এক বছর ধরে জায়গাটির ওপর কঠোর নজরদারি করে ইসরাঈলি গোয়েন্দারা বিষয়টি জানতে পারে। তাই অপারেশনে অংশ নেওয়া এজেন্টদের বলা হয় ভোর পাঁচটার আগেই তার কাজ সেড়ে বেড় হয়ে যেতে হবে, যা তাদের জন্য ছিল অনেক সময়। ইরানি গার্ডরা আসলেই টের পাবে যে কেউ তাদের গোপন ও মহাগুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক অস্ত্রের তথ্য চুরি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে কয়েক বছরের কাজের নথি, পারমাণবিক অস্ত্রের ডিজাইন ও উৎপাদনের পরিকল্পনা।

CamScanner

গত ৩১ জানুয়ারি রাতে মোসাদের এজেন্টরা প্রবেশ করে ইরানের ওই পারমাণবিক কেন্দ্রটিতে। তাদের হাতে ছিলে অত্যধিক তাপ উৎপাদনকারী টর্চ লাইট, যা থেকে তিন হাজার ৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপযুক্ত আলো বেড় হয়। দীর্ঘদিনের গোয়েন্দা নজরদারির পর তাদের জানানো হয়েছে যে, অন্তত ৩২টি ভল্ট তাদের ভাঙতে হবে। আর এই কাজের জন্য তাদের ব্যবহৃত টর্চলাইটগুলো ছিল অত্যন্ত কার্যকরী। টর্চের আলো ফেলেই তারা গলিয়ে ফেলতে পারবে ভল্টের তালা তবে এতগুলো ভল্টের মধ্যে অনেকগুলোই শেষ পর্যন্ত তাদের ধরতে হয়নি। কালো ফাইলে ভরা এমন একটি ভল্ট খুঁজেছে তারা, যেটির নকশা ও সিকিউরিটি ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল। নির্ধারিত সময়ের আগে তারা যখন কাজ শেষ করে সীমান্তের দিকে চলে যায় নির্বিঘ্নে, তখন তাদের হাতে ছিল ৫০ হাজার পৃষ্ঠার নথি, ১৬৩টি সিডিতে ভরা নকশা, ভিডিও ও বিভিন্ন তথ্য। গত এপ্রিলে (২০১৮) ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু যখন তাদের এজেন্টদের এই তথ্য চুরির কথা প্রকাশ করেন, তার আগে তিনি বিষয়টি হোয়াইট হাউজে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। তিনি মনে করেন মোসাদের কাছ থেকে এই তথ্য জানার পরই ট্রাম্প ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি থেকে সড়ে আসার বিষয়ে আরো কঠোর হন।

ইরান আবারো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে চায়, এমন দাবি ইসরাঈল তুলে ধরেছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। এরপরই ট্রাম্প ঘোষণা দেন চুক্তি বাতিলের। যদিও ইউরোপসহ পুরো বিশ্বই চেষ্টা করছে চুক্তিটি টিকিয়ে রাখতে। ২০১৫ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় দীর্ঘ কূটনৈতিক তৎপরতা শেষে ছয় বিশ্বশক্তির সাথে সমঝোতা চুক্তি হয়েছিল ইরানের। চুক্তি অনুযায়ী ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বন্ধ করবে ও বিনিময়ে তাদের ওপর থেকে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ।

তিনজন বিদেশি সাংবাদিককে আমন্ত্রণ করে ইসরাঈল সেই তথ্যগুলো দেখায়। তার মধ্যে একজন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক টাইমসের, একজন ওয়াশিংটন পোস্টের ও আরেকজন ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের

রিপোর্টার। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক পরিদর্শক ও পরমাণু বিজ্ঞানী রবার্ট কেলি ইরান থেকে চুরি করা নথিগুলো দেখে ভিয়েনায় সাংবাদিকদের বলেন, 'তথ্যগুলো বেশ সমৃদ্ধ। নথিগুলো দেখে মনে হচ্ছে তারা আবার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির বিষয়ে কাজ করছে'।

যদিও নিরপেক্ষভাবে তথ্যগুলো যাচাই করে দেখার কোনো সুযোগ পায়নি মিডিয়া। ইসরাঈল যা তাদের দেখিয়েছে, সেগুলোই তারা দেখতে পেয়েছে। বেশির ভাগ তথ্যই অন্তত ১৫ বছরে আগের যখন ইরান আমাদ নামে নতুন প্রকল্প শুরু করে। আমাদ প্রকল্প বাতিল করার পর গোপনে অনেক কাজ অগ্রসর হয়। ইসরাঈল বলছে, তারা কিছু তথ্য প্রদর্শন করেনি, কারণ এইসব তথ্য দেখলে পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে এমন কোনো দেশ সেটি কাজে লাগাতে পারে।

ইরানি কতৃপক্ষ বলছে, এইসব ঘটনা পুরোটাই প্রতারণাপূর্ণ। ইসরাঈল এই ঘটনা সাজিয়ে আবার তেহরানের ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে চায়। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের গোয়েন্দারা তথ্যগুলো পর্যালোচনা করেছে। ইতোপূর্বে তাদের নিজেদের সংগৃহীত তথ্যের সাথে মিলিয়ে তারা বলেছে, ইসরাঈল যে তথ্য চুরি করেছে তা যথাযথ।

তথ্যগুলো নিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া কথা বলেছে বিশেষজ্ঞদের সাথে। তারা বলছেন, ২০০৩ সালে ইরানের আমাদ পারমাণবিক প্রকল্প বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের পদক্ষেপ তার চেয়েও অনেক বেশি বিস্তৃত, গোপনীয় ও সু-সংগঠিত। নথিগুলোতে ইরানের শাহাব-৩ ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য এমন পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরির চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলা হয়েছে। একটি নথিতে মাটির নিচে পারমাণবিক পরীক্ষার সম্ভাব্য সাইটগুলোর প্রস্তাব করা এবং পাঁচটি অস্ত্রের একটি অতিরিক্তি ব্যাচ প্রস্তুতের কথা বলা হয়েছে। তবে ধরা পরার ভয়ে কোনো অস্ত্রই তৈরি করা হয়নি।

ইরাক :

সিআইএ'র সহায়তায় ইরাকে বাথ পার্টির শীর্ষনেতা আরিফ রহমান ও পরবর্তী সময়ে সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় এলেও ইরাককে বিশ্বাস করত না

ইসরাঈল। এজন্য ইরাকে ইসরাঈলের গোয়েন্দা তৎপরতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ইরাকে সিআইএ মোসাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে। ইরাকে অনেক বড় অপারেশন চালায় মোসাদ। এর একটি হচ্ছে ১৯৬৬ সালে। মিগ-২১ জঙ্গি বিমানের পাইলট ছিলেন খ্রিষ্টান বংশোদ্ভূত মুনির রিদফা। ১৯৬৬ সালে তাকে বিমানসহ কৌশলে ইরাক থেকে ইসরাঈল নিয়ে আসে মোসাদ। তার কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ব্যবহার করা হয় ইরাকবিরোধী প্রচারণায়। সংবাদ সম্মেলন করে ইরাকে খ্রিষ্টান নিধনের প্রচারণাও চালানো হয়।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ইরাকের অসরিক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের (নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের জন্য যন্ত্রবিশেষ) স্পর্শকাতর কিছু বিষয়ে গোয়েন্দা তৎপরতা চালায়। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয় অপারেশন স্ফিঙ্কস। ইরাক এই গবেষণা সম্পন্ন করতে পারলে পারমাণবিক গবেষণায় বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে অগ্রবর্তী থাকত। মোসাদ মনে করেছিল এখনই যদি এই প্রোগ্রাম ধ্বংস করা না হয় তাহলে শিগগিরই গবেষণা সেন্টারে পারমাণবিক অস্ত্রের কাঁচামাল সরবরাহ করা হবে। এ জন্য ১৯৮১ সালের ১৭ জুন এফ-১৬ এ যুদ্ধ বিমানে বিপুল গোলাবারুদসহ একটি ইউনিটকে পাঠানো হয় ইরাকের এই প্রকল্প ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। ইরাক কিছু বুঝে ওঠার আগেই বোমা হামলা করে অসরিক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের ব্যাপক ক্ষতি করে। ইরাক পরে আর এ প্রকল্পটি অব্যাহত রাখতে পারেনি। এই হামলাটি অপারেশন অপেরা নামে পরিচিত। কানাডার বিজ্ঞানী গিরাল্ড বুল বিভিন্ন দেশে স্যাটেলাইট গবেষণায় কাজ করতেন। ইরাক স্যাটেলাইট উন্নয়ন প্রোগ্রাম 'প্রজেক্ট ব্যাবিলন'-এর ডিজাইন করলে তাকে ১৯৯০ সালের ২২ মার্চ বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে তার বাড়ির বাইরে গুলি করে হত্যা করে মোসাদ। যা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইতালি :

ইসরাঈলের পারমাণবিক প্রোগ্রামের গোপন তথ্য ব্রিটশে পাচার করার কারণে ১৯৮৬ সালে ইতালির রাজধানী রোম থেকে ইসরাঈল নাগরিক মোডাচাই ভ্যানুনুকে অপহরণ করে ইসরাঈল নিয়ে আসে মোসাদ। পরে তাকে জেলে ঢুকানো হয়।

ফিলিস্তিনে কয়েকটি অভিযান :

মিউনিখ ম্যাসাকারে অভিযুক্ত ইসরাঈলের নাম দেওয়া ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সদস্যদের ফিলিস্তিনে ১৯৭২ সালে হত্যা করা হয়। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয় অপারেশন র‍্যাথ অব গড। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে নিরপরাধ আহমেদ বৌচুকিকে তার গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে হাঁটার সময় হত্যা করা হয়। তাকে ব্লাক সেপ্টেম্বরের অভিযুক্ত আলী হোসেন সালামেহর আশ্রয়দাতা মনে করা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে হত্যা করা হয় পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন নেতা ওয়াদি সাদাদকে। ১৯৭৯ সালে হত্যা করা হয় পিএলও'র আস-সাদিকা নেতা জুহাইর মুহসিনকে। ফাতাহ নেতা আবু জিহাদকে ১৯৮৮ সালে হত্যা করে টুনিস রেইড নামের ইসরাঈল ডিফেন্স ফোর্সের এক সদস্য। ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ নেতা ফাতি শিকাকিকে হত্যা করা হয় ১৯৯৫ সালে।

১৯৯৭ সালে আম্মানে হামাসের এক সহযোগী সংগঠনের মিছিলে হামাস নেতা খালেদ মিশালকে বিষক্রিয়ার মাধ্যমে হত্যা করতে এজেন্ট পাঠিয়েছিল মোসাদ। তাদের দুজনকে জর্দানে আটক করা হয়েছিল। তাদের কাছে ছিল কানাডার জাল পাসপোর্ট। এ বছরই প্রায় ৭০জন ফিলিস্তিনি মুক্তির বিনিময়ে হামাস নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য পিএলওকে চাপ দিয়েছিল মোসাদ। এ সময় আহমেদ ইয়াসিন ফিলিস্তিনে বন্দি ছিলেন। এর সাত বছর পর ২০০৪ সালে তিনি যখন মুক্তি পান তখন ইসরাঈল হেলিকপ্টার থেকে গোলা নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে। তিনি ফিলিস্তিনে ইসলামের মূল ধারার নেতৃত্ব দিতেন। একই বছর গাড়িবোমায় হত্যা করা হয় হামাসের অপর নেতা ইযইল-দীন শেখ খলিলকে। ২০০৬ সালে লেটারবোমা পাঠানো হয় দ্য পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন নেতা বাসাম আবু শরীফকে। তিনি পিএলও'র প্রেস অফিসার ছিলেন। অবশ্য ১৯৭২ সালে মোসাদের লেটার বোমায় তিনি চারটি আঙুল ও একটি চোখ হারিয়েছিলেন।

২১. মোসাদের হাতে নিহত বিখ্যাত কয়েকজন

মোসাদের হাতে যে কত লোক নিহত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া কঠিন। রাজনীতিবীদ, ধর্মীয় নেতা, ব্যবসায়ী, আমলা, কূটনীতিক, সাংবাদিক এমনকি বিনোদনজগৎ কিংবা তারকা খেলোয়ারদের কেলেঙ্কারিতেও মোসাদের হাত রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। জনশ্রুতি রয়েছে পিএলও'র জনপ্রিয় নেতা ইয়াসির আরাফাত হত্যার পিছনে মোসাদের হাত ছিল। জানা যায়, এই নেতাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে মোসাদ।

১৯৬০ সালে নাৎসি নেতা এডলফ ইকম্যান আর্জেন্টিনাতে পালিয়ে ছিলেন। মাত্র পাঁচজন সদস্য নিয়ে মোসাদ এই নাৎসি নেতাকে আর্জেন্টিনা থেকে ইসরাঈলে ফিরিয়ে এনে সর্বোচ্চ শাস্তি কার্যকর করে।

অপারেশন স্প্রিং অব ইয়ুথ :

১৯৭৩ সালের ৯ই এপ্রিল রাতে ও ১০ এপ্রিল ভোরে লেবাননে বিমান হামলা চালায়। একই সময় ইসরাঈল ডিফেন্স ফোর্সের স্পেশাল ফোর্স ইউনিট বৈরুত, সিডন ও লেবাননে পিএলও'র টার্গেটকৃত নেতাদের খুঁজছিল ও সম্ভাব্য স্থানে হামলা করছিল। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশন স্প্রিং অব ইয়ুথ।

আফ্রিকা অঞ্চলে মোসাদের অপারেশন :

১৯৮৪ সালে মোসাদ ও সিআইএ ইথিওপিয়ার ইহুদিদের সহায়তার জন্য যে অপারেশন পরিচালনা করে তার নাম দেওয়া হয় অপারেশন মোজেস। ১৯৭৬ সালে উগান্ডায় এয়ার ফ্রান্স ফাইট ১৩৯ বিমান ছিনতাই করেছিল মোসাদের এজেন্টরা। বন্দি মুক্তির জন্য তারা এই বিমান ছিনতাই করেছিল। এটি অপারেশন অ্যান্টাবি নামে পরিচিত।

২২. মুসলিম বিজ্ঞানীদের কেন হত্যা করে মোসাদ?

১৯৪৮ সালে স্বঘোষিত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিম বিশ্বকে প্রধান হুমকি হিসেবে দেখে আসছে ইসরাঈল। রাষ্ট্রটি নিজের

আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মুসলিমদের একমাত্র বাধা মনে করে। এজন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিশ্বজুড়ে মেধাবী মুসলিমদের গুপ্তহত্যা করে আসছে ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। তাদের টার্গেটে প্রথমেই থাকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা।

ইরানের বার্তা সংস্থা ইকনার তথ্য মতে, ১৯৫২ সালে মিসরীয় পরমাণু বিজ্ঞানী সামিরাহ মুসাকে হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইসরাঈলের গুপ্তহত্যার এই মিশন। সর্বশেষ চলতি বছরও (২০১৮) বেশ কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে তারা। এর মধ্যে আছে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে কর্মরত ফিলিস্তিনি রকেট বিজ্ঞানী ফাদি মুহাম্মাদ আল-বাতস।

১৯৫২ সালে ড. সামিরাহকে যুক্তরাষ্ট্রে এক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হত্যা করা হয়। এই নারী বিজ্ঞানীকে ইসরাঈলের পছন্দ না করার কারণ তিনি মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলের ক্রমবর্ধমান পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিলেন। এ ছাড়া তিনি ইউরেনিয়ামের চেয়ে কম মূল্যে পরমাণু উপকরণ উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করছিলেন।

১৯৬৭ সালে আরেক মিসরীয় পরমাণু বিজ্ঞানী ড. সামির নাজিবকে হত্যা করে ইসরাঈলি গোয়েন্দা সংস্থা। পরমাণু প্রযুক্তির সামরিক প্রয়োগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা করছিলেন তিনি। মার্কিন শহর ডেট্রয়টে তাকে হত্যা করা হয়। ১৯৮০ সালের জুনে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে রহস্যজনকভাবে মারা যান ইরাকের পরমাণু প্রকল্পের প্রধান ড. ইয়াহইয়া আমিন আল মুর্শেদ। ধারণা করা হয়, মোসাদ তাকে হত্যা করেছে। ইরাকি পরমাণু চুল্লিতে ফরাসি সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার জন্য প্যারিসে গিয়েছিলেন তিনি। তিনিও মিসরীয় বিজ্ঞানী।

১৯৮৯ সালে অজ্ঞাতপরিচয় কিছু দুর্বৃত্ত মিসরীয় বিজ্ঞানী সাইদ আল-বোদায়েরকে তার নিজের বাসভবনে গুলি করে হত্যা করে। মাইক্রোওয়েভ বিষয়ে কাজ করছিলেন তিনি। ১৯৯১ সালে লেবাননের পদার্থবিজ্ঞানী রামাল হাসান রামাল প্যারিসে রহস্যজনকভাবে খুন হন। তিনিও

মোসাদের শিকার বলে মনে করা হয়। ২০০৪ সালে ইরানি পদার্থবিজ্ঞানী মাসুদ আলি মোহাম্মদিকে তেহরানে তার বাড়ির বাইরে হত্যা করা হয়। কণা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছিলেন এই বিজ্ঞানী। ওই ঘটনার জন্য ইসরাঈল ও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছে ইরান। তবে ওয়াশিংটন এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করলেও, এ নিয়ে কথা বলেনি ইসরাঈল।

গত বছর তিউনেশিয়ায় হত্যা করা হয় দেশটির অ্যাভিয়েশন প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আল-জাওয়ারিকে। তিনি ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ড্রোন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছিলেন জাওয়ারি। নিজ বাসভবনের বাইরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

চলতি বছর ফাদি মুহাম্মাদ আল-বাতসকে হত্যা করা ছাড়াও বিভিন্ন দেশে মুসলিম মেধাবীদের হত্যা করেছে ইসরাঈলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ফিলিস্তিনি প্রকৌশলী ও কানাডায় পিএইচডি গবেষক হাসান আলি খাইরুদ্দিনকে হত্যা করে মোসাদ। বিশ্ব অর্থনীতিতে ইহুদি আধিপত্য নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি। না থামলে মেরে ফেলা হবে- এমন হুমকি আগে থেকেই দেওয়া হচ্ছিল ২৩ বছর বয়সী এই গবেষককে। শেষ পর্যন্ত সেন্ট ম্যারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আবাসিক এলাকায় তাকে হত্যা করা হয়।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ফ্রান্সে হত্যা করা হয় লেবাননের আরেক বিজ্ঞান শিক্ষার্থী হিশাম সালিম মুরাদকে। তিনি জোসেফ ফুরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাণু পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। এই গুপ্তহত্যার পেছনে মোসাদ জড়িত বলে মনে করে নিহতের পরিবার। একই বছরের ২৫ মার্চ পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনি রসায়নবিদ ইমান হোসাম আল-রোজাকে হত্যা করে ইসরাঈল। অনেককে হত্যা না করলেও অন্য পন্থায় দমন করে এই ইহুদি রাষ্ট্রটি। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের স্নায়ুবিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকি। এমআইটির এই গ্রাজুয়েটকে নামমাত্র এক অভিযোগে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে রেখেছে মার্কিন সরকার। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এক মার্কিন সেনাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

CamScanner

এভাবে সারা বিশ্বে মুসলিম বিজ্ঞানীদের হত্যা করে নিজের আধিপত্যবাদী ও বর্ণবাদী এজেন্ডা কায়েম রেখেছে ইসরাঈল। আরব ও মুসলিম বিশ্ব যাতে বিজ্ঞান, বিশেষ করে পরমাণু প্রযুক্তিতে এগিয়ে যেতে না পারে সেজন্য এই গুপ্তহত্যার পথ বেছে নেয় দেশটি। এ ধরনের ঘটনা যদি উল্টোটা হতো, তবে কী হতো? কোনো মুসলিম বা আরব দেশের গোয়েন্দা সংস্থা যদি কোনো ইহুদি বিজ্ঞানীকে হত্যা করত! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া হতো। পশ্চিমা সরকারগুলো আরব দেশগুলোতে কথিত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু করত। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইসরাঈলি গুপ্তহত্যা থেকে মুসলিম বিজ্ঞানীদের রক্ষা করবে কে?

বিশ্লেষকরা মনে করেন, মুসলিম বিজ্ঞানীদের হত্যার মধ্য দিয়ে ইসরাঈল মুসলিম দেশগুলোকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তারা যাতে পরমাণু প্রযুক্তির মালিক হতে না পারে সেজন্য এসব করে যাচ্ছে দেশটি। এ ব্যাপারে তুর্কি রাজনৈতিক ভাষ্যকার মোস্তফা ওজান বলেন, 'মুসলিমরা এ ধরনের প্রযুক্তির মালিক হবে- একে ইসরাঈল বিপজ্জনক মনে করে। তারা চায় না বিজ্ঞানে মুসলিমরা বড় কোনো সাফল্য অর্জন করুক। আর এ কারণেই তারা মিসর, ইরাক, ইরান ও পাকিস্তানের মতো মুসলিম দেশগুলোর বিজ্ঞানীদের টার্গেট করে।'

তিনি আরো বলেন, 'এসব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ইসরাঈল কখনো কোনো মন্তব্য করে না যাতে বিষয়টি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনা সৃষ্টি না করে।'

তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন সিরীয় বংশোদ্ভূত সুইডিশ লেখক হাতেম আল-জোয়াবি। তিনি বলেন, 'মোসাদ মুসলিম বিজ্ঞানীদের হত্যা করার কারণ এসব দেশকে গবেষণা উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত রাখা।' যেসব মুসলিম তাদের দেশের যেকোনো ক্ষেত্রে দক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে- তাদের সবাইকেই ইসরাঈল টার্গেটে রাখে বলেও মত দেন এই লেখক।

২৩. গুপ্তহত্যা বন্ধ করবে কি মোসাদ?

গুপ্তহত্যার কৌশল থেকে সরে আসবে না মোসাদ। কারণ ইসরাঈল মনে করে, নিয়মিত সামরিক বাহিনী নয় এমন অপ্রচলিত ধরনের বাহিনীর বিরুদ্ধে গুপ্তহত্যা একটি কার্যকর উপায়। তা ছাড়া দেশটির নিরাপত্তা নীতি-নির্ধারকরা মনে করেন ইসরাঈল বিরোধী গেরিলা সংগঠনগুলো থেকে নিজেদের সুরক্ষার জন্য অনেক সময়, সামর্থ্য, খরচ কমাতে পারে একমাত্র গুপ্তহত্যাই। লেবাননের সাথে ২০০৬ সালে যুদ্ধে ইসরায়েলের নিয়মিত সামরিক বাহিনী যেভাবে কার্যত পরাজিত হয়, তার তুলনায় মোসাদের এতদিনকার গুপ্তহত্যার সাফল্য নিশ্চয় ইসরায়েলের জন্য সুখকর। লেবাননের সাথে পরাজয়ের বছরেই, ২০০৬ সালে দেশটির সুপ্রিমকোর্টও গুপ্তহত্যা অভিযানকে আন্তর্জাতিক আইনসম্মত বলে ঘোষণা দিয়ে এ অভিযান অব্যাহত রাখার পক্ষে রায় দেয়। কাজেই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হলেও দেশটি এমন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখবে।

যদিও ১৯৯৭-তে আম্মানে ব্যর্থতার পরেও দেশটি এমন অভিযানকে উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ আখ্যায়িত করে এমন অভিযান আর না করার কথা জানিয়েছিল। এখন যেমন নানা তরফে অমন প্রচারনা চালানো হচ্ছে। গত ৪ মার্চ ইসরায়েলের প্রভাবশালী দৈনিক বিশাল শিরোনাম করেছে যে, দুবাই হত্যাকাণ্ড হচেছ 'দি লাস্ট অ্যাসাসিনেশন অফ দিস কাইন্ড'। পত্রিকাটির ইন্টেলিজেন্স করেসপন্ডেন্ট ইয়োশি মেম্যান এই ঘটনার পরে ইসরায়েলের সরকারের অবস্থান কি হতে পারে তা ব্যাখ্যা করার দাবি করেছেন প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হচ্ছে, নজরদারি করার মতো প্রযুক্তির ছড়াছড়ির এই সময়ে গুপ্তহত্যা চালানো কঠিন হবে। কাজেই সরকার এ উপায় ছাড়ার কথা ভাবছে। ইয়োশি লিখছেন, দুবাই অভিযানের ঘটনা যেসব প্রযুক্তির ফলে প্রকাশিত হয়ে পড়লো এগুলো খেলার নিয়ম পাল্টে দিয়েছে। তার ভাষায়, 'জেমস বন্ডের চলচ্চিত্রের কায়দায় বীরত্বব্যঞ্জক অভিযান চালানোর দিন শেষ।'

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, হারেটজ এর এই খবর মূলত ইসরাঈল কর্তৃক দুনিয়াবাসীকে 'আশ্বস্ত' করার চেষ্টা মাত্র। যেমনটি করা

হয়েছিল ৯৭-তে। কারণ প্রথমত, যেসব ইউরোপীয় দেশের জাতীয় পরিচয়সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার থেকে ওই সব দেশের নাগরিকদের নামেই পাসপোর্ট ইস্যু করে ব্যবহার করেছে মোসাদের গোয়েন্দারা--এমন ঘটনার পর তথ্যভান্ডারে সাধারন তল্লাশি চালালেই যে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে, এটা নিশ্চয়ই ইসরাঈল বুঝতে পেরেছিল। দ্বিতীয়ত, ইসরায়েলের সাথে দুবাইয়ের আরো অনেক আরব দেশের মতো কূটনীতিক সম্পর্ক নেই। তারপরও নিজেদের ভাবমুর্তির দিকে খেয়াল রেখেই হয়তো অন্য দেশের নাগরিকত্ব আছে এমন ইহুদিদের পর্যটক হিসাবে ভ্রমণে দুবাই কর্তৃপক্ষ উদারতা দেখায়। কিন্তু নজরদারি থাকে অনেক কড়া। এই নজরদারির কথা নিশ্চয় মোসাদের জানা ছিল। তৃতীয়ত, এই ইলেক্ট্রনিক লেনদেনের যুগে কোনো ভ্রমণকারীই নিজের উপস্থিতির চিহ্ন না রেখে ভ্রমণ করতে পারে না। ভিসা পাওয়ার শর্ত পূরণ করতে গোয়েন্দাদের প্রি-পেইড ক্যাশ কার্ড ছিল এবং সেগুলো তারা ব্যবহারও করেছেন। এই ক্যাশ কার্ডকে কবে কোথায় ব্যবহার করেছেন সেই সূত্র ধরে যে কাউকে খুঁজে বের করা যে সম্ভব সেটাও নিশ্চয় ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানতেন। চতুর্থত এবং চূড়ান্তভাবে বলতে হয়, যে হোটেলে মাবহুকে খুন করা হয় তার বাইরে রাস্তায়, ভিতরে লবিতে-করিডোরে এবং মাবহুর কক্ষে চালু থাকা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা নিশ্চয়ই গোয়েন্দাদের অজানা ছিল না।

কাজেই সরকারের হয়ে যেই 'উপলব্ধি'র কথা জানায় দৈনিক হারেটজ তা যে প্রকৃত মনোভাব নয় সেটা স্পষ্ট। কারণ, এসব নজরদারির কথা ইসরায়েলের ভালোভাবেই জানে। গোয়েন্দারাও অভিযানকালে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তাদের সব চলাফেরার দৃশ্য আর আলামতই সংরক্ষিত হচ্ছে। এরপরও তারা অভিযান চালিয়েছেন পরিকল্পনা অনুযায়ী, সফল হয়েছেন এবং নিরাপদে ফিরেছেন। তার মানে কী? তার মানে হচ্ছে, এটা তারা পাত্তাই দেননি। এই পাত্তা না দেওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন,

এক. তারা জানতেন তাদের যেসব মুখের ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়ছে বা যেসব ক্যাশ কার্ড তারা ব্যবহার করছেন সেসব মুখ আর দ্বিতীয়বার কোনো অভিযানে দেখা যাবে না বা ওই ক্যাশ কার্ড আর কখনো ব্যবহৃত

হবে না, কারণ ওটা তাদের এমন জরুরি অভিযান, যে অভিযান একজন এজেন্টের সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট, বাকিটা সময় ঘরের ছেলে হয়ে ঘরে থাকলেও আলবত চলে।

দুই. যেসব মুখের ছবি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো গোয়েন্দাদের প্রকৃত মুখ নাও হতে পারে, হয়তো দাড়িওয়ালা মুখটি এই অভিযানের জন্যই দাড়ি পুষেছেন কিংবা টাকমাথাওয়ালা এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্যই টাক হয়েছেন।

তিন. যদি মুখগুলো অভিযান পরিচালনাকারীদের সত্যি চেহারা হয় তবে তো প্লাস্টিক সার্জারি আছেই।

mossad agent কাজেই নজরদারির প্রযুক্তির কারণে ইসরাঈল গুপ্তহত্যা বন্ধ করবে সেটা সত্যি নয়। বরং তারা এসব প্রযুক্তির হুমকি এবং হুমকি রোধ করা, দুই বিষয়েই সচেতন ও সক্রিয়। দুবাই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইসরাঈল যেটা শুরু করল- ভূয়া পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্র বানানোর পুরনো পদ্ধতির বদলে অন্য দেশের ডাটাবেজ থেকে পরিচয় চুরি করে দলিলপত্র তৈরি করা, সেই পরিচয়ে লক্ষ্যস্থলে প্রবেশ করা, অভিযান চালিয়ে হত্যা করা এবং অভিযানকারীদের ফিরিয়ে এনে গোপনে রাখা; এভাবেই বরং ইসরাঈল তার 'মরিয়া ধরনের প্রতিরক্ষা নীতি' চালু রাখবে।

এখন দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকালে আমরা যে বিপদের দিকটা আঁচ করতে পারি তা হলো, গত একদশকে ভারতের সাথে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের বেড়ে ওঠা ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও যোগযোগ। নানান কারণে এটা বেশ পাকাপোক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে। বিশেষত, ভারতের 'র'-এর সাথে তাদের কৌশলগত সহযোগিতার সম্পর্ক ও পরস্পরের নিরাপত্তা সহযোগিতা চুক্তি অভিন্ন দর্শনকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর আওতায় মোসাদের তত্তাবধানে সরাসরি প্রশিক্ষত করে তোলার কাজও চালিয়ে যাচ্ছে বেশ আগে থেকেই। লক্ষণীয় দিক হলো, মোসাদ তথা ইসরায়েলের মতো ভারতেরও সামনের সারির সামরিক কৌশলের অংশ হিশেবে গুপ্তহত্যা কিংবা টার্গেটেড কিলিং

মিশনের কৌশল গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের সক্ষমতা তৈরি এবং ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবার কথা। বাংলাদেশের নিরাপত্তার হুমকি মোকাবিলা এই দিকটি আশু বিবেচনায় আনা উচিত। অন্যদিকে বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় ও নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের দিকে নজর ফেরানোও যেতে পারে এই আলোকে।

২৪. বাংলাদেশে মোসাদ

বাংলাদেশে মোসাদ আছে কি? এমন প্রশ্ন কারো কাছে মনে হবে অবান্তর আবার কারো কাছে আতঙ্কের। একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ায় বাংলাদেশে মোসাদের কর্মতৎপরতা একেবারেই থাকবে না এমনটা অবিশ্বাস্য। আবার বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিশ্বরাজনীতিতে যে সীমিত প্রভাব তাতে বাংলাদেশকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ারও কারণ নেই। বাংলাদেশকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ থাকতে পারে বাংলাদেশে একটি ইসলামপন্থি সরকারের আগমন ঠেকানো। ইসরাঈলের জন্য এ কাজ আরো সহজ করে দেবে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। কারণ বাংলাদেশের সামগ্রিক বিষয় ভারতের র এর নখদর্পণে। 'র'-এর ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে মোসাদের ঘাস খাওয়া অনেকটাই অসম্ভব। তবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো একে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে না। সম্প্রতি (২০১৬ সালের মে মাসে) বিএনপির মাঝারি পর্যায়ের এক নেতার ইসরাঈলের এক নেতার সাথে ভারতে মিটিং করা নিয়ে যে সংবাদ গণমাধ্যমে এসেছে তাতে এ বাস্তবতাই ফুটে ওঠে। পাঠকের সুবিধার্থে নিচে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত মোসাদসংক্রান্ত কিছু সংবাদ, কলাম তুলে ধরা হলো।

১০ মে, ২০১৬ দৈনিক যুগান্তরে জেরুজালেম অনলাইনের বরাতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম ছিল, "বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র দিল্লিতে তৎপর মোসাদ"।

বাংলাদেশ নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র করছে ইসরাঈলের প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। ভারতের রাজধানী দিল্লিতে দফায় দফায় বৈঠকের

মাধ্যমে বাংলাদেশে সরকার উৎখাতের তৎপরতা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ও কথিত সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ে 'সরকার পরিবর্তন এজেন্ডা' হাতে নিয়েছে বিশ্বের প্রথমশ্রেণির এই গোয়েন্দা চক্র। ইসরাঈলের পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতিবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাফাদি সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি'র প্রধান মেন্দি সাফাদি 'এজেন্ডা প্রধান' হিসেবে কাজ করছেন। ইসরাঈলের সাবেক লিকুদ পার্টির সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন সাফাদি। মোসাদের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা হিসেবেও বিতর্কিত সাফাদি। সম্প্রতি মেন্দি সাফাদির ভারত সফরের সময় 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তন' নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে বলে জেরুজালেম অনলাইন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। তবে এ খাতে অর্থায়ন করা হচ্ছে কিনা বা কী উপায়ে ও কার সাহায্যে সরকার পরিবর্তন করা হবে সে বিষয়ে কিছুই বলা নেই। এই পত্রিকার পৃথক প্রতিবেদনে বলা হয়, নয়াদিল্লিতে মেন্দি সাফাদির সঙ্গে বৈঠকে ইসরাঈলের তিনজন বাংলাদেশি প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক বছর পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ইসরাঈলের কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টির এ সাফাদি পদক্ষেপ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। জেরুজালেম অনলাইনে প্রায় প্রতি মাসেই বাংলাদেশবিষয়ক এক বা একাধিক প্রতিবেদন থাকে। ২০১৬ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

২০১৭ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম- 'শিগগির ইসরাঈলিদের জন্য বাংলাদেশের দরজা খুলবে'। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার 'মুসলিম ব্রাদারহুডের সরকার'। তারা সংখ্যালঘু হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে বর্তমান সরকারকে হটিয়ে এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে ইসরাঈলের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ইসরাঈলের সাবেক ডেপুটি মন্ত্রী আয়ুব কারা চিফ অব স্টাফ ও সাফাদি সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমেসি

অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি'র প্রধান মেন্দি সাফাদি তার সাম্প্রতিক ভারত সফরে এসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। জেরুজালেম অনলাইনকে সাফাদি বলেছেন, 'নির্যাতিত ও জীবন সংকটাপন্ন মানুষের স্বাধীনতার জন্য কাজ করা একটি নৈতিক দায়িত্ব। আর ওসব মানুষের সাহায্যের জন্যই আমি এখানে এসেছি।' তিনি জানান, বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে সংখ্যালঘুদের ওপর 'জাতিগত নির্মূল অভিযান' (এথনিক ক্লিনজিং) চলছে। এটা অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা, ফিলিস্তিনের মতো বানানো বিষয় না। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যার পাসপোর্টে লেখা থাকে- 'ইসরাঈল ছাড়া বিশ্বের যেকোনো দেশ ভ্রমণে অনুমোদিত'। মেন্দি সাফাদি বলেন, 'আমি এ অবস্থার পরিবর্তন করতে চাই।' সংবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য যে বর্তমান সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে স্বার্থ আদায় তা অনেকটাই স্পষ্ট।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়, মেন্দি সাফাদির ভারত সফরের সময় বাংলাদেশে মোসাদের প্রতিনিধি শিপন কুমার বসু, রওশন জাহিদ প্রিন্স ও বিবেক দেবের সঙ্গে সাফাদির বৈঠক হয়েছে (প্রতিবেদনে এই তিনজনের পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি)। বৈঠকে বাংলাদেশে নতুন নির্বাচনের ব্যাপারে আলোচনা হয়। নির্বাচনের পর বাংলাদেশ-ইসরাঈল সম্পর্ক 'স্বাভাবিক' করা হবে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের দিকে আঙুল তুলে বলা হয়, ২০১৪ সালে বাংলাদেশে 'ইসলামপন্থিরা' ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। তারপর থেকেই সংখ্যালঘু হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের হত্যা করা হচ্ছে। দুবছর আগে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনকে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেয়নি। আর এই সমস্যার সমাধানে মোসাদ ও মেন্দি সাফাদির সহায়তা চেয়েছে পিএনবি পার্টি (সম্ভবত বিএনপিকে ভুল করে পিএনবি লেখা হয়েছে)। তবে বিএনপির কোন নেতা কী ধরনের সাহায্য চেয়েছে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। মোসাদের প্রভাবশালী এজেন্ট হয়ে মেন্দি সাফাদি তার ভারত সফরের অংশ হিসেবে এ বিষয়ে কাজ করছেন। তবে কী কাজ করছেন বা কীভাবে সরকার পতন ঘটাতে চান সে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি।

গত ৪ মে জেরুজালেম অনলাইনে প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালের হিন্দু দর্জি, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ও সমকামী অধিকারকর্মী হত্যার উদাহরণ দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট (আইএস) তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছে। আর আইএসের টার্গেট হয়েছে হিন্দু ও খ্রিষ্টানরা। আইএসের ম্যাগাজিন দাবিকে দাবি করা হয়েছে, 'খলিফার সৈন্যরা বাংলায় তাদের অ্যাকশন চালিয়ে যাবে। এ ছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে আঞ্চলিক নেতাও মনোনয়ন দেবে আইএস।'

বিবিসি বাংলা এরপর ১৫ মে ২০১৬ তারিখে একটি নিউজ প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল, "বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব আসলাম চৌধুরী আটক"। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব আসলাম চৌধুরীকে আজ ঢাকা থেকে আটক করেছে পুলিশ। এর আগে আজই তার দেশত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বাংলাদেশের পুলিশ। গোয়েন্দা পুলিশের মুখপাত্র মারুফ হোসেন সরদার বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, রোববার সন্ধ্যেবেলা ঢাকার খিলক্ষেত এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

সম্প্রতি মি. চৌধুরীকে নিয়ে খবর বেরোয় যে তিনি ভারত সফরে গিয়ে ইসরায়েলি লিকুদ পার্টির এক নেতার সাথে বৈঠক করেছেন - যাকে 'মোসাদ-সংশ্লিষ্ট' বলে উল্লেখ করে বিভিন্ন সংবাদপত্র। এর পরই তাকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।

পুলিশ বলছে, বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে মি. চৌধুরীর সাথে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার বৈঠকের অভিযোগ আসার পর তারা তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ সুপার এ কে এম হাফিজ আক্তার এ খবর নিশ্চিত করেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকে বিএনপির নবনিযুক্ত যুগ্ম-মহাসচিব আসলাম চৌধুরীকে নিয়ে কিছু সংবাদ প্রচারিত হয়। যেখানে বলা হয়, মি. চৌধুরী ভারতে গিয়ে ইসরায়েলের ক্ষমতাসীন লিকুদ পার্টির

নেতা মেন্দি এস সাফাদির সাথে বৈঠক করেছেন। এসব প্রতিবেদনের সাথে কিছু ছবিও সংযুক্ত ছিল যেগুলোতে মি. সাফাদির সাথে হাস্যোজ্জ্বল আসলাম চৌধুরীকে দেখা যায়। মি. সাফাদির ফেসবুক পাতায়ও এধরনের কিছু ছবি পোস্ট করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যেই মি. চৌধুরী ইসরায়েলি এই নেতার সাথে বৈঠক করেছেন। এসব প্রতিবেদনে মি. সাফাদি ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা, মোসাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলেও উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে কিছু টেলিভিশন চ্যানেল এবং পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে আসলাম চৌধুরী দাবি করেন, তার ওই সফরটি ছিল ব্যক্তিগত এবং মি. সাফাদি যে লিকুদ পার্টির নেতা সেটি তিনি জানতেন না।

এবিষয়ে বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, "তারা এখনি বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করবেন না। দলীয়ভাবে আলোচনা করে তারা এ নিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন।"

আরেক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও বলেছিলেন যে, ভারতে মি. চৌধুরীর ওই সফরটি ছিল ব্যক্তিগত এবং ইসরায়েলের সাথে বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই।

মেন্দি এন সাফাদির ফেসবুক প্রোফাইলে তিনি নিজেকে একটি কূটনৈতিক যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায় তিনি ইসরাঈল-ভারত সম্পর্ক বিষয়ে ভারতে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন।

কিছুদিন আগে গঠিত বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসলাম চৌধুরী যুগ্ম-মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। এর আগে তিনি ২০০৮ সালে তার নিজ এলাকা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে বিএনপির মনোয়নে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

বাংলাদেশ ইসরাঈলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি এবং কূটনৈতিক কোনো সম্পর্কও রাখেনি। ফিলিস্তিন-ইসরাঈল দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ সব সময় ফিলিস্তিনের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে।

বিএনপি নেতার সাথে ইসরায়েলি রাজনীতিকের বৈঠকের দিকে ইঙ্গিত করে ঢাকায় ফিলিস্তিনি দূতাবাসের শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ইউসেফ রামাদেন মন্তব্যও বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলের সাথে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক দলটির জন্য হবে 'রাজনৈতিক আত্মহত্যা'।

এরপর 'বিএনপির মোসাদ কানেকশন' শিরোনামে দৈনিক নয়াদিগন্তে একটি কলাম লেখেন আলফাজ আনাম। কলামটি প্রকাশিত হয় ১৭ মে ২০১৬। এর চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো।

"....মোসাদের জন্ম, ইতিহাস ও অপারেশন নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে এমনকি মুভিও তৈরি হয়েছে। মোসাদের বড় ধরনের অপারেশন নিয়ে লেখা একটি বইয়ের নাম 'দ্য গ্রেটেস্ট মিশন অব দ্য ইসরাঈলি সিক্রেট সার্ভিস মোসাদ'। লেখক মাইকেল বার জহর এবং নিসিম মিশাল। (The Greatest Mission of the Israeli Secret Service Mossad - Harper Collins Publisher) এই বইয়ে মোসাদের জন্মের পর বড় ধরনের ২১টি অপারেশনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই বইয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় কোথাও মোসাদের অপারেশনের বিবরণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কয়েক দিন যাবৎ আমাদের দেশের সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে, বর্তমান সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে মোসাদ। এর সাথে বিএনপির একজন মধ্যম সারির নেতা আসলাম চৌধুরী নাকি জড়িত রয়েছেন। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি এখন পুলিশের রিমান্ডে আছেন। চট্টগ্রামের এই ব্যবসায়ী নেতা ভারতে গিয়ে মোসাদের সাথে ষড়যন্ত্র করছিলেন বলে দাবি পুলিশ ও সরকারের মন্ত্রীদের। এতদিন সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হতো- বিএনপি হচ্ছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের এজেন্ট। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার সাথে যাদের যোগাযোগ, আর যাই হোক তাদের সাথে মোসাদের যোগাযোগ হওয়া দুঃস্বপ্নের চেয়েও কঠিন।

বলা হচ্ছে, বিএনপি নেতার সাথে মোসাদের ওই বৈঠক হয়েছে ভারতে। এ ধরনের বৈঠক হলে ভারতের দক্ষ গোয়েন্দা সংস্থা র-এর অজানা

থাকার কথা নয়। নাকি 'র'-কে জানিয়ে মোসাদ এ ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশ সরকারের জন্য এটা বড় ধরনের দুশ্চিন্তার কারণ। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সাথে এখন ভারতের সম্পর্ক যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক ভালো। এই সরকারকে উৎখাতের একটি ষড়যন্ত্র ভারতে বসে হবে আর সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা তা যদি বাংলাদেশকে না জানায়, তাহলে খুবই চিন্তিত হওয়ার মতো বিষয় বটে। ভারতের মাটিতে বসে কেন এ ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তা জানতে এখন ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করা উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে ভারতকে এই নিশ্চয়তা বার বার দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের মাটি ভারতবিরোধী কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, এখন ভারতের মাটি যদি বাংলাদেশের সরকার উৎখাতের কাজে ব্যবহার হয়, তাহলে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি টেকার কথা নয়।

...ইসরাঈল থেকে টেলিফোনে বিবিসি বাংলার শুভজ্যোতি ঘোষকে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি, সেখানে সংখ্যালঘুদের অবস্থা এগুলো সবাই জানেন– আমরা দুজনে সেসব নিয়েই কথা বলেছি; তাও সেটা একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে। আমরা বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছিলাম বা সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিলাম– এর চেয়ে হাস্যকর কিছু হতেই পারে না।' তিনি আরো দাবি করেছেন, 'সরকার ফেলার চক্রান্ত একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে করা হচ্ছে; তারপর আবার চক্রান্তকারীরা হাসিমুখে তাদের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন, এ জিনিস কোথাও আবার হয় না কি?' তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, আগ্রার যে অনুষ্ঠানে তার সাথে আসলাম চৌধুরীর সম্প্রতি দেখা হয়েছিল, তাতে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিল ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির যুব শাখা। প্রতিবেশী দেশের একটি রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে আসলাম চৌধুরীও সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। দুজনের আগে থেকে কোনো পরিচয়ও ছিল না– একই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দুই অতিথি হিসেবে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক আলাপ হয়েছিল মাত্র।

CamScanner

বিবিসির রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে কোনো কোনো সংবাদমাধ্যমে তাকে যে মোসাদের গুপ্তচর বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, সে সম্পর্কেও সাফাদি পুরোপুরি অবহিত। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাকে এমন একজন গুপ্তচর দেখান যিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার গতিবিধি ফেসবুকে পোস্ট করেন, সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দিয়ে বেড়ান। এর পরও কেউ আমাকে যদি গুপ্তচর মনে করেন, তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।'

...বিবিসির রিপোর্ট থেকে আমরা আরো জানতে পারছি, এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিজেপির যুবশাখা। তাহলে এই চক্রান্তের সাথে কী ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপিও জড়িত?

মেন্দি সাফাদি সম্পর্কিত খবরের আরেকটি উৎস হলো, জেরুসালেম অনলাইন নামে একটি প্রপাগান্ডা অনলাইন পত্রিকা। এটি মেন্দি সাফাদি চালান। এই অনলাইনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্ময়কর কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ক্ষমতাসীন দলের নির্যাতন নিপীড়নের যেমন নানা বাড়াবাড়ি রকমের বিবরণ আছে তেমনি শেখ হাসিনা সরকারকে একটি 'ইসলামপন্থি' সরকার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে মুসলিম ব্রাদারহুড। অথচ মুসলিম ব্রাদারহুডের ভাবাদর্শিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামির প্রথমসারির নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে শেখ হাসিনার সরকারের আমলে। মেন্দি সাফাদির এসব প্রপাগান্ডার সাথে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ কিংবা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির বিপরীতমুখী প্রপাগান্ডার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যেকোনো সংখ্যালঘু হামলার দায় এই সংগঠনগুলো তথ্য বিকৃত করে জামায়াতের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করে থাকে। মেন্দি সাফাদির অনলাইনটিও একই ধরনের বিপরীতমুখী ও অবিশ্বাস্য প্রপাগান্ডা চালিয়েছে।

তবে অবাক করা ব্যাপার হলো, বিএনপির মোসাদ কানেকশন ইস্যুতে জড়িয়ে পড়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত। ফিলিস্তিন

দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ইউসুফ এস রামাদান সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দল যদি ইসরাঈলের কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি, দল কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তবে তা হবে তাদের রাজনৈতিক আত্মহত্যা। একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে তিনি বলেন, বিএনপির সাথে এ ধরনের বৈঠকের খবর তারা আগেই জানতেন।

প্রশ্ন হলো, পশ্চিমতীর আর গাজায় ইসরাঈলের নির্মম অভিযানের কোনো খবর ফাতাহ সরকার জানতে পারে না। সেখানে মোসাদ দিল্লিতে বসে কী করে, সে খবর ঢাকায় বসে কীভাবে জানতে পারেন এই কূটনীতিক। হামাসের যোদ্ধারা ইসরাঈলের বোমা হামলায় যখন অকাতরে জীবন দিচ্ছেন, তখন ফাতাহর এই নেতারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ইসরাঈলের সাথে নানা ধরনের আঁতাতে লিপ্ত। গাজাসহ ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ যখন ইসরাঈলি আক্রমণে নিষ্পেষিত জীবনযাপন করছে, স্ত্রী পুত্র স্বজনদের হারাচ্ছে, খাবার আর পানির অভাবে হাহাকার করছে, তখন মাহমুদ আব্বাসের দুর্নীতিবাজ সরকারের এসব কর্তাব্যক্তি বিভিন্ন দেশে বসে আরাম আয়েশে জীবনযাপন করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের থাকা খাওয়া বিলাসী জীবনযাপনের ব্যয় বাংলাদেশের জনগণ বহন করছে। এর আগে শাহতা জারাব নামে এক ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত নারী কেলেঙ্কারিসহ নানা ধরনের অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলেন এ দেশে। এখনকার চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলছেন...।"

সজীব ওয়াজেদের সাথে বৈঠক হয়েছে: সাফাদি

বিবিসি বাংলা এরপর ২৮ মে ২০১৬ তারিখে সজিব ওয়াজেদ জয়ের সাথে মোসাদ এজেন্ট সাফাদির মিটিং নিয়ে রিপোর্ট করলে সবাই নড়েচড়ে বসেন। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুকন্যা এবং আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ হাসিনার পুত্র জয়, যিনি একইসাথে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা। বিবিসির সেই প্রতিবেদনটি

"বাংলাদেশে সরকার উৎখাত ষড়যন্ত্রের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা ইসরাঈলি নাগরিক মেন্দি এন. সাফাদি দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র ও তার তথ্য-প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের সঙ্গে গত বছর তার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর সাথে দিল্লিতে তার দেখা হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে মি. ওয়াজেদের দপ্তরে দুজনের কথাবার্তা হয়।"

কেন এই বৈঠক?

এই বৈঠকের পটভূমি ব্যাখ্যা করে মেন্দি এন. সাফাদি জানান, ৪/৫ মাস আগে তিনি যখন শেষবার ওয়াশিংটন ডিসিতে যান, সে সময় একজন আমেরিকান বন্ধু দুজনের মধ্যে এই বৈঠকটির আয়োজন করেন। ওই বন্ধু তাকে জানান, যার সাথে দেখা হবে তিনি বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এরপর তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে সজীব ওয়াজেদের অফিসে যান। সাক্ষাতের শুরুতে মি. ওয়াজেদ তাকে বলেন যে তিনি বাংলাদেশে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। কিন্তু সজীব ওয়াজেদ যে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র মি. সাফাদি তখনও তা জানতেন না বলে উল্লেখ করেন।

কী কথা হয় দুজনার মাঝে? মি. সাফাদি জানান, বৈঠকে সজীব ওয়াজেদই মূলত কথা বলেন। তিনি শুধু শোনেন। এসময় মি. ওয়াজেদ তার কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে, বাংলাদেশের সরকার কত ভালো কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের সঙ্গে বর্তমান সরকারের সম্পর্কে কত ভালো।

মি. সাফাদি দাবি করেন যে, সারা বিশ্বে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মি. ওয়াজেদ সরকারের পক্ষে সমর্থন বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন তিনি বলেন, মি. ওয়াজেদের বক্তব্যের সাথে তিনি একমত হতে পারছেন না। তিনি তাকে বলেন, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের হত্যার খবর দেখতে

পাচ্ছেন। মি. ওয়াজেদ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এ খবরগুলো ভুল। সব মিলিয়ে বৈঠকটির স্থায়িত্ব ১৫ থেকে ১৬ মিনিটের বেশি ছিল না বলে মি. সাফাদি বিবিসিকে জানান।

২৫. বাংলাদেশে মোসাদের হস্তক্ষেপ চায় হিন্দু স্ট্রাগল কমিটি।

গত ৬ জুলাই জেরুজালেম অনলাইন-এ প্রকাশিত নিবন্ধে বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কাছে চিঠি পাঠানোর তথ্য প্রকাশ হয়।

মোসাদ সদস্য মেন্দি এন. সাফাদির মারফতে দেওয়া চিঠিতে হিন্দু স্ট্রাগল কমিটি নামক একটি সংগঠন থেকে জানানো হয়, 'বাংলাদেশের সঙ্গে ইসরাঈল রাষ্ট্রের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, এটি আমাদের ইহুদি দাদাদের জন্য দুঃখজনক। বাংলাদেশের হিন্দুদের পক্ষে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনরা কয়েক দশক পরেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে কাজ করেনি। বাংলাদেশের মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কারণেই এই সম্পর্ক স্থাপন হয়নি। বাংলাদেশের সব সরকারই মুসলিমদের দ্বারা প্রভাবিত। তাই তারা ইসরাঈল রাষ্ট্রের সঙ্গে এই অবিচার করেছে।

দ্য হিন্দু স্ট্রাগল কমিটি পরামর্শ দিয়ে বলেছে, এই অবিচার হ্রাস করতে বাংলাদেশ ও ইসরাঈলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অসম্পাদিত কাজটি করার সুযোগ তৈরি হবে। এই ধরনের আচরণের জন্য ইসরাঈলের কাছে বাংলাদেশের অবশ্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশে প্রতিটা সন্ত্রাসী হামলা বা হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকার সিআইএ'র উইং সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ কথিত আইএস'র স্বীকারোক্তির খবর প্রকাশে যেমন সন্ত্রাসী হামলায় সিআইএ'র সম্পৃক্ততা ফুটে ওঠে তেমনি বাংলাদেশের হিন্দু নেতাদের সাথে সরাসরি মোসাদ সদস্যদের কানেকশনের বিষয়টিতেও 'র' ও মোসাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি ফুটে ওঠে।

[তথ্য সূত্র: ১. ১০ জুলাই, ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত..
www.dailysangram.com/post/241902

১১ জুলাই, ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত...
https://newsnine24.com/anti-bangladesh-conspiracy-by-mossad-cia-raw/]

মোসাদের প্রধানেরা

বিভিন্ন মেয়াদে মোসাদের দায়িত্বে থাকা কর্তাব্যক্তিদের একটি তালকা নিচে তুলে ধরা হলো।

ক্রম	নাম	দায়িত্বকাল
১	রিউভেন শিলোয়াহ	১৯৫১, ১ এপ্রিল– ১৯৫২, ২২ সেপ্টেম্বর
২	ইসার হারেল	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ – ১৯৬৩
৩	মীর অমিত	১৯৬৩-১৯৬৮
৪	ভি যামির	১৯৬৮-১৯৭৪
৫	ঈঝাক হোফি	১৯৭৪-১৯৮২
৬	নাহুম আদমনি	১৯৮২-১৯৮৯
৭	শাবতাই শাভিত	১৯৮৯-১৯৯৬
৮	দানি ইয়াতুম	১৯৯৬-১৯৯৮
৯	ইফরাইম হেলভি	১৯৯৮-২০০২
১০	মির দাগান	২০০২-২০১১
১১	তামির পারদো	২০১১ সাল – বর্তমান

CamScanner

রিউভেন শিলোয়াহ : দায়িত্বকাল- ১৯৫১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৯৫২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। মোসাদ প্রতিষ্ঠার আগে তিনি দ্য সেন্ট্রাল ইন্সিটিটিউট ফর করডিনেসন-এর ডিরেক্টর ছিলেন।

ইসার হারেল : বর্তমান বেলারুশের এক ধনকুবের সন্তান ইসার হারেল। গোয়েন্দাবৃত্তির ক্ষেত্রে তাকে স্পাইমাস্টার বলা হতো। তার ভিনেগারের কারখানা ছিল। এটি তাকে তার নানা দান করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সম্পত্তি দখল করে নিলে অনেকটা খালি হাতে তারা লাটভিয়ায় চলে আসেন। আসার পথে সোভিয়েত সৈন্যরা তাদের সুটকেস চুরি করে নেয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালীন তার মধ্যে ইহুদি চেতনা তৈরি হয়। ১৬ বছর বয়সে ইসরাঈলের ইমিগ্রান্ট হন। এ সময়ে তিনি কৃষিকাজ করতেন। ১৯৫২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তাকে মোসাদের ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগে তিনি মোসাদ ও শাবাকের বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন। ১৯৬৩ সালে তিনি মোসাদ ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ইসরাঈলের পর্লামেন্ট মেম্বার নির্বাচিত হন।

মেইর অমিত : ১৯৬৩ সাল ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মোসাদের ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিজনেস স্কুল বিজনেস ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ইসরাঈল ডিফেন্স ফোর্সে মেজর জেনারেল হিসেবে যোগ দেন। তার সময়ই মোসাদের কার্যক্রম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মোসাদের হাই প্রোফাইলের স্পাইদের শীর্ষ সারির ইলি কৌহেনকে তিনি তৈরি করেন। সিআইএ'র সাথে গভীর সম্পর্কও তার সময় ঘটে।

ভি যামির : ১৯৬৮ সাল ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মোসাদের ডিরেক্টর ছিলেন পোল্যান্ড বংশোদ্ভূত ভি যামির। সাত মাস বয়সে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনে বাবা-মায়ের সাথে তিনি চলে আসেন। ১৮ বছর বয়সে যামির সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ শেষের কিছুদিন পর তাকে সাউদার্ন কমান্ডের কমান্ডার করা হয়। মোসাদের ডিরেক্টর হওয়ার

আগে তিনি লন্ডনে কর্মরত ছিলেন। তার সময় মিউনিখ হত্যাকাণ্ড, ইওম কিপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ঈঝাক হোফি : ১৯৭৪ সাল ১৯৮২ সাল পর্যন্ত মোসাদের ডিরেক্টর ছিলেন। তার জন্ম তেলআবিবে। মোসাদের প্রধান হওয়ার আগে তিনি ইসরাঈলের ডিফেন্স ফোর্সের জেনারেল ছিলেন। আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে তিনি গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ঈওম কিপুর যুদ্ধে তিনি ইসরাঈলের উত্তরাঞ্চলের কমান্ডার ছিলেন। অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত ইসরাঈল ডিফেন্স ফোর্সের নর্দার্ন কমান্ডের চার্জে ছিলেন তিনি। মিলিটারি অবসর নেওয়ার পর তাকে মোসাদের ডিরেক্টর করা হয়। ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে উগান্ডার ইনতিবি বিমানবন্দর ফ্রান্স এয়ারের বিমান ছিনতাই হলে ইসরাঈলের যাত্রীদের উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন হোফি।

নাহুম আদমনি : জেরুজালেমে জন্ম নেওয়া নাহুম আদমনি মোসাদের ডিরেক্টর ছিলেন ১৯৮২ সাল ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত। হাগানা ইন্টেলিজেন্স ব্রান্সের অধীনে তিনি আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধের পর তিনি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় লেখাপড়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখান ১৯৫৪ সালে ফিরে এসে আবার ইসরাঈলি ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে যোগ দেন। কিছুদিন পর তাকে ঈঝাক হোফির ডেপুটি নিয়োগ দেওয়া হয়। তার সময় যুক্তরাষ্ট্রে মোসাদ গোয়েন্দা তৎপরতায় জোর দেয়। ২০০৬ সালের ইসরাঈল-লেবানন দ্বন্দ্বে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

শাবতাই শাভিত : ১৯৬৪ সালে মোসাদে যোগ দিয়েছিলেন শাবতাই শাভিত। এর আগে ১৯৫৮-১৯৫৯ সালে তিনি সাউদার্ন কমান্ডের মিলিটারি গভর্নর ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তাকে মোসাদের ডিরেক্টর জেনারেল করা হয়। তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। মোসাদ অবসর নেওয়ার পর হার্জলিয়ার ইন্টারডিসিপ্লিনারি সেন্টারের ইনস্টিটিউট অব কাউন্টার টেরোরিজমের চেয়াম্যান ছিলেন

তিনি। এ ছাড়াও তিনি ইসরাঈলের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অ্যাডভাইজার, সাব-কমিটি অব ইন্টেলিজেন্স'র অ্যাডভাইজর, কমিটি ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি ও টাস্ক ফোর্স ফর ফিউচার প্রিপারডনেস অ্যাগেইনস্ট টেরোরিজমের সদস্য ছিলেন।

দানি ইয়াতুম : রাজনীতিবিদ দানি ইয়াতুম মোসাদের ডিরেক্টর ছিলেন ১৯৯৬-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত। তিনি লেখাপড়া করেন গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ে হিব্রু ইউনিভার্সিটি অব জেরুজালেমে। ১৯৬৩-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি ইসরাঈল ডিফেন্স ফোর্সে কাজ করেন। মোসাদের ডিরেক্টর হওয়ার আগে তাকে ইসরাঈলের কেন্দ্রীয় কমান্ড মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়। মোসাদের প্রধান থাকাকালীন তিনি প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাকের সিকিউরিটি অ্যাডভাইজরের দায়িত্বও পালন করেন। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর ২০০৩ সালে তিনি পার্লামেন্ট মেম্বার নির্বাচিত হন।

ইফরাইম হেলভি : ইফরাইম হেলভি তিনি ছিলেন মোসাদের নবম ও ইসরাঈলি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের চতুর্থ প্রধান। তিনি মোসাদের ডিরেক্টর ছিলেন ১৯৯৮ সাল ২০০২ সাল পর্যন্ত। যুক্তরাজ্যের এক কট্টর ইহুদি পরিবারে তার জন্ম। ১৯৪৮ সালে তিনি ইসরাঈল আসেন। ১৯৫৭ ১৯৬১ সাল পর্যন্ত

Central Institute of Coordination তিনি মান্থলি সার্ভে নামের পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এটি ইসরাঈলের চিফ অ্যাডুকেশন অফিসার বের করতেন। ১৯৬১ সালে তিনি মোসাদে যোগ দেন।

মেইর দাগান : মোসাদের বর্তমান ডিরেক্টর হচ্ছেন মিলিটারি ব্যক্তিত্ব মেইর দাগান। ২০০২ সাল তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। তার জন্ম ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯৫০ সালে তার পরিবার ইসরাঈল আসেন ও তেলআবিবের বাত ইয়মে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৩ সালে মেইর দাগান ইসরাঈল ডিফেন্স ফোর্সে যোগ দেন। ইউনিভার্সিটি অব হাইফা তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যাচেলর ডিগ্রি নেন।

CamScanner

ইসার হারেল : বর্তমান বেলারুশের এক ধনকুবের সন্তান ইসার হারেল। গোয়েন্দাবৃত্তির ক্ষেত্রে তাকে স্পাইমাস্টার বলা হতো। তার ডিনেগারের কারখানা ছিল। এটি তাকে তার নানা দান করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সম্পত্তি দখল করে নিলে অনেকটা খালি হাতে তারা লাটভিয়ায় চলে আসেন। আসার পথে সোভিয়েত সৈন্যরা তাদের সুটকেস চুরি করে নেয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালীন তার মধ্যে ইহুদি চেতনা তৈরি হয়। ১৬ বছর বয়সে ইসরাঈলের ইমিগ্রান্ট হন। এ সময়ে তিনি কৃষিকাজ করতেন। ১৯৫২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তাকে মোসাদের ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগে তিনি মোসাদ ও শাবাকের বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন। ১৯৬৩ সালে তিনি মোসাদ ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ইসরাঈলের পর্লামেন্ট মেম্বার নির্বাচিত হন।

২৭. মোসাদ প্রধানরা অবসরে গিয়ে কী করে?

যেকোনো সংস্থাপ্রধান একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম করে অবসর নেয়। বিভিন্ন দেশের দুর্ধর্ষ সংগঠনের দুর্দান্ত সব কাজের নেতৃত্ব দেওয়া কর্মকর্তাদের অবসর নেওয়ার পর আর তেমন দেখা যায় না। তবে এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম মোসাদ প্রধানরা। নীরবতা ভেঙে তারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেন। তাদের রয়েছে নিজস্ব ফোরাম, সমিতি। যেমন সম্প্রতি (২০১৮ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে) ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাবেক এক প্রধান বলেছেন, ইসরাঈল চূড়ান্তভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া একটি দেশে পরিণত হয়েছে। দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটিকে অসুস্থতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থাটির আরেক সাবেক প্রধান বলেছেন, ফিলিস্তিন-ইসরাঈল সংকট সমাধানে দ্বি-রাষ্ট্র নীতির বাস্তবায়ন না করায় ইসরাঈল এখন দুই জাতির রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। এতে গণতান্ত্রিক ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের মৃত্যু হবে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ইয়েডিওথ আহরোনোথকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাবেক ৬ গোয়েন্দা

প্রধান দাবি করেন, ইসরায়েলের দখল করা ফিলিস্তিনি এলাকাগুলোতে ইহুদি ও আরব জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান হয়ে গেছে। প্রকাশিত এসব সাক্ষাৎকারের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, নেতানিয়াহু এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য দেননি। তবে সরকারের একজন মন্ত্রী অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে টুইট করেছেন।

ইসরায়েলের ৬ সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সমালোচনা করে বলেছেন, তার নেতৃত্বে ইসরাঈল দুর্বল হয়ে পড়েছে; তিনি দেশটির ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন করছেন। সাক্ষাৎকারে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় থাকা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থাও প্রকাশ করেন তারা। নিয়মিত নেতানিয়াহুর সমালোচনা করা ইসরায়েলি পত্রিকাটির প্রথম পাতায় সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়।

৯০-এর দশকের শেষ দিকে নেতানিয়াহুর প্রথম সরকারের আমলে মোসাদের নেতৃত্বে ছিলেন ড্যানি ইয়াতোম। তিনি অভিযোগ করেন, নেতানিয়াহু ও তার সঙ্গীরা জাতীয় স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। ইয়াতোম ফিলিস্তিনিদের নিয়ে ইসরায়েলের 'দুই জাতির রাষ্ট্রে' পরিণত হওয়ার বিষয়ে তার আশঙ্কার কথা জানান। তার মতে, সেরকম হলে একটি গণতান্ত্রিক ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের মৃত্যু হবে।

২০১৪ সাল থেকে থেমে আছে দুই রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ইসরাঈল-ফিলিস্তিন সংকট নিরসনের আলোচনা। ইয়াতোম সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, দুই রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা সমাধানটি যদি বাস্তবায়ন করা না হয়, তাহলে ইসরাঈলই দুই জাতির রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বিশ্লেষকরা বলেছেন, ফিলিস্তিনের অধিকৃত এলাকা ছেড়ে না দিলে ইসরায়েলের সামনে দুটো পথ খোলা থাকবে। এক, ফিলিস্তিনিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে একটি গণতান্ত্রিক দেশে হিসেবে থাকা। অন্যটি, ইহুদিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে ফিলিস্তিনিদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া।

CamScanner

ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলেন, ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী গাজা উপত্যকা ও জর্ডান নদীর তীরবর্তী পশ্চিম তীরের অধিকৃত এলাকাগুলোতে ইহুদি ও আরব জনসংখ্যা প্রায় সমান হয়ে গেছে। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মোসাদ প্রধানের দায়িত্ব পালন করা কর্মকর্তা জামির বলেছেন, 'আমদের পৌত্র, প্রপৌত্ররা এখানে থাকে। আমরা চাই তারা একটি সুস্থ পরিবেশে থাকুক। কিন্তু ইসরাঈল অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমরা চরমভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া একটি দেশে আছি। নেতানিয়াহু ক্ষমতা হতে নেওয়ার সময়েই ইসারেয়েলের অসুস্থ হয়ে পড়ার এই লক্ষণগুলো দেখা যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু নেতানিয়াহু দেশটিকে অসুস্থতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন।'

নেতানিয়াহু এর প্রতিবাদে সরাসরি কিছু বলেননি। তবে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী বেনেট টুইটার বার্তায় এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, 'একেবারেই অসত্য।' নিজেকে নেতানিয়াহুর সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে সামনে নিয়ে আসা বেনেটের ভাষ্য, 'ইসরাঈল খুব ভালো অবস্থায় আছে।'

উল্লেখ্য, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত চলছে। পুলিশ নেতানিয়াহুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। দুর্নীতির অভিযোগে দেশটির সবচেয়ে বড় ফোন পরিসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নেতানিয়াহুর নাম জড়িয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে আরও দুটো অভিযোগ। নেতানিয়াহু অবশ্য তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২৮. মোসাদ সংক্রান্ত ডকুমেন্টরি/নিউজ শো

মোসাদের গুপ্ত হত্যা নিয়ে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য ডকুমেন্টারি, নিউজ/টক শো, মুভি, শর্টফিল্ম, এমনকি হলিউড মুভি। নিচে কিছু তুলে ধরা হলো।

মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয় সংবাদভিত্তিক চ্যানেল আল জাজিরার কিছু ডকুমেন্টারি...

1. Inside Israel's Mossad: Efraim Halevy on UpFront
2. Ex-Israeli spy chief: Iran isn't an existential threat | UpFront
3. Ex-Mossad head on Israel medical aid to al-Nusra Front – UpFront
4. Kill Him Silently: Part 1 | Al Jazeera World
5. Kill Him Silently - Part 2 - Al Jazeera World
6. Fathi Shaqaqi: Don't Kill Him in Damascus - Al Jazeera World
7. El Salvador: Assassins For Sale । Al Jazeera Investigates
8. The Beirut Spy: Shula Cohen । Al Jazeera World
9. The Spy Cables: Decoded - Episode one
10. The Spy Cables: Decoded - Episode two

বিবিসির ডকুমেন্টারি..

1. Interview: Fmr. Director of Mossad (2002-2010) - Meir Dagan
2. Israel's War (BBC Documentary)

cbnnews.com এর ডকুমেন্টারি

১. 'Rise and Kill First': Israel's History of Targeted Killing

২৯. মোসাদসংক্রান্ত মুভি

মোসাদসংক্রান্ত অনেক মুভি চলচ্চিত্র শর্টফিল্ম মুভিজগতে দেখা যায়। যার বেশির ভাগই এডভেঞ্চার, একশন, ডিকেকটিভ আর থ্রিলার মুভি। দর্শকমাত্রই আকর্ষণ করা এসব মুভি সাধারণত ইহুদি সংস্থার অর্থায়ন,

প্রযোজনা ও পরিচালনায় তৈরি। কিন্তু ঠিক কী কারণে এগুলো তৈরি করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। এই মুভিগুলোর উদ্দেশ্য কি মোসাদকে প্রমোট করা নাকি মোসাদের ব্যাপারে ভীতি ছড়ানো তা এক রহস্যই বটে। নিচে এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা...

1. Mossad 101 ইসরাঈলি টেলিভিশনে প্রচারিত একটি অ্যাকশনধর্মী মুভি। হিব্রু ভাষায় নির্মিত মুভিটি ২০১৫ সালের ১৩ অক্টোবর চ্যানেল টুতে প্রচারিত হয়। এতে ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে কাল্পনিক চিত্র ধারণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে এটি ধারবিাহিক সিরিয়াল হিসেবে প্রচারিত হয়। http://www.israelfilmcenter.org/israeli-film-database/subject/Mossad

2. The Debt (2007 film) –১৯৬৫ সালে তিনজন মোসাদ গুপ্তচর যারা এক নাৎসিবাহিনীর সদস্যকে আটক করে কিন্তু বিচারের সম্মুখীন করতে পারেনি। ৩৫ বছর পর আবার তাকে আটক করে বিচারের সম্মুখীন করা হয়-ছবিটির মূল উপজীব্য। SUBJECT: Crime, Mossad, Holocaust, DIRECTOR: Assaf Bernstein PRODUCERS: Eitan Evan PRODUCTION COMPANY:EvanstoneFilmsLtd. eithan@evanston-films.com, www.evanstone-films.com FILM DISTRIBUTOR: TriCoast Worldwide www.tricoastinternational.com/

3. Minoutor -Alex Abramov একজন মোসাদ এজেন্ট । সে ঞযবধ নামের এক সুন্দরী ললনার প্রেমে পড়ে। কিন্তু পেশাগত চ্যালেঞ্জ নিতে গিয়ে সে প্রেমকে বিসর্জন দিতে হয়। SUBJECT: Romance, Mossad DIRECTOR: Jonathan Tammuz PRODUCERS: Shai Bar, Levi, Micki Rabinovich, Irving S. White, Dan Turgeman PRODUCTION COMPANY: Minotaur Productions, Top Line Communications. yuval@toplinetv.co.il,

www.toplinetv.co.il FILM DISTRIBUTOR: Cinema Pardes, Columbia TriStar Home Video

4. The Debt (2010 film)
5. License to Kill (2013 film)
6. The Little Drummer Girl (film)
7. Munich (film)
8. The Odessa File (film)
9. The Patriots (film)
10. The Red Sea Diving Resort
11. Steal the Sky
12. The Uranium Conspiracy
13. Walk on Water (film)
14. Eichmann (film)
15. The Eichmann Show
16. The House on Garibaldi Street
17. The Man Who Captured Eichmann
18. The People vs. Fritz Bauer

৩০. মোসাদসংক্রান্ত বই

মোসাদসংক্রান্ত অসংখ্য বই পত্র লেখা হয়েছে বিশ্বব্যাপী। রোমহর্ষক সব অভিযান নিয়ে লেখা সেসব বইয়ের মধ্যে বেস্ট সেলারও আছে অনেক। এরকম বইয়ের কিছু নাম...

1. Spies against Armageddon inside Israels's Secret War –by Dan Raviv

CamScanner

২. Behind the Uprising: Israelis, Jordanians, and Palestinians -by Yossi Melman

৩. The Nuclear Sphinx of Tehran: Mahmoud Ahmadinejad and the State of Iran –by Yossi Melman, Meir Javedanfar

৪. The New Israelis: An Intimate View of a Changing People –by Yossi Melman

৫. Elvis in Jerusalem: Post-Zionism and the Americanization of Israel –by Tom Segev

৬. Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services –by Ian Black, Benny Morris

৭. Dangerous Liaison: The Inside Story of the U.S.-Israeli Covert Relationship –by Andrew Cockburn, Leslie Cockburn

৮. Israeli Secret Services –by Frank Clements

৯. Guards Without Frontiers: Israel's War Against Terrorism –by Samuel M. Katz

১০. Israel Undercover –by Steve Posner

১১. The Spymasters of Israel –by Stewart Steven

১২. The Mossad Inside Stories: Israel's Secret Intelligence Service –by Dennis Eisenberg, Uri Dan, Eli Landau

১৩. The spy from Israel –by Ben Dan

CamScanner

১৪. The Secret War –by Ben Dan

১৫. The silent warriors –by Joshua Tadmor

১৬. The Israeli secret service –by Richard Deacon

১৭. Spy! –by Richard Deacon, Nigel West

১৮. A history of the Israeli Army, 1874 to the present –by Zeev Schiff

১৯. A History of the Israeli Army: 1870 – 1974 –by Zeev Schiff

২০. The Israeli Army –by David Eshel

২১. Israel at war, June 5-10, 1967: a pictorial record –by Eli Ered

২২. The Israeli commando's [!] –by David Eshel

২৩. A Never-ending Conflict: A Guide to Israeli Military History –by Mordechai Bar-On

২৪. Israel's Wars: A History Since 1947 –by Ahron Bregman

CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়

১. 'র' কী?

'র' আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা। ইংরেজি Research and Analysis Wing (RAW) (রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং) এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'র'।

আলোচিত এই গোয়েন্দা সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৬৮। তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। নয়াদিল্লী হচ্ছে 'র'-এর (RAW) কেন্দ্রবিন্দু। আনীল দশমনা এজেন্সির বর্তমান (২০১৮) নির্বাহী প্রধান। 'র'-এর প্রধান এজেন্সি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। 'র' ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা। তবে কেউ কেউ একে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা বলেও মনে করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ত্রাস সৃষ্টিকারী এই গোয়েন্দা সংস্থাটি ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার ও আইবি'র ডেপুটি ডাইরেক্টর আর.এন.কাও'র নেতৃত্বে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চীন (১৯৬২) এবং পাকিস্তান (১৯৬৫) এর সাথে যুদ্ধে পরাজয়ের পর ভারত সরকার উপলব্ধি করে তাদের একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা দরকার। আর জনাব কাও ইন্দিরা সরকারকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব না। পরে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে কাও 'র'-এর নীল নকশা আঁকেন। শুরুতে মাত্র ২৫০ জন জনবল আর ২ কোটি রুপি বাজেট নিয়ে কাও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৯৭১ সালে কাও আকাশ গোয়েন্দা পরিচালনার জন্য Aviation Research Centre (ARC) গঠন করতে বাধ্য করেন। ১৯৯০ সালে 'র' প্রথম প্যারা মিলিটারি বাহিনী Sepecial Frontier Force (SFF)

গঠন করে। ভারত সরকার ২০০৪ সালে এর সাথে যোগ করেন National Technical Facilities Organisation (NTFO), National Technical Research Organization (NTRO) নামে দুটি সংগঠন।

২. 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'র'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ (RAW Objectives) ব্যাপক অর্থে নিম্নলিখিত নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত:

১। পার্শ্ববর্তী সকল দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলি ও অবস্থান, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সরাসরি জড়িত এবং ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী এমন বিষয়ে খবর রাখবে।

২। দ্বিতীয়ত, 'র' আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক মতভেদ সম্পর্কীয় ঘটনাবলির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে; কারণ এ দুই পরাশক্তির ভারতীয় সমাজতান্ত্রিকতায় ও অন্যান্য দেশে সরাসরি সম্পৃক্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

৩. তৃতীয়ত, পাকিস্তানে বিপুল সমরোপকরণ সরবরাহ সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়, বিশেষ করে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ভারতের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়।

৪. সর্বশেষ কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য হলো যে, বিভিন্ন গোত্রের বিপুলসংখ্যক ভারতীয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে আসছে। 'র'-এর দায়িত্ব সেসব 'পরবাসী' ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠায় বিশেষ দৃষ্টি রাখা।

তবে ভারত সরকার বর্তমানে (মোদীর বিজেবি দল) ভারতীয় উপমহাদেশে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে জোর দিয়েছে। যা হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির প্রধান রাজনৈতিক এজেন্ডা। সুতরাং এটি রাষ্ট্রের অলিখিত প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক।

CamScanner

অত্যন্ত জটিল ও 'টেকনিক্যাল' তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে জড়ো করে ওগুলোর বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। তাই সংস্থার জন্য অত্যন্ত যত্ন ও নিরাপত্তার সাথে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই এর পর এজেন্টে নিয়োগ করা।

সংস্থার ব্যাপ্তি বাড়ার সাথে সাথে একটি 'নিয়মিত ক্যাডারের' প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। যাতে সংশ্লিষ্ট জনশক্তির দক্ষতা প্রকাশের মাধ্যমে উৎকর্ষ লাভের পথ খোলা থাকে ও পদোন্নতি প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে 'র'-এর সকলেই ছিল অন্যান্য সংস্থার ধারকৃত সদস্য যাদের জন্য এক সময় 'পে-স্কেল' ও পদবীর সাদৃশ্য রক্ষা করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ বাহিনী থেকে আসা সদস্যদের 'পদোন্নতি' ও 'জৈষ্ঠতার' ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রীতি থাকলেও অন্যান্য অনেক বাহিনী ও সংস্থার লোকজন নিয়ে তীব্র সমস্যার সৃষ্টি হয় (বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর পদোন্নতি ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো ছিল অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা প্রকৃতির)। আবার অনেকের ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্বের সংস্থায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত পদোন্নতির কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এসব সমস্যার কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি।

অতঃপর ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে একটি 'নিয়মিত ক্যাডার সার্ভিস' গঠনের মাধ্যমে সংস্থাকে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ভিত্তি প্রদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য সংস্থা থেকে লোক নিয়োগের সমস্যা দূর করা, যারা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থা থেকে আসার কারণে একই কাজ করে ভিন্ন বেতন পাওয়ার হতাশায় নিমজ্জিত ছিলেন। তখন শোনা গিয়েছিল যে সরকার 'র' এক্সিকিউটিভ ক্যাডার' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পূর্বেই 'জনতা পার্টি' সরকার গঠন করে এবং 'অনুমোদন' 'হিমাগারে' স্থান লাভ করে। এরপর এ প্রস্তাব শুধু কল্পনাই রয়ে যায় এবং 'র' পূর্বাপর অন্যান্য সংস্থা থেকে অস্থায়ী ভিত্তিকে প্রেষণে (OSD) এক্সিকিউটিভ নিয়োগ অব্যাহত রাখে।

৩. 'র'-এর কাজ কী?

'র'-এর প্রধান কাজ হলো বিদেশি গোপন গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কাউন্টার টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং গোপন অপারেশন পরিচালনা। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ যাদের সাথে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ওই সব দেশের বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণে ভূমিকা রাখাও 'র'-এর অন্যতম কাজ।

'র' বিদেশি সরকার, ব্যবসায়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে থাকে এবং সে অনুযায়ী ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদের পরামর্শ দিয়ে থাকে। এশিয়ায় সর্বাধিকসহ বিশ্বের অনেক দেশেই 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে। সবচেয়ে মজার তথ্য হচ্ছে 'র' তাদের যাবতীয় গোয়েন্দা প্রযুক্তি ও অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য মোসাদের সহযোগিতা পেয়ে থাকে। আর বর্তমান মোদি সরকারের সাথে ইসরাঈল তথা মোসাদের সম্পর্ক অতীতের যেকোনো ভারত সরকারের চাইতে ঘনিষ্ঠ। বলা যায় ইসলামি দুনিয়ার বিপক্ষে ইহুদিবাদী ও মূর্তিপূজারি মুশরিকদের গলায় গলায় মিল হয়েছে এবার।

৪. 'র' কীভাবে গঠিত হয়েছিল?

প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক অশোকা রায়না তার 'ইনসাইড 'র' বইয়ের ২য় অধ্যায়ে 'যাত্রা হলো শুরু (From The Beginning)' শিরোনামে 'র' গঠনের প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করেন এভাবে...

ক. ব্রিটিশ গুপ্তচরবৃত্তির স্বার্থ (British Intelligence Interest)

ভারতের ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর স্বার্থ মূলত দুটি বিষয় ঘুরে আবর্তিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তব্যাপী আফগান ও উপজাতিদের সাথে স্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহ এবং সীমান্তের ওপারে রাশিয়ার অবস্থান-ব্রিটিশদের এদিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ

তৃতীয়াংশ জুড়ে রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী তৎপরতার আশঙ্কা 'খাঁটিসত্য' বলেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে ও উপমহাদেশের কর্তৃত্ব নিয়ে একটি 'এ্যাংলো রাশিয়ান' যুদ্ধ শুধু আশঙ্কা নয় বরং অবশ্যম্ভাবী রূপ ধারণ করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী (MI-6) এবং ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত 'গোয়েন্দা দপ্তর' অত্যন্ত কর্মতৎপর হয়ে উঠে। যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন গোয়েন্দা দপ্তরকে ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় মনোনিবেশ করতে আদেশ দেওয়া হয় এবং সীমান্তের বাইরে 'বার্মা' ও 'সিঙ্গাপুর' নিয়ে গও-৬ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম গতি লাভ করতে সক্ষম হয় ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত 'অহিংস' আন্দোলন অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংস্থার অংশগ্রহণে সহিংসরূপ পরিগ্রহ করে। এ সমস্ত আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে এবং গোয়েন্দা দপ্তর ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের বিভিন্ন নেতৃবর্গের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হয়।

গোয়েন্দা দপ্তরের প্রাথমিক কাজ ছিল ব্রিটিশ ভারতের সব রাজনৈতিক দলের ওপর বিশেষ ফাইল বা রেকর্ড রাখা। এদিকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন গতি লাভ করে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বে 'ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী' (Indian National Army) গঠন করা হয়। এর নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা ছিল এবং 'নেতাজী' ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করার চেষ্টায় জাপানী ও জার্মান কর্তৃপক্ষের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে থাকেন। গোয়েন্দা দপ্তর এ সব কার্যক্রম মোকাবিলা করার জন্য ভারতের বিভিন্ন শহরে বিশেষ গোয়েন্দা সেল গঠনের উদ্যোগ নেয়। এ সব সেলের দায়িত্বে ছিলেন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা, যার অফিস ছিল গোয়েন্দা সদর দপ্তরে। যেসব ভারতীয় ওখানে কাজ করতেন তারা ব্রিটিশদের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত ছিলেন।

সীমান্তের বাইরে গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ সামরিক ধাঁচের হওয়ায় ওগুলোর দায়িত্ব 'MI-6' এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। 'MI-6' তখন অনেকের কাছে

ব্রিটিশ রাজ্যে গোপন সংস্থারূপেই পরিচিত ছিল। ব্রিটিশরা নিজেরাই ভালো বলতে পারবে কি কারণে কারা এখন পর্যন্ত অনবরত এ ধরনের একটি সংস্থার কথা অস্বীকার করে আসছে? ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী 'অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের' আওতায় কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী ওই সংস্থা প্রধানের' নাম পর্যন্ত উল্লেখ্য করতে পারেন না।

খ। নব যাত্রা (Building Up De Novo)

ব্রিটিশ 'গোয়েন্দা বাহিনীর' ছেড়ে যাওয়ার তথ্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য না করেও এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাদের ফেলে যাওয়া দলিলপত্র ও তথ্যাদি নব্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর (IB=Intelligence Bureau) কোনো উপকারে আসেনি। বরং যা অবশিষ্ট ছিল তা হলো 'তলাহীন ঝুড়িতে' সংরক্ষিত অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র। সুতরাং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেই আবার 'প্রথম থেকে' যাত্রা শুরু হয়। মূলত একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থার (IB) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সে অনুযায়ী রূপরেখা প্রণয়ন করায় বৈদেশিক গোয়েন্দা দপ্তরের ফাইলপত্র সরকারের টেবিলে অবহেলায় পড়ে থাকে।

দুবছর পর ১৯৪৯ সালের প্রথমদিকে পিল্লাই একটি ছোটখাটো বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা সংগঠিত করেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাকিস্তান, জার্মানি ও ফ্যান্সের দূতাবাসে 'ফার্স্ট সেক্রেটারী' পদমর্যাদার একটি পদ সৃষ্টির জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দেনদরবার চালিয়ে যান।

প্রথম ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ওই সব দেশে নিয়োগ লাভ করেন। জার্মানি ও ফ্রান্সে নির্বাচিত কর্মকর্তারা নিয়মিত গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য ছিলেন না বা তাদের অন্যান্য সংস্থা থেকে সংগ্রহ করায় তাঁদের পরিচয় শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

গ। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (Internal feuds)

এক বছর পর, ১৯৫০ সালের শেষদিকে পিল্লাই স্বরাষ্ট্র সচিব আর.এন. ব্যানার্জির সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। স্বরাষ্ট্র সচিবকে তার সমসাময়িক

সকলেই 'নিজস্ব তৈরি আইনে বাচাল কাজে পারদর্শী' বলে ভাবতেন, যিনি (স্বরাষ্ট্র সচিব) সব সময় তাঁর সাথে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের বিশেষ সুসম্পর্কের কথা ফলাও করে প্রচার করতে ভালোবাসতেন। পিল্লাই ও ব্যানার্জীর ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব দিন দিন বাড়তে থাকে ও এ ব্যাপারে সরব আলোচনার সূত্রপাত হয়, যখন পিল্লাই যুক্তরাষ্ট্রের (U.S.A) শিক্ষা সফরের ওপর রিপোর্ট পেশ করতে দেরি করে ফেলেন, যেখানে সিআইএ'র ওপর বিশেষ পর্যালোচনা সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত ছিল। এ দেরি করে ফেলায় শেষ পর্যন্ত 'সঠিক চিন্তার উপযুক্ত ব্যক্তিটির' দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং শীঘ্রই পিল্লাই অপসারিত হন ও বি এন মালিক গোয়েন্দা দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ঘ। বি এন মালিকের দায়িত্ব গ্রহণ
(B.N Malik Takes Over)

ভারতীয় পুলিশ বিভাগের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির গোয়েন্দা বাহিনীর (IB) প্রধান পদে নিযুক্তির নীতি ভঙ্গ করে বি এন মালিককে তড়িঘড়ি নিয়োগ দান করা হয়। এ জন্য তিনি এক বছর অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন। ততদিনে মালিক পিল্লাই প্রবর্তিত পদ্ধতির ভালো দিকগুলোর যৌক্তিকতা স্পষ্ট বুঝতে পারলেও ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন। তাঁর গৃহীত প্রথম 'পুনঃমেরামত করা'র পরিকল্পনা মতে পিল্লাইয়ের বিদেশে পাঠানো প্রথম দুজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে দেশে ডেকে আনা হয়। তিনি এভাবে "পূর্বসূরি সিনড্রোমের" প্রচলন করেন এবং আজ পর্যন্ত ওই ধারাই সকলে অনুসরণ করে আসছে। ভালো হোক আর মন্দ হোক 'পূর্বসূরির' হাতে নিয়োগ পাওয়া কোনো ব্যক্তিকে নতুন প্রধান আসার সাথে সাথেই বদল করা হয়। ওই শেষ দুজন কর্মকর্তাকে সরিয়ে আনার পর, তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় গোয়েন্দা বৃত্তির জাল ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আরো অনেক লোককে নতুন নতুন জায়গায় নিয়োগ করেন- বিশেষ করে চীনে নজর রাখার জন্য তিব্বত ও

সিকিমের 'আউটপোস্ট' দুটো ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশ পরিত্যক্ত এ 'আউটপোস্ট' দুটো তখন পর্যন্ত অব্যবহৃত ছিল।

১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান (করাচী, লাহোর, ঢাকা), বার্মা ও সিলোনে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) আরো নতুন 'আউটপোস্ট' খোলা হয়। অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণের প্রয়োজনে 'বৈদেশিক ডেস্কের' সংখ্যা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

ঙ। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যবর্তী বছরগুলোয় গোয়েন্দা সংস্থায় (ওই) এস পি ভারমা ও এম এস এল হোজা নামে আরো দুজন পরিচালকরূপে নিয়োজিত হন। এদিকে কর্মক্ষেত্রও দিনদিন প্রসারিত হতে থাকে। অভ্যন্তরীণ সমকেন্দ্রিক বৃত্তছোয়া বার্মা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও নিকট পরিমণ্ডলে অবস্থিত দেশগুলো নিয়ে আরেকটি নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। যার প্রান্ত ছুঁয়ে ছিল মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অঞ্চল।

চ। পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা এজেন্সির জন্ম (Birth of Separate foreign Intelligence Agency)

এর দ্রুত বৃদ্ধিলাভ সত্ত্বেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ধারণা করা হয় যে, 'ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা ডেস্ক' একটি 'হতাশাপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে'। কারণ এ সংস্থা ভারতের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত তথ্য, বিশেষ করে পাকিস্তানের অভিপ্রায় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতেও ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বিদেশি কর্মকর্তাকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে এবং গোয়েন্দা সংস্থায় অতি আবশ্যকীয় সমন্বয় ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ 'বৈদেশিক ডেস্কে' নেই বললেই চলে।

১৯৬৮ সালের মধ্যে ভারতে একটি উপযোগী ও আলাদা বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইতোমধ্যে ১৯৪৭-৪৮ সালে পাকিস্তানের সাথে সংঘর্ষে এরূপ সংস্থার অনুপস্থিতি প্রচণ্ড

বিপর্যয় ডেকে আনে; অবশ্য তখন 'অভ্যন্তরীণ' ও 'বৈদেশিক' কোনো গোয়েন্দা সংস্থার আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এর পরপরই ১৯৬২ সালে চীনের আগ্রাসন ও তারপর পাকিস্তানের সাথে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা এজেন্সি না থাকায় বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ১৯৬৭ সালে সিকিমের 'নাথুলা'য় গোলন্দাজ গোলা বিনিময়ের সময়ও এরূপ পিরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল (চীনের সাথে সংঘর্ষ)।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তারের সাথে যুদ্ধে চীনা সীমান্ত সচল হয়ে ওঠে এবং চীন-ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের হুমকি দেয়। অবশ্য পরে চীন এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান বিরোধের সময় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ভারতে হতাশাব্যঞ্জক অপ্রতিভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর ভারতীয় চিন্তাবিদরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে একটি পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের চিন্তা–ভাবনা আরম্ভ করেন।

পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা একে অপরের ওপর দোষ/দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। দু-সংস্থার লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান স্বয়ং এই বলে প্রচারে অংশ নেন যে, "প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য সহজলভ্য নয়।" কিন্তু এ সব লোকদেখানো সম্মুখ সমরের পশ্চাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর কিছু কিছু অংশ নিজেদের আওতায় বৈদেশিক গোয়েন্দা বাহিনী গঠনের তদবির চালিয়ে যায়। বিষয়টির নিষ্পত্তি ও কর্তব্যে অবহেলার দোষারোপ তাদারকের জন্য অবশেষে প্রতিরক্ষা সচিব পি ভি আর রাও এবং স্বরাষ্ট্র সচিব এল পি সিং সমন্বয়ে দুই সদস্যের একটি 'কমিশন' গঠন করা হয়।

কে. শংকর নায়ার তখন গোয়েন্দা সংস্থার (ওই) পাকিস্তান ডেস্কে নিয়োজিত ছিলেন। তাকে ৬০টির অধিক গোয়েন্দা রিপোর্ট (পাকিস্তান ও অন্যান্য স্থান থেকে এজেন্টদের পাঠানো বিভিন্ন রিপোর্ট) সঠিকভাবে সন্নিবেশিত/সংকলিত করার আদেশ দেওয়া হয়। দু-সদস্যের কমিশন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অভিযোগের সুষ্ঠ জাবাব দিতে গোয়েন্দা সংস্থাকে (ওই) নির্দেশ দেন। নায়ার পরে এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন যে, তিনি ও তাঁর সকল কর্মকর্তারা সে রাতে দুটা পর্যন্ত যেসব রেকর্ডপত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তা সংগ্রহ করতে ফিলিং রোডের অস্থায়ী অফিসে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্মিত কেন্দ্রীয় সচিবালয় সন্নিকটস্থ ব্যারাক) কর্মব্যস্ত থাকেন। সমস্ত রিপোর্ট সংকলিত করার পর নায়ার মন্তব্য করেন, (যা পরে তাঁর অধীন এক কর্মকর্তা উল্লেখ্য করেছিলেন। "জন্ম বুদ্ধু ও হাবাগঙ্গারাম ছাড়া এসব এড়িয়ে যাওয়া বা বুঝতে না পারা কারে পক্ষে সম্ভব নয়।" নায়ার এ ক্ষেত্রে রিপোর্টে উল্লিখিত ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানি সমাবেশের প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যের উল্লেখ করেছিলেন। শীঘ্রই একটি বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, রাও ও সিং দুজনই নায়ারের প্রদত্ত 'জবাবের' সাথে একমত পোষণ করেন। কমিশন অতঃপর প্রাপ্ত তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেন, "আনীত অভিযোগসমূহ ব্যাপক অর্থে সঠিক নয়, গোয়েন্দা তথ্যাদি সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু ওই সমস্ত তথ্যাদির সঠিক বিশ্লেষণ করা হয়নি, যদি তা করা হতো তবে প্রাপ্ত গোয়েন্দা সূত্রসমূহই ধাঁধার উপযুক্ত জবাব দিতে পারত। গোয়েন্দা সংস্থা ও এর বৈদেশিক গোয়েন্দা ডেস্ক ভালোভাবেই তাদের মাল-মশলা সরবরাহ করছিল।"

এদিকে ১৯৬৬ সালের শেষ থেকে ১৯৬৭ সালের শুরুর মধ্যবর্তী সময়েই পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা এজেন্সি গঠনের ধারণা বাস্তবরূপ লাভ করে। প্রথমিক পর্যায়ে এই সংস্থাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পরিচালনা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ ধারণা ইতোমধ্যেই যুদ্ধকালীন প্রচারণা "প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য সহজলভ্য নয়" এ যুক্তিকে লালন করেছে ও যার ফলে দু-সদস্যের কমিশন গঠন করা হয়। এ লক্ষ্যকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জেনারেল চৌধুরী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবনের তত্ত্বাবধানে ব্রিগেডিয়ার এস এন ভদ্রের পেশকৃত একটি রিপোর্টের পর্যালোচনা করার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তাকে প্রতিরক্ষা

মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেওয়ার প্রতিবাদ করা হয়। এ সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ ও মন কষাকষির সৃষ্টি করে ও দুই মন্ত্রণালয়ই গোয়েন্দা সংস্থার একক দাবিদার বলে ধারণা পোষণ করতে থাকে।

এরপর সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটিকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন গঠিত বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা স্থপতি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং ও তার প্রধান মুখ্যসচিব পি এন হাকসার। তাঁর উভয়েই বিস্তৃত পরিসরে ভারতের বৈদেশিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৬৮ সালে এ সংস্থার জন্ম ও এর চূড়ান্ত অবকাঠামো তৈরির সময় কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। জনগণ ক্রমান্বয়ে অভিযোগ করতে থাকে, এ সংস্থা শ্রীমতী গান্ধীর "গোপন পুলিশ বহর" বই আর কিছুই নয় এবং সম্ভবত শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রী চ্যাবনের অতীত মতদ্বৈততার কারণেই (প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণের নেওয়ার ব্যাপারে) এ ধরনের জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু খুব কম জনগণই তখন এটা বুঝতে সক্ষম ছিল যে, শ্রী চ্যাবনের মতামত ও অনুমোদন নিয়েই বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তি তদারকে পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

অন্য আর যে কারণটি 'বিকৃত চিত্র অঙ্কনে' সাহায্য করে তা হলো, ভারত আর দশটা উন্নয়নশীল (কিছু কিছু উন্নত দেশও) দেশের মতো বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থাকে 'বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা' হিসেবে উল্লেখ করতে ইতস্তত করে আসছিল।

৫. যেভাবে নামকরণ হয় 'র' (R & A.W)

একই বইয়ের ২য় অধ্যায়ে 'যাত্রা হলো শুরু (From The Beginning)' শিরোনামে 'র'-এর নামকরণ কীভাবে হয় তার আলোচনায় বলা হয়, "... এরপর নতুন সংস্থার জন্য উপযুক্ত নাম খোঁজার পালা। সম্ভবত কেবিনেট সচিবের দেওয়া দীর্ঘ তালিকা থেকে রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস

উইং নামটি বাছাই করা হয় এবং এভাবেই ভারতের প্রথম বৈদেশিক গোয়েন্দা বাহিনীর জন্ম হয়।

প্রথমে "R&A.W." হিসেবে উল্লেখ করা হলেও পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক সমাজ এ সংস্থাকে "RAW" নামে উল্লেখ করা আরম্ভ করে, যা আজকের বিশ্বে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও প্রচলিত।"

৬. 'র'-এর প্রথম প্রধান নিয়োগ হয় যেভাবে

অশোকা রায়না তার 'ইনসাইড র' বইয়ে লেখেন, "...'র'-এর প্রধান পদটির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, অভিজ্ঞতা ও গুপ্তচরবৃত্তির বিশেষ নৈপুণ্যে পারদর্শী খুব কম লোকই শনাক্ত করা সম্ভব ছিল। অবশেষে সকলে কাও-এর দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং ভারতীয় সরকারও তাঁর থেকে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত কোনো ব্যক্তির সন্ধান না পেয়ে তাঁকে নিয়োগ দান করেন।

রামেশ্বর নাথ কাও আই বি (ওই) তে তাঁর কার্যকালে গুপ্তচরবৃত্তি ও গোয়েন্দা জগতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিরূপে সকলের নজর কাড়তে সমর্থ হন, যিনি নেহরুর সময় ষাট দশকের মধ্যভাগে পাঠপর্যায়ে কর্মরত ছিলেন। তখন ১৯৬০ সালের ১ জুলাই ঘানা সদ্য স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে প্রেসিডেন্ট নক্রুমা ঘানায় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের জন্য ভারতের সাহায্য লাভের আশা প্রকাশ করেন। নেহেরু এ প্রস্তাবে তৎক্ষাণাৎ রাজি হয়ে যান এবং এর পরপরই দুজন কর্মকর্তা যথাক্রমে আর এন কাও ও কে শংকর নায়ারকে প্রেষণে (Deputation) ঘানায় পাঠানো হয়। এ দু-ভদ্রলোকই পরবর্তী বছরগুলোতে এলোমেলো অবস্থা থেকে ঘানার গুপ্ত সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তাদের কঠিন প্ররিশ্রমের ফলে শূন্য অবস্থা থেকে ঘানার গুপ্ত সংস্থা একটি অবয়ব লাভে সক্ষম হয়। কাও এর অবকাঠামো রূপায়ণ করেন ও ভিত্তিস্থাপনের পর নায়ার তাঁর ক্রমাগত চেষ্টয় 'ঘানা গুপ্তচর সংস্থা' সচল করে তুলতে সক্ষম হন। তাদের ঘানায় অর্জিত সুনাম ও অতীতের মাঠপর্যায়ের দক্ষতা তাদের একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌছতে সাহায্য করে। আট বছরের মধ্যে (ঘানার কাজ করার পর)

তাদের যথারীতি মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতাধীন R.A.W-(Research & Analysis Wing) দায়িত্বশীল আসনে নিয়োগ করা হয়। অবশেষে ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টম্বর R.A.W গঠনের চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা হয়। বড় কোনো হৈ চৈ ছাড়াই কাও ও নায়ারসহ আরে ২৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ওই থেকে 'র'-এর কার্যক্রম শুরু করতে হয় এবং দক্ষিণ ব্লকের তথাকথিত 'স্পেশাল উইং'-এ কাও তাঁর নিজস্ব অফিস স্থাপন করেন।"

৭. 'র'-এর প্রথম লক্ষ্যমাত্রা ও কিছু সমস্যা

সাংবাদিক নায়ার বলেন, "গোয়েন্দা কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনায় ভারতের প্রাথমিক মাথাব্যথা পাকিস্তান ও চীনসংক্রান্ত ডেস্কের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সাধন জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। 'রাও ও সিং কমিশন' ১৯৬৫ সালের ব্যর্থতার জন্য সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য ও এর গবেষণা এবং পর্যালোচনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে দায়ী বলে মত প্রকাশ করেন। শংকর নায়ার, যিনি পূর্বে ওইতে পাকিস্তান ডেস্কে কর্মরত ছিলেন, তিনি এসব 'ব্যবধান' চিহ্নিত করতে ও এর সমাধান দিতে সক্ষম হন। পূর্বের চিন্তধারা অনুযায়ী ওই থেকে 'র'-এ লোক নিয়োগ স্থগিত করে তৎপরিবর্তে বিভিন্ন সস্থা ও বিশেষ পেশায় দক্ষ লোকদের 'বিশেষ কাজের' জন্য বাছাই কর হয়। এ পদক্ষেপ পরে ব্যাপক বিদ্বেষ ও রেষারেষির জন্ম দেয় কারণ 'অন্য সংস্থার ও বিশেষ পেশায় দক্ষ ব্যক্তিত্বের গোয়েন্দা পশায় আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা' এ নিয়ে নানাজন নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

'র' ১৯৬৮ সালে-এর প্রথমিক স্তরে দুটি সংস্থার সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। এ দুটো সংস্থা ছিল ব্রিগেডিয়ার ভদ্র পরিচালিত 'সেনা গোয়েন্দা পরিদপ্তর' এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; বিশেষ করে ভারতীয় বৈদেশিক সার্ভিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভেঙে যাওয়ায় সরকারে অবকাঠামোর পুনর্গঠন করা হয় ও মুখ্যতঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্ব গোয়েন্দা শাখা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত সংস্থার দায়িত্ব

(CBI) জনশক্তি বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং সকলের 'হৃদয় জ্বালা' ভস্ম করে চিরদিনের জন্য 'র' প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রণালয়ে (এর) জায়গা করে নেয়।"

"... প্রথমিক পর্যায়ে শুধু 'গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকারী' সংস্থা হিসেবে 'র'-এর নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু পরে পররাষ্ট্র নীতির আওতায় পরিচালিত আরেকটি বিশেষ অপারেশনাল শাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ পরিকল্পনা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর ফল লাভে সক্ষম হয় (বাংলাদেশ ও সিকিম অপারেশন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত)।"

৮. 'র'-এর প্রথম বাজেট

'র'-এর কার্যক্রম দিন দিন সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৬৯ সালে ৫২৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ এর বার্ষিক বাজেট ছিল দুই কোটি রুপি। তবে অল্পসময়েই এর বরাদ্দ ১০ কোটি রুপিতে উন্নীত হয় (যদিও এ খসড়া আনুমানিক হিসেব মাত্র, আসল হিসেব জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কখনই প্রকাশ করা হবে না) এবং লোকবল ১০০০ এ বৃদ্ধি পায়। ভারত সে সময় প্রতিবছর মাথাপিছু মাত্র ২০ পয়সা বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য খরচ করে। 'র' প্রধানকে ক্রমান্বয়ে আরো অধিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করে সচিব পদমর্যাদার উন্নীত করা হয় এবং তিনি তাঁর সকল কজের জন্য সরাসরি একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। এ দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে আমলাতান্ত্রিক 'লাল ফিতার বেড়াজাল ছিন্ন করে' দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয় এবং সংস্থায় সাংগঠনিক সাবলীলতা ফিরে আসে।

৯. 'র'-এর প্রথম অপারেশনাল শাখা

ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থায় 'স্পেশাল অপারেশন ব্রাঞ্চের' 'বিশেষ অপারেশনাল শাখা, গোয়েন্দা জগতে কোনো নতুন সংযোজন নয়। এ রকম একই ধরনের শাখা সিআইএ, কেজিবি ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী এসআইএস (Sceret Intelligence Service)-এও রয়েছে।

CamScanner

এ ধরনের অপারেশনাল শাখা সময়ে সময়ে যখন প্রয়োজন হয় তখন ব্যাপক গোয়েন্দা নীতিমালা প্রণয়নে বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। যদিও 'র' ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা সাধারণত প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকার চেষ্ট করে কিন্ত অনিবার্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রচলিত ধারার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, যা ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে এবং এ রকম কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অপারেশন' সফল নাও হতে পারে। এখানে কিছুদিন পূর্বে সিআইএ পরিচালিত 'জিম্মি উদ্ধারের' (ইরানে মার্কিন দূতাবাসে আটক জিম্মি উদ্ধার প্রচেষ্টা) ব্যর্থতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য করা যায়।

কিন্তু সব সময় এটা ভাবা ঠিক নয় যে, বিশেষ অপারেশন সম্পূর্ণ অপারেশনের সাফল্য ব্যর্থতার নিয়ামক। ইরানের 'জিম্মি উদ্ধারের' অপারেশনাল ব্যর্থতা সিআইএ'র ইরান সম্পৃক্ততার পুরোপুরি ইতি ঘটায়নি এবং 'বাংলাদেশ অপারেশনেও' এ রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে।

আবার অনেক 'বিশেষ অপারেশনে' ব্যাপক ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষ করে যেখানে প্রথাগত কূটনৈতিক দেনদরবার সম্ভব নয়, সেখানে সাধারণত বিভিন্ন সরকারের সাথে 'বিশেষ ব্যবস্থায়' সম্মত হতে হয়। মাঝে মাঝে সে দেশের স্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে পর্যন্ত এ ধরনের কাজে সাহায্যের আহবান জানানো হয়ে থাকে। এ রকম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল 'মোশে দায়ান' ও 'মোরারজী দেশাই'-এর মধ্যে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক গোপন বৈঠক, যার মাধ্যমে একটি 'বিশেষ' অপারেশনে বিদেশি গোয়েন্দা বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

১০. 'র'-এ জনবল নিয়োগ হয় যেভাবে

স্বাধীন সংস্থা হিসাবে 'র'-এর কর্মকর্তা বা মাঠ পর্যায়ে কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। সাধারণত ভারতীয় সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর স্পেশালফোর্স, পুলিশ বাহিনী, আইএএস ক্যাডার, আইবি, সিবিআই অথবা মেধা বিচারে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও নেওয়া হয়ে থাকে। 'র'-এ কর্মরত চাকরিকে অ্যানালাইসিস ক্যাডার সার্ভিস বা আইএএস বলা হয়।

আইএএস (বাংলাদেশি মানদণ্ডে বিসিএস) অফিসারদের মধ্য থেকে যারা 'র'তে যেতে ইচ্ছুক তাদের ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট এর অধীনে ডেপুটি ফিল্ড অফিসার DFO পদের পরীক্ষায় বসতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে সেরাদের বেছে নেওয়া হয়, এরা সবাই রিসার্চ অ্যান্ড এনালাইসিস ক্যাডার নামে পরিচিত হয়। কমপক্ষে ৮ বছর DFO থাকার পরে তাকে পরবর্তী লেভেলে ফিল্ড অফিসার FO পদে পদায়ন করা হয়। কমপক্ষে ৫ বছর FO থাকার পর তাকে সিনিয়ার ফিল্ড অফিসার SFO (ক্লাশ ওয়ান) হিসাবে প্রমোশন করা হয়। এরপরের ধাপে স্টেশন প্রধান বা রেসিডেন্স অফিসার RO হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর তাকে কোনো ডেস্ক প্রধান হিসাবে 'র' আঞ্চলিক দফতর, সদর দফতর এ রাখা হয় অথবা নিজ নিজ বাহিনী বা ভারতের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের যেকোন স্থানে পাঠানো হয়।

DFO, FO, SFO রা সরাসরি বিদেশের মাটিতে কর্মরত থাকে। তারা তাদের স্টেশন অফিসারের ভাগ করে দেওয়া দায়িত্ব অনুযায়ী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে এবং ইনফর্মার হিসাবে স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের ওই দেশের গোয়েন্দা সংস্থা বা ওই দেশে অবস্থানকারী তৃতীয় কোনো দেশের গুপ্তচর কর্মীকে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করে।

১১. 'র'-এর প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক প্রশিক্ষণ

নিয়োগকৃত নতুন এজেন্টদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু উৎসাহমূলক আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। এটি একটি দশ-দিনব্যাপী কার্যক্রম যেখানে নতুন এজেন্টরা গুপ্তচরবৃত্তি-সংক্রান্ত বাস্তবতা, গোয়েন্দা জ্ঞান সংক্রান্ত বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়াও সাধারণ রীতিনীতি, বাণিজ্যিক কৌশল, এবং তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কেও তাদের অবহিত করা হয়। পাশাপাশি স্পেস টেকনোলোজি, তথ্যগত নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কিত নানান ধারণাও তাদের শেখানো হয়। নব নিযুক্ত এজেন্টদের বিভিন্ন

বৈদেশিক ভাষা ও ভৌগোলিক কৌশলগত বিশ্লেষণ নিয়েও তাদের পারদর্শী করে গড়ে তোলা হয়। তাদের অধ্যয়নের তালিকায় সিআইএ, কেজিবি, মোসাদ ও এমআইসিক্স নিয়েও কেইস স্টাডি রয়েছে। তাদের এও শিক্ষা দেওয়া হয় যে শত্রু-মিত্র নিরূপণ করা দেশের পররাষ্ট্র নীতির কাজ, গোয়েন্দা সংস্থার নয়। গুরগাঁওয়ের একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ ও ভাষা ইনস্টিটিউটের অফিসারদের এই প্রাথমিক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। মুম্বাইয়ে আর্থিক-গোয়েন্দাগিরি সংক্রান্ত একটি বহুমুখী-নিয়মানুবর্তীতামূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত করা হচ্ছে, যেখানে নব নিযুক্ত এজেন্ট অফিসারদের মানি-লন্ডারিং-কে ঘিরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন অপরাধ সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে (২০১৭)।

আগাম প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক প্রশিক্ষণের সমাপ্তির পর এজেন্টরা ফিল্ড ইনট্যালিজেন্স ব্যুরো (সংক্ষেপে: এফআইবি)-এর অধীনে প্রশিক্ষিত হতে থাকে। এখানে একজন এজেন্টের প্রশিক্ষণ সময়কাল ১-২ বছর অবধি হয়ে থাকে। মূলত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কীভাবে অভিযান চালিয়ে যেতে হবে তা শেখানোর জন্য প্রতীকী প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে এখানে এজেন্টদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রাতের আঁধারে কীভাবে অনুপ্রবেশ করতে হয় তা নিয়েও এজেন্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। তা ছাড়া কীভাবে ধরা পড়ে যাওয়া থেকে এড়ানো যায় এবং ধরা পড়ে গেলেও কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয় তা নিয়েও বিস্তারিত মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। পাশাপাশি নিরীক্ষণ দক্ষতা, মনোযোগ আকর্ষণ এবং গোয়েন্দা অভিযান অপারেট করার মতো নানা নৈপুণ্যও এজেন্টরা এই প্রশিক্ষণে পেয়ে থাকে। ফিল্ড প্রশিক্ষণ শেষে এজেন্টদের চূড়ান্তভাবে নিরীক্ষণ করা হয়। অভিযানে নামার পূর্বে এজেন্টদের আত্ম-রক্ষা সম্পর্কিত নানা দক্ষতা, বিশেষ করে ক্রেভ মাগা এবং গুপ্তচরবৃত্তি কাজে ব্যবহৃত নানান ধরনের প্রযুক্তিগত ডিভাইসের ব্যবহার শেখানো হয়। এজেন্টদের এমনভাবে প্রশাসনিক নিয়মানুবর্তীতা শেখানো হয়, যাতে করে কোনোরূপ সন্দেহের উদ্রেক না করে যেন

এজেন্টরা তাদের গোপন অভিযান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজেন্টদের এই ফিল্ড প্রশিক্ষণ দেরাদুনে ভারতীয় সেনাবাহিনী একাডেমীতে প্রদান করা হয়।

১২. 'র'-এর কর্ম পদ্ধতি

"যা বল প্রয়োগে অর্জন সম্ভব নয় তা ধোঁকা দিয়ে সিদ্ধ করা যায়, বিষাক্ত গোখারা সাপও কাক আর সোনার হারের ফাঁদে পরাজিত হয়।" -চাণক্য

চাণক্যের এই প্রবাদটিই যেন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কর্মনীতি, চলার পথের পাথেয়। এ মূলমন্ত্র ধারণ করে 'র' বাহিনী কাজ করে যায়।

তথ্য সংগ্রহ: কভার্ড ও ননকভার্ড বা অফিসিয়াল ও আনঅফিসিয়াল অথবা প্রাইভেট উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে 'র' তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন বা দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত উভয় পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে 'র'।

আক্রমনাত্মক গোয়েন্দাবৃত্তি: 'র' এলাকা ভেদে আক্রমণাত্মক গোয়েন্দা কৌশল পরিচালনা করে। এরমধ্যে গুপ্তচরবৃত্তি, মানসিক যুদ্ধ পরিচালন, অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন: সামরিক বাহিনীর স্পেশাল ফোর্স থেকে নেওয়া বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সহায়তায় গুপ্তহত্যা পরিচালনা করা হয়।

প্রতিগোয়েন্দাবৃত্তি: 'র' দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিদন্দ্বী গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা করে।

মেইল হ্যাকিং ও ইন্টার্সেপ্সহন: 'র' আইটি এক্সপার্টরা নিয়মিত স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ দফতর ও ব্যক্তির ইমেইল হ্যাক করে থাকে এবং পোস্টাল মেইল ইন্টার্সেপ্ট করে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার কাছাকাছি ট্রান্সমিটার স্থাপন: সংশ্লিষ্ট দেশের গুরুতপূর্ণ স্থাপনা যেমন বিভিন্ন বাহিনী সদর দফতর, সরকারি গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও

অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যক্তিবর্গের ফোনে আড়িপাতে ও আশেপাশে স্থায়ী বা ভ্রাম্যমাণ হাই ফ্রিকোয়েন্সী ট্রান্সমিটারসহ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নজরদারি ও তথ্য সংগ্রহ করে।

জনমত ঘুরানো: 'র' বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট দেশের জনমত তার পছন্দ ও সুবিধা অনুযায়ী ঘুরাতে চেষ্টা করে এজন্য জঙ নির্দেশনা অনুযায়ী ওই দেশে অবস্থানকারি উঋঙ এবং ঋঙরা তাদের স্থানীয় নেটওয়ার্ক, লোকাল ইনফর্মার ও রিক্রুটদের ব্যবহার করে প্রকাশিত তথ্য ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে। জনমতকে প্রভাবিত করতে ওই দেশের তারকা বা ব্যাপক পরিচিত ব্যক্তিদের ব্যবহার করে। ছলে বলে কৌশলে হলেও একাজ তারা করে।

পর্যবেক্ষণ, ম্যাসেজ ইন্টারসেপশন, সিগন্যাল ও পোস্টাল চ্যানেল ব্যবহার, পর্যবেক্ষণ, ফোন ট্যাপিং, ইমেইল হ্যাক, কোড উদ্ধারের মতো আধুনিক গোয়েন্দা কৌশল ব্যবহার করে তথ্যা সংগ্রহ করা হয়। একই তথ্য একাধিক উৎস হতে সংগ্রহ করে ক্রস চেক করে দেখা হয়। এমনকি ব্ল্যাকবেরি কোম্পানির (আধুনিক স্মার্টফোন) পরিসেবা ও নেটওয়ার্ক 'র' পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

'র' প্রধান প্রশাসনিকভাবে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের কাছে রিপোর্ট করেন এবং মন্ত্রী পরিষদ সচিব প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট করে থাকে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে 'র' সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছেও রিপোর্ট করে থাকে। এ ছাড়া জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কাছেও রুটিন মাফিক প্রতিদিন 'র' প্রধান রিপোর্ট দেন।

'র'-এর সংগঠন ভৌগোলিক এলাকা ও অপারেশনাল কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিভক্ত। দুইজন বিশেষ সচিবের ও একজন ডাইরেক্টর পদমর্যাদার এ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টারের জন্য, চারজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকার জন্য, এ ছাড়া ৪০টি ডেস্কে বিভক্ত কার্যক্রমের জন্য কমপক্ষে ৪০জন জয়েন্ট সেক্রেটারী পদমর্যাদা কর্মকর্তা বর্তমানে কর্মরত।

নয়াদিল্লীর লোদি রোডের সদর দফতর -আঞ্চলিক সদর দফতর-বিদেশে অবস্থিত স্টেশন অফিস-মাঠকর্মী। বিদেশে অবস্থিত স্টেশন অফিসগুলি একজন কন্ট্রোলিং আফিসারের অধীনে যারা মাঠ পর্যায়ে অবস্থানকারী কর্মীদের অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান, নিয়ন্ত্রন, সুপারভিশন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে ফিল্ড অফিসার ও সহকারী ফিল্ড অফিসাররা তথ্য সংগ্রহ করে সিনিয়র ফিল্ড অফিসারকে দেয় সিনিয়র ফিল্ড অফিসার বা স্টেশন অফিসার সেই প্রাপ্ত তথ্য যাচাই বাছাই করে আঞ্চলিক বা সদর দফতরের বিভিন্ন ডেস্কে প্রেরণ করেন। এরপর ডেস্ক প্রধান সেই তথ্য গুরুত্ব বিচারে আরো ওপরে প্রেরণ করেন। 'র'-এ কর্মীদেরকে এজেন্ট না বলে 'রিসার্চ অফিসার' বলা হয়। এই গোয়েন্দা সংস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নারী অফিসার কাজ করে থাকে। গত ২০১০ সাল হতে চীন ও পাকিস্তান ডেস্ক ভেঙে আলাদাভাবে চীনের জন্য একটি ডেস্ক করা হয়েছে।

১৩. বাংলাদেশ সৃষ্টিতে 'র'-এর ভূমিকা

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করি এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। আমাদের মুক্তি বাহিনীকে সেসময় সামরিক ট্রেনিং ও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করে ভারত। সত্যি বলতে ভারতের সহযোগিতা ছাড়া এ বিজয় অর্জন সম্ভব হতো না। কিন্তু ভারত কেন সহযোগিতা করেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে? ইতিহাস ঐতিহ্যের জ্ঞান রাখেন এমন যে কারো কাছেই এর উত্তর অজানা নয়। শুধুই মানবতার খাতিরে কিম্বা পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রকে সহযোগিতার জন্য ভারত সহযোগিতা করেছিল-এমন উত্তর শুধু তরুণ শিক্ষার্থীর আবেগ কিংবা কাগুজে মন্তব্য হতে পারে। বাস্তবতা ভিন্ন। ৭১'র বহু আগেই পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা হয় ভারতে। যেমন, ভাষা আন্দোলন সংগঠক ও আওয়ামীলীগের এক সময়ের সাধারণ সম্পাদক জনাব অলি আহাদ 'জাতীয় রাজনীতি:১৯৪৫-১৯৭৪' গ্রন্থে বলেন, "১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে ময়মনসিংহ নিবাসী রাজবন্দিদ্বয় আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও আবু সৈয়দের নিকট হইতে আমি

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিষয়াদী অবগত হই। ভারতে মুদ্রিত বিচ্ছিন্নতাবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ময়মনসিংহ ও বিভিন্ন জেলায় বিতরণকালেই তাহারা গ্রেফতার হইয়াছিলেন।"-(অলি আহাদ)।

এ কথার সত্যতা মিলে সাবেক 'র' প্রধান বি রমনের 'র এর কাওবয়েরা' গ্রন্থের লেখাতে। তিনি বলেন, "১৯৬৮ সালের আগে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) এবং পরে 'র' পূর্ব পাকিস্তানের বহু রাজনীতিবীদ এবং সরকারি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে বাঙালি নেতা ও কর্মকর্তাদের অপদস্থ ও নিগৃহীত হওয়ার প্রচারণা এ নেটওয়ার্ক তৈরিতে সাহায্য করে। এই নেটওয়ার্কের কারণেই 'র' এবং পূর্ব পাকিস্তানের নেতা ও কর্মকর্তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির লক্ষে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষিত নিজস্ব যোদ্ধা এবং আমলাদের সমন্বয়ে সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।"

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে একটি পৃথক রাষ্ট্রের পর্যায়ে নিয়ে যেতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করে। বি রমনের ভাষায়, "১৯৭১ সালে 'র'-এর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণভাবে তথ্য শাখা হিসিবে এর পরিচিতি ছিল। মি. কাও তথ্য মন্ত্রণালয় ও বেতার থেকে নেওয়া পেশাজীবীদের সাথে সেনাবাহিনী থেকে বাছাই করা লোকদের সমন্বয়ে গঠিত এ শাখাকে পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনাবাহিনীর নির্মমতা এবং এর ফলে ভারতে কোটি শরণার্থীর বোঝা চেপে বসার ব্যাপারে অবিরাম প্রচারণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্ব দেন। 'র'-এর মনস্তাত্ত্বিক শাখা বিস্ময়কর সাফল্যের সাথে কাজ করে।...পৃথিবী জুড়ে সফরের মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।" ইন্দিরা গান্ধীর এই প্রচাণার কারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং চীনের মাও সেতুং প্রথমে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও পরে নিরব হয়ে যায়। ওয়াশিংটন ও বেইজিং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমান রাশিয়ার প্রতিভু হিসেবে ভারতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখত বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

CamScanner

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য মতে ১৯৭১ এর বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত ২৫০,০০০ জন সেনা এবং ১০০,০০০ জন মুক্তিবাহিনী অংশ গ্রহণ করে। ভারতের ১,৪২৬ জন সৈনিক নিহত ও ৩,৬১১ জন আহত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে সাধারণ মানুষ ১,৫২৫ জন নিহত ও ৪,০৬১ জন আহত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ সালে ঘটিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে। যুদ্ধ শুরু হলে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী সারা দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

ভারতের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যৌথবাহিনী তৈরি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় স্থলবাহিনীর সম্মুখ অভিযান শুরু হয় চারটি অঞ্চল থেকে: (১) পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তিন ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ৪র্থ কোর সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা-নোয়াখালী অভিমুখে; (২) উত্তরাঞ্চল থেকে দুই ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ৩৩তম কোর রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া অভিমুখে; (৩) পশ্চিমাঞ্চল থেকে দুই ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ২য় কোর যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া-ফরিদপুর অভিমুখে; এবং (৪) মেঘালয় রাজ্যের তুরা থেকে ডিভিশন অপেক্ষা কম আরেকটি বাহিনী জামালপুর-ময়মনসিংহ অভিমুখে। যৌথবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে সারা দেশের সীমান্তবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রগুলো থেকে পাকিস্তানিরা পিছু হটতে শুরু করে। একের পর এক পাকিস্তানি ঘাঁটির পতন হতে থাকে। পাকিস্তানিরা অল্প কিছু জায়গায় তাদের সামরিক শক্তি জড়ো করেছিল; যৌথবাহিনী তাদের এড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বাংলাদেশের জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র ১৩ দিনের মাথায় যৌথবাহিনী ঢাকার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। এর আগেই বিমান হামলা চালিয়ে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীকে পরাস্ত করে ঢাকার সকল সামরিক বিমান ঘাঁটির রানওয়ে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়। তৎকালীন পাকিস্তানি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আশ্বাস পেয়েছিলেন উত্তরে চীন ও

দক্ষিণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁদের জন্য সহায়তা আসবে, কিন্তু বাস্তবে তার দেখা মেলেনি। (উইকিপিডিয়া)

১৪. বাংলাদেশ সৃষ্টি 'র'-এর সেরা অর্জন

বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ দশটি গোয়েন্দা সংস্থার একটি 'র'। অসংখ্য সফল অভিযান পরিচালনা করেছে তারা। বিশ্বের উদীয়মান পরাশক্তি রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের দেশি-বিদেশি কর্মযজ্ঞের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র এশিয়া এমনকি ইউরোপের দেশগুলোতেও প্রভাব বলয় বৃদ্ধির নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেশটি। ক্রমবর্ধমান বলয়ের এই সীমানা আরো নখদর্পণে রাখতে বেড়েছে 'র'-এর কর্ম পরিধি। কিন্তু শুরুটা এত সমৃদ্ধ ছিল না। তার ওপর যাত্রা শুরুর মাত্র আড়াই বছরের মাথায় পরিচালনা করতে হয় চিরশত্রু, বৈরী প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ভাঙার মতো জটিল কাজ। কিন্তু চ্যালেঞ্জ নেয় 'র'-এর কর্মকর্তারা। বিস্ময়কর সাফল্যও পায় তারা।

বিশ্ব মিডিয়ায় 'র'-এর সেরা অর্জন হিসেবে দেখা হয় পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারা বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারাকে। 'র'-এরই সাবেক প্রধান বি রমনের ভাষায়," ...পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সাফল্যের জন্য সামরিক বাহিনীর তেমন প্রশংসা হয়নি। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করে 'র'। ...৭১ সালে 'র' তার চমৎকার সময় পার করেছে। 'র'-এর শীর্ষ কর্মকর্তা কাও এবং দ্বিতীয় শীর্ষ কর্মকর্তা কে শংকর নায়ারের নেতৃত্ব 'র'-এর বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন পদমর্যাদার ডজন ডজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে চমৎকার সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।"

১৫. ৭৫ এ 'র'-এর ব্যর্থতা

৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের অস্তিত্ব অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারার পর মাত্র চার বছরের মাথায় সেই দেশের স্বাধীনতার প্রবাদপুরুষ বা ভারতের অন্যতম সহযোগীকে নির্মমভাবে হত্যা করে কতিপয় সেনা। এ ব্যাপারে কিছুই জানত না ভারতের বিদেশ-বিষয়ক গোয়েন্দা শাখা

CamScanner

'র'। এটাকে 'র'-এর চরম ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করে বুদ্ধিজীবীমহল। বি রমনের ভাষায়, "১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হবার ঘটনা এবং এর পর যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতেও গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে 'র'-এর ভাবমূর্তি এবং উজ্জ্বলতা হারায়। ৭৫-এর পর বালাদেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যাতে দেশটির ওপর ভারতের প্রভাব কমে যায়। 'র'-এর সমালোচকরা একে ভয়ংকর গোয়েন্দা বিপর্যয় হিসেবে সমালোচনা করেন। এ ঘটনার পর প্যারিসে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং কাওয়ের ব্যক্তিগত বন্ধু 'র'-এর ব্যাপারে সালোচনামুখর হয়ে ওঠেন। তিনি আমার কাছে জানতে চান, 'র' কীভাবে মুজিববিরোধী এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বেখবর ছিল?

আমি কাওকে এ ব্যাপারে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে 'র'-এর সমালোচনার কথা জানাই। 'র' সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা শুধু দূতাবাসে ছিল এমন নয়, নয়াদিল্লি থেকে প্যারিস সফরে আসা পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যেও একই মতামত পেয়েছি।

মুজিব হত্যার কয়েক সপ্তাহ পর কাওয়ের জেনেভা সফরের কর্মসূচি ছিল। তিনি বলেন, বাংলাদেশে 'র' কোনোভাবেই ব্যর্থ হয়নি। তার মতে মুজিবের জনপ্রিয়তা দিনদিন হ্রাস পেয়েছিল। বিশেষ করে সশস্ত্রবাহিনীতে তার জনপ্রিয়তা একেবারে কমে যায় এবং সেখানে মুজিবের বিরুদ্ধে একটি প্লট তৈরি হয়। এসব বিষয়ে কাও ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়মিত অবহিত রাখতেন। মুজিবের জীবনের প্রতি হুমকি তৈরির বিষয়টিও ইন্দিরাকে জানানো হয়েছিল। মধ্যবর্তী এক মাধ্যমে ইন্দিরা যখন এসব বিষয় শেখ মুজিবকে জানান তখন মুজিব এ আশঙ্কার ব্যাপারটি উড়িয়ে দেন। তিনি মনে করতেন, তার জনপ্রিয়তা ১৯৭১ সালের মতোই আছে এবং তার জীবনের প্রতি কোনো হুমকি নেই। কাও প্রশ্ন করেন, মুজিব নিজেই যদি এসব তথ্যে গুরুত্ব না দেন তবে 'র' কেন এ ব্যাপারে দায়ী হবে?"

তবে ৭১-এর পর ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল এবং এর জন্য ভারতই দায়ী। সেটি প্রকাশ পেয়েছে একাত্তরে

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'র কথা থেকে। তিনি বলেন, "যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়, তাহলে ভারতের আশ্চার্য হবার কিছু নেই। যেদিন আমার সৈনিকেরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি উপলব্ধি করি, বাংলাদেশিদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালোবাসা ছিল না। আমি জানতাম, ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদের সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশিদের সাথে আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল, আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।"[১]

১৬. সিকিম রাষ্ট্র দখলে 'র'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

ইতিহাসের পাতায় অনেক জাতি যেমন স্বর্ণাক্ষরে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের গল্প লিখেছে, তেমনি এর পাশাপাশি কালো হরফে লেখা স্বাধীনতা হারানোর অধ্যায়ের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন দেশের কথা বলতে গেলেই চলে আসে সিকিমের নাম।

মাত্র ৭,০৯৬ বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট দেশ সিকিমের জনগণও স্বাধীনতা চেয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা যখন উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন সিকিমে 'ভারতের সাথে তারা যুক্ত হতে ইচ্ছুক কিনা' এ প্রশ্নে গণভোট হয়েছিল। সিকিমের জনগণ প্রত্যাখ্যান করে এ প্রস্তাব। কিন্তু এরপর তিরিশ বছর না পেরোতেই এক বিশ্বাসঘাতক, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কূটচাল ও সিকিমের রাজার সরলতায় সিকিম হয়ে ওঠে ভারতের প্রদেশ।

সিকিম ভারতের প্রদেশ হয়ে ওঠার সফরটা বুঝতে হলে একটু ব্রিটিশ-ভারতের সময়ে ফিরে তাকানো দরকার। ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিকিমের ওপর আধিপত্যবাদীদের লোভাতুর দৃষ্টি ছিল সব

১. দৈনিক স্টেট্‌সম্যান, কোলকাতা, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮

সময়ই। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে প্রতিনিয়ত নেপালের গোর্খা রাজ্যের হামলায় উৎকণ্ঠিত ছিল সিকিম। গোর্খা রাজ্য হামলা চালাত সংলগ্ন ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যগুলোতেও। তাই সহজেই সে সময় সিকিম ও ব্রিটিশ রাজ গোর্খাদের বিরুদ্ধে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর ১৮১৪ সালে শুরু হওয়া ব্রিটিশ-নেপাল যুদ্ধে নেপাল পরাজিত হয়। আর এক চুক্তি অনুসারে সিকিম ফিরে পায় নেপাল অধিকৃত তার অংশগুলো।

এ চুক্তির ফলে নেপাল অধিকৃত অংশগুলো ফিরে পায় সিকিম আর এ সুযোগে ব্রিটিশরা সিকিমের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। তারা সিকিমের রাজাকে চাপ প্রয়োগ করে দার্জিলিং নিজেদের করায়ত্ত করে নেয়। এ পাহাড়ি এলাকাটি চমৎকার অবকাশ যাপন কেন্দ্রের পাশাপাশি তিব্বতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক পথ স্থাপনের সুবিধা করে। তবে ব্রিটিশদের সাথে চুক্তি হয়েছিল যে, দার্জিলিংয়ের জন্য তারা সিকিমকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদান করবে।

কিন্তু এ কর নিয়ে অচিরেই ব্রিটিশ, ভারত ও সিকিমের সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করে। এ ছাড়া সিকিমের শ্রমিক শ্রেণির অনেক অধিবাসীই উন্নত জীবনব্যবস্থার জন্য ব্রিটিশ অধিকৃত অংশে জীবনযাপন শুরু করে। সিকিমের রাজা জোরপূর্বক তাদের ফেরত আনার চেষ্টা করলে ব্রিটিশরা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, ১৮৪৯ সালে দুই ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তি সিকিমে এলে সিকিম প্রশাসন তাদের বন্দি করে রাখে।

এসবকিছুর জের ধরে সিকিমে আবার ব্রিটিশ সৈন্যদের আগমন শুরু হয়। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশরা গোটা দার্জিলিংসহ সিকিমের অনেকখানি অংশ পুরোপুরি দখল করে ফেলে। আবার নতুন চুক্তি হয়। সিকিম ব্রিটিশ ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়, সিকিমে ব্রিটিশ প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া হয়। এসবের ফলে সিকিম অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকলেও সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্রিটিশদের হাতে। এরপর ১৯৪৭ এর আগ পর্যন্ত দুদেশের সম্পর্ক অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যায়। তবে ব্রিটিশরা এ অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে স্বাধীন রাজতন্ত্র হিসেবে সিকিমের স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছিল।

এ সময় ভারতের সাথে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে সিকিমে সেই বিখ্যাত গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। আর সিকিমের সাধারণ জনতা ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু 'সিকিম স্টেট কংগ্রেস' নামক একটি দল সে সময় রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। তাদের চাপে ১৯৫০ সালে সিকিমের ১১তম চোগিয়াল (সিকিমের রাজার উপাধি ছিল চোগিয়াল) থাসি নামগয়াল ভারতের সাথে একটি চুক্তি করতে বাধ্য হন।

এ চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশদের মতো নেহেরুও সিকিমকে ভারতের আশ্রিত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। এর ফলে ভারতের হাতে সিকিমের নিরাপত্তা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ চলে আসে, তবে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে সিকিম ছিল পরিপূর্ণ স্বাধীন। এ ছাড়া ভারত কর্তৃক একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধিও নিয়োগপ্রাপ্ত হয় সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে। বলা যায়, এর মাধ্যমেই রোপিত হয়েছিল সিকিমের পরাধীনতার বীজ।

ইতিহাসের এ পর্যায়ে এসে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের দিকে নজর দেওয়া দরকার। কাজী লেন্দুপ দর্জি, সিকিমের পরাধীনতার ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত নাম। লেন্দুপ দর্জির ও সিকিমের রাজপরিবারের মধ্যে ছিল দীর্ঘস্থায়ী বংশগত শত্রুতা। তিনি রাজতন্ত্রেরও বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৫ সালে সিকিম প্রজামণ্ডল নামক একটি দল গঠন করে তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৫৩-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি সিকিম স্টেট কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে সিকিমের আরো কয়েকটি দলকে একীভূত করে গঠন করেন 'সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস'। এ দলের মূল লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের অবসান করে গণতন্ত্রের প্রচলন করা।

এদিকে ১৯৬৩ সালে তৎকালীন চোগিয়াল থাশি নামগয়াল এবং ১৯৬৪ সালে নেহেরু মারা গেলে পরিস্থিতি বদলে যায়। এ সময় ভারতের ক্ষমতায় আসেন ইন্দিরা গান্ধী। তিনি সিকিমের প্রতি নেহেরুর মতো ততটা সদয় ছিলেন না। নেহেরু এই ক্ষুদে সিকিমকে 'বিরক্ত' করে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা' হিসেবে নিজের খ্যাতির বারটা বাজাতে

চাননি। ১৯৬০ সালে এক সাক্ষাৎকারে নেহেরু বলেছিলেন, "জোরপূর্বক সিকিম দখল করা হবে মশা মারতে কামান দাগানোর মতো ঘটনা।" তবে নেহেরুর আগ্রহ না থাকলেও সেই মশা মারতে তার কন্যার আগ্রহের কমতি ছিল না।

অবশ্য ইন্দিরার এ আগ্রহের পেছনে বেশ কয়েকটি প্রভাবকও ছিল। প্রথমত, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য ভারতের কাছে সিকিম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, ভৌগোলিক দিক থেকে সিকিমের পশ্চিমের নেপাল, উত্তর-পূর্বে চীনের তিব্বত, পূর্বে ভুটান এবং দক্ষিণে পশ্চিম বাংলা। এ ছাড়া ভারতের ভয় ছিল সিকিম হয়তো স্বাধীনতার জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন করতে পারে বা চীনের সাহায্য চাইতে পারে। আর রাজা পানডেলকেও সন্দেহের চোখে দেখত ভারত। তার আমেরিকান স্ত্রীর সম্পর্কে সিআইএ এজেন্ট হওয়ার গুজবও প্রচলিত ছিল।

তাই এ সময় ভারত ঘরের শত্রু বিভীষণ হিসেবে লেন্দুপ দর্জিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে। তারা লেন্দুপ দর্জিকে সহায়তা করতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে লেন্দুপ দর্জি স্বীকার করেন যে, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স থেকে তাকে অর্থ এবং করণীয় বাতলে দেওয়া হতো। ভারতের মতো একটি শক্তিকে পেছনে পেয়ে লেন্দুপ দর্জি একের পর এক ক্ষমতার সিঁড়ি টপকাতে শুরু করে।

'র'-এর তৎকালীন পরিচালক অশোক রায়নার বই 'ইনসাইড র' থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালেই ভারতের সিকিমকে দখল করবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এর পরের দুই বছর 'র' উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির কাজ করে যায়। সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেসের মাধ্যমে তারা সেখানকার নেপালি হিন্দুদের, বৌদ্ধ চোগিয়ালদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে এবং দাবি তোলে রাজতন্ত্রের অবসানের। আন্দোলন, খুন-জখম ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে এতটাই ঘোলাটে করে ফেলা হয় যে, সিকিমের অভিজাত হিন্দু সমাজ ভাবতে শুরু করে, "এ বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে থাকার চেয়ে আমাদের জন্য ভারতীয় হয়ে যাওয়াটাই ভালো হবে।"

এদিকে এসবকিছু যে ভারতের ইন্ধনে হচ্ছে তৎকালীন চোগিয়াল পালডেন তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি। তিনি মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরুর ভীষণ ভক্ত ছিলেন। তাদের উত্তরসূরিরা যে তার সিকিমের রক্ষক থেকে ভক্ষক হয়ে উঠতে পারে, ঘোর দুঃস্বপ্নেও তা তার মাথায় আসেনি।

অবশ্য ভারতও তাকে বুঝতে দেয়নি। তারা ডাবল গেইম খেলছিল। একদিকে তারা পালডেনকে আশ্বস্ত করেছে, অন্যদিকে লেন্দুপ দর্জিকে কাজে লাগিয়েছে। চীনের পক্ষ থেকে তাকে ভারতের বিষয়ে সতর্কও করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা কানে তোলেননি। সেসময় পালডেন দাবার চালগুলো একটু বুদ্ধি খাটিয়ে খেললে আজ হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারতো।

১৯৭০ সালের দিকে সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস দেশব্যাপী নতুন করে সুষ্ঠু নির্বাচন ও নেপালি জনগোষ্ঠীর অধিক অংশগ্রহণ দাবি করে। এরপর ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা ভোট কারচুপির অভিযোগ আনে। আর দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনে সিকিমের আরো কয়েকটি দল যোগ দিলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়। এ আন্দোলন একসময় পরিণত হয় রাজতন্ত্রের পতন আন্দোলনে।

পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে চোগিয়াল ভারতের সাহায্য কামনা করেন। ভারত প্রশাসন তাকে চাপে ফেলে চোগিয়ালের ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে খর্ব করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। এ সংবিধান অনুসারে প্রায় সব ক্ষমতাই চলে যায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। এরপর ১৯৭৪ সালের নির্বাচনে লেন্দুপ দর্জি অস্বাভাবিক ব্যবধানে বিজয় লাভ করে। ৩২টি আসনের মধ্যে ৩১টি আসনই তার দল লাভ করেছিল।

নির্বাচনে জিতে লেন্দুপ দর্জি সিকিমের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু তখনও চোগিয়াল সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রয়ে গিয়েছিলেন। পরে ১৯৭৫ সালের ২৭ মার্চ লেন্দুপ দর্জি কেবিনেট মিটিংয়ে রাজতন্ত্র বিলোপের প্রশ্নে গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। অচিরেই চারদিক থেকে গণভোটের ফলাফল আসতে শুরু করে যে, "জনগণ রাজতন্ত্র চায় না"। অবশ্য

অভিযোগ আছে, পুরো বিষয়টিই ছিল সাজানো। ভারতীয় সেনাবাহিনী জনগণকে বাধ্য করেছিল রাজতন্ত্রের বিপক্ষে ভোট দিতে।

এভাবে অবসান ঘটে চোগিয়াল পদের। এরপর ৬ এপ্রিল ১৯৭৫ সালে সকালে উঠে চোগিয়াল পানডেল দেখতে পান ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘিরে ফেলেছে তার প্রাসাদ। প্রাসাদের ২৪৩ জন পাহারাদারকে কব্জা করতে পাঁচ হাজার ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধা ঘণ্টার বেশি লাগেনি। পানডেল বন্দি হন আর সিকিমের পতাকাকে হটিয়ে সিকিমের আকাশ দখল করে ভারতের তেরঙ্গা পতাকা।

এরপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ভারতের কেনা গোলাম লেন্দুপ দর্জি সিকিমকে প্রদেশ করার জন্য ভারতীয় পার্লামেন্টের কাছে আবেদন জানান। এরপর ১৪ এপ্রিল আবার এক 'গণভোটে' সিকিমের জনগণ এ আবেদনে 'সম্মতি' জানায়। অবশেষে ২৬ এপ্রিল ১৯৭৫ সিকিম অফিসিয়ালি ভারতের ২২তম প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, জাতিসংঘে চীন ছাড়া অন্য কোনো দেশ এ দখলদারি নিয়ে উচ্চবাচ্যও করেনি।

সিকিমের তরুণ প্রজন্ম তাদের এ সকল নেতাদের কীর্তির কথা ভেবে আজও লজ্জায় মুখ লুকোয়, যাদের কল্যাণে একসময়কার স্বাধীন সিকিম আজ পরিচিত ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম প্রদেশ হিসেবে, আর রাজধানী গ্যাংটক 'ভারতের অন্যতম পর্যটন শহর'।

১৭. বাংলাদেশকে জঙ্গিরাষ্ট্র বানানোর পরিকল্পনা 'র'-এর!

এ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামে ২০১০ সালের ০৯ নভেম্বর তারিখে। ফতেহ আলী টিপু লিখিত প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল "বাংলাদেশকে 'আফগানিস্তান' বানানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছে ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসীদের মগজে"। প্রবন্ধটির চুম্বক অংশ...

"...শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা, কিবরিয়া হত্যা, আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা, যশোর-ঢাকায় উদীচি-ছায়ানটের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, সিলেটে মাজারে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর বোমা হামলা, নারায়ণগঞ্জ

চাষাড়ায় বোমা হামলা প্রভৃতি ঘটনা দেশে-বিদেশে সরকারের ইমেজ যেমন ক্ষুণ্ন করেছে, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এসব ঘটনাকে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টিতে উপাদান হিসেবে জঙ্গি প্রকল্পের কুশীলবরা ব্যবহার করেছে। এ সময়ই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত-সংঘবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সর্বমুখী ক্রুসেড শুরু হয়। শুরুটা যদিও পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে ঘটেছিল। তবে এর মূল অনুঘটক ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা এবং তাদের সহযোগী ইসরাঈলী 'মোসাদ'-এর মেধাবী গোয়েন্দা অফিসাররা তাদের তত্ত্বাবধানেই বাংলাদেশকে নিয়ে যখন পশ্চিমা মিডিয়ায় 'কোকুন অব টেরর' কাহিনি লেখা হয়, তখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ঐসব আজগুবি প্রচারণায় হতবাক হয়েছিল।

বাংলাদেশের মিডিয়া, গোয়েন্দা সংস্থা যেসব জঙ্গি তৎপরতার খবর পায়নি, ঐসব পশ্চিমা মিডিয়ায় তা প্রচারিত হয়েছে। এসব একতরফা মিডিয়া সন্ত্রাস চলেছে মুক্ত সাংবাদিকতার নামে এবং সরকার বা বাংলাদেশের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কোনো ভাষ্যও তাতে নেওয়া হয়নি। এমনকি বাংলাদেশ থেকে বিদেশিদের ভারতে নিয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্প-কাহিনির নাটক সাজিয়ে ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশে ধর্মীয় চরমপন্থার উত্থান এবং সংখ্যালঘুদের বিপন্ন অবস্থা প্রমাণ করা। এ ধরনের সাজানো কাজ করতে গিয়ে সাবেক সাংবাদিক 'ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি'র নেতা শাহরিয়ার কবীর ভুয়া ভিডিও-চিত্রের ফিল্ম ও ক্যামেরা নিয়ে বেনাপোল সীমান্তে পুলিশের হাতে ধরাও পড়েন। তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা হয়। তিনি জামিনে বেরিয়ে আসেন। এ ছাড়া সাংবাদিক সেলিম সামাদ এক প্রাইভেট ব্রিটিশ ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার নারী সাংবাদিককে নিয়ে ভুয়া জঙ্গিবাদী নাটক সাজাতে গিয়ে ধরা পড়েন। মুক্তি পেয়ে ভদ্রলোক দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। বর্তমান সরকারের সময় আবার দেশে ফিরে এসেছেন। ব্রিটিশ মহিলা সাংবাদিকও দীর্ঘদিন বাংলাদেশে জেল খেটে মুক্তি পেয়ে চলে যান। তাদেরকে কোনো মহল জঙ্গি বানানোর তথ্যচিত্র সংগ্রহ করতে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল।

বাংলাদেশের জনগণের দুর্ভাগ্য, ভুয়া দলিল ও ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি করে যারা বাংলাদেশকে 'আফগানিস্তান' বানাতে চাইলো, তাদের এবং তাদের পেছনের মদদদাতাদের মুখোশ উন্মোচন ও বিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ যদি জঙ্গিদের 'অভয়ারণ্য' হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশের মাদরাসাগুলো যদি 'জঙ্গিবাদের প্রজনন ক্ষেত্র' হয়ে থাকে, তবে ভাড়াটে সাংবাদিকদের দিয়ে জঙ্গিবাদের ওপর ভুয়া সাজানো তথ্য-চিত্র বানানোর পরিকল্পনা কেন নেওয়া হয়েছিল? তারা মাদরাসায় কথিত জঙ্গি বানানোর ছবি নিয়েই তো তা প্রমাণ করতে পারত। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, বাংলাদেশে জেএমবি ও অন্যান্য কাগুজে জঙ্গি সংগঠনের নামে যেসব বোমা-হামলা ও গ্রেনেড সন্ত্রাস হয়েছে, তা বাংলাদেশের নিজস্ব ভূখণ্ড ও জনমানসের ভেতর থেকে গড়ে ওঠা কোনো জঙ্গিবাদ নয়। এটা স্থানীয় কিছু এলিমেন্ট ব্যবহার করে বিদেশি চক্রান্তকারীরা বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। জঙ্গিবাদীদের 'ইঁদুর-বিড়াল' খেলার নাটের গুরুদের চিহ্নিত করার পর মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিলেন। কারা তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল এবং কেন করেছিল? রাষ্ট্র-সরকার তাদের জবাবদিহি করতে পারেনি।

...বিস্ময়ের কথা হচ্ছে- "Bangladesh : The Next Afganistan?"-প্রশ্নবিদ্ধ বইয়ের লেখক তার বইয়ের শেষে শতাধিক রেফারেন্স উদ্ধৃত করেছেন। তার অধিকাংশ উদ্ধৃতিই হচ্ছে বাংলাদেশের বিশেষ কতিপয় পত্রিকা যারা ইসলামি রাজনীতির বিদ্বেষী বলে পরিচিত। তাদের এই জঙ্গিবাদী প্রকল্পের সমীকরণ যে ১/১১-এর সরকার পর্যন্ত গড়িয়েছে, তা হিরন্ময় কারলেকারও উল্লেখ করেছেন অন্যভাবে। ১০১ ও ১০২ নম্বর রেফারেন্সে তিনি উল্লেখ করেছেন : 'News Report, 'Unusual Voter Rise : EC pays no heed to EU Allegation', The Daily Star, (Internet Edition), 4 August, 2005) Ges 'News Report, 'Al, Allies Announce Agenda for Caretaker, EC Reforms' The Daily Star, (Internet Edition) 16 July, 2005)। হিরন্ময় কারলেকার তার বইয়ের অধিকাংশ Reference নিয়েছেন 'ডেইলি স্টার', 'প্রথম আলো' থেকে। প্রকাশিত কোনো রিপোর্ট, ছবি এবং ভিডিও চিত্র যেখানে আদালতও অপরাধ প্রমাণের অকাট্য দলিল

হিসেবে স্বীকার করে না, সেখানে কারলেকার বাবু ডেইলি স্টার-প্রথম আলো শাহরিয়ার কবীর এবং কিছু বিদেশি ভাড়াটে সাংবাদিকের জঙ্গিবাদ সম্পর্কিত মনগড়া কাহিনি অবলম্বন করে ভুয়া থিসিস তৈরি করে বাংলাদেশকে 'পরবর্তী আফগানিস্তান' বানাতে চেয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের ঘাড়ে চড়ে তারা এবার তাদের অসমাপ্ত কাজটুকু সম্পন্ন করার জন্য একটি বিশেষ প্যাকেজের আওতায় নানামুখী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে।

বাংলাদেশের জনগণের ও রাষ্ট্রের ইসলামি-মুসলিম সত্তা মুছে ফেলে ভারতের ট্রানজিট সুবিধা রক্ষার নামে বিদেশি সেনা ঢুকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে প্রকৃতপক্ষে 'পরবর্তী আফগানিস্তান' বানানোর উস্কানি দিয়ে যাচ্ছেন তারা। সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ হবে ভারতের 'ট্রানজিট রাষ্ট্র'। সরকারের দায়িত্বশীলরাও কেউ কেউ দেশকে 'ইরাক-আফগানিস্তান' হবার কথাও বলছেন। তবে তার দায় চাপাচ্ছেন তারা বিরোধী দল এবং ইসলামি শক্তির ওপর। হিরন্ময় কারলেকার তার বইয়ের 'Acknowledgemants'- অংশে লিখেছেন : Shahriar Kabir, well-known author and journalist, who fought in Bangladesh is liberation war in 1971 and has since then striven tirelessly to uphold its secular and democratic values, despite relentless persecution, imprisonment and torture, has given me blanket permission to quote from his works.....I am also grateful to him for ensuring my participation in the 'European Human Rights conference on Bangladesh : Extrenism, Intolerence and violence,' held at the School of Oriental and African Studies, London on 17 June 2005 and Lord Eric Avebury for inviting me to the conference..... ....On several occassions, Dipanijan Roy Chowdhury, Delhi correspondent of Bangladesh's widely-circulated Bengali language daily, Prothom Alo, provided me with useful information and comments on current events in the country. "[Aknowledgements, Hiranmoy Karlekar, Bangladesh; Next Afganistan.]

বাংলাদেশে 'পরবর্তী আফগানিস্তানের' ছায়া আবিষ্কারকারী ভারতীয় থিংকট্যাংক-গবেষক হিরন্ময় কারলেকার তার তথাকথিত গবেষণা কর্মের তথ্যসূত্র ও সহায়তাকারী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠ বয়ান দিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, জনকণ্ঠ, শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুনদের মতো ব্যক্তিদের জঙ্গিবাদ সম্পর্কিত রিপোর্ট, নিবন্ধ, ফিচারসমূহ বাংলাদেশে বিতর্কিত এবং এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ তাদের প্রমাণিত হয়নি। মানুষের কোনো আস্থাও নেই।

...যে আন্তর্জাতিক নীলনকশা প্রণীত হয়েছে, তাকে যায়নবাদী নীলনকশায় পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর এশিয়ার এ অঞ্চলে ভারত জঙ্গিবাদ প্রমোট করার 'সাব-এজেন্টের' ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে ইসরাঈলী 'মোসাদ' ভারতকে নিবিড় সহায়তা দিচ্ছে।

.... ৯/১১-এর পর মার্কিন পলিসি জঙ্গিবাদকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এবং মার্কিন নীতি নির্ধারণের পুরো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পেন্টাগনের সমরবিদ তথা মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আবির্ভূত হয়েছে। জঙ্গিবাদ প্রমোট এবং কাউন্টার জঙ্গিবাদী এ্যাকশন পরিচালনার পুরো বিষয়ই মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা কর্মসূচির অংশ।"

১৮. ২০১৩ সালে একুশে টিভির আলোচিত সেই সংবাদ

ভারতের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের সরকারি দলের অঙ্গসংগঠনের (ছাত্রলীগ ও যুবলীগের) একশ ক্যাডারকে কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে কমান্ডো প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উদ্দেশ্য ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের কিছু রাজনীতিবীদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং নাগরিকদের হত্যা এবং গুম করা। গত ২০ সেপ্টেম্বও শ্রীলঙ্কার গার্ডিয়ান পত্রিকায় The Bengal Tigers in the R&AW cage, R&AW trained Crusader 100 in action in Bangladesh শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এমন সংবাদে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। মেজর জেনারেল (অব.) আমীন আহমেদ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, "হতেই পারে, উপমহাদেশের আইএসআই (পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা) বলেন,

ভারতের 'র' বলেন এরা সবাই আমেরিকা, ব্রিটেন থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যই হলো ডিভাইড এন্ড রুল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিএসএফকে ট্রেনিং দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডিং করে, ডিভিশন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। কেউ কারো কথা শুনেনি। এমনকি জেনারেল অরোরা পর্যন্ত তাদের কথা শুনেনি। যে কারণে তারা রক্ষী বাহিনী করে ফেল করেছে। এখন আবার তারা কমান্ডো স্টাইলে কোনো কিছু করে গুম করার রাজনীতি শুরু করেছে।" তবে আওয়ামীলীগ নেতারা বলছেন এ ধরনের সংবাদ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন বলেন, "কিছু পত্রপত্রিকা এধরনের নিউজ কী কারণে ছাপিয়েছে, কেন ছাপিয়েছে? 'র' যুবলীগ কর্মীদের ট্রেনিং দিচ্ছে-এগুলো আমার মনে হয় মনগড়া স্টোরি এন্ড দিজ ইজ মটিভেটেড বাই সাম কোয়ার্টার যারা.. সিকুয়েন্সটা দেখেন... (এসময় তার কণ্ঠ কাঁপছিল) ঘটনার পরপর কিন্তু এগুলো আসছে... ইলিয়াস আলীর গুমের ঘটনার পরপর... গুম বলি অপহরণ বলি, যাই বলি... ।"

ভারতের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা কেন এই প্রশিক্ষণ দিতে যাবে আর বাংলাদেশের সরকারই বা কেন এমন মিশনে যাবে এমন প্রশ্নের উত্তরে মেজর জেনারেল (অব.) আমীন আহমেদ চৌধুরী বলেন, "হতে পারে এজন্য যে, পাল্টাপাল্টি রাজনীতি করতে গিয়ে বুদ্ধিচর্চা একদম লোপ পেয়েছে। এটা অনেক দুঃখজনক! আমাদের সরকার যত দুর্বলই হোক আমরা যদি আমাদের নীতি-নৈতিকতা বাদ দিয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ি বা আমরা যদি আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নিজেদেরকে ছোট মনে করি। তখন আমরা বন্ধুর জায়গায় খবরদারি করার অবস্থায় পড়ব। উত্তর ভারতের লোকজনের আদি স্বভাব খবরদারি করা। ভারত তার আধিপত্য বিস্তার করতেই চাইবে। আপনি যত নরম হবেন ভারত তত আধিপত্য বিস্তার করতে চাইবে। আপনার যত জ্ঞানের অভাব হবে, শিক্ষার অভাব হবে, গণতন্ত্র চর্চার অভাব হবে ভারত ততবেশি আপনাকে পেয়ে বসবে। ততবেশি এইসব গুম রাজনীতির প্রশ্রয় কারা দিচ্ছে? যারা অনভিজ্ঞ তারা দিচ্ছে।"

তবে আওয়ামীলীগের এই নেতা বলছেন, প্রকাশিত সংবাদটির সত্যতা আওয়ামীলীগের গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা উচিত। আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন বলেন, "শ্রীলঙ্কায় আমাদের হাইকমিশন আছে। সেখানে তাকে এই বিষয়ে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করা উচিত হোয়াট ইজ দ্যা ম্যাটার?"

সংবাদটির সত্যতা থাকুক বা নাই থাকুক দেশের চলমান পরিস্থিতিতে এমন সংবাদে আতঙ্কিত সবাই।

মঞ্জুরুল আলম পান্না। একুশে টেলিভিশন। ঢাকা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ব্যাপারে নানা কানাঘুষা শোনা যায়। ফিরোজ মাহবুব কামাল নামের একজন ব্লগার লিখেছেন, বাংলাদেশের বেশ কিছু রাজনীতিবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধীজীবীদের পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কঠোর গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে বাছাই করা ক্ষমতাশীন আওয়ামী লীগের ১০০জন সশস্ত্র ক্যাডার ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এ্যান্ড এনালাইসিস উইং 'র'-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভারতের দেরাদুনে সুদীর্ঘ ৬ মাসব্যাপী কমান্ডো ট্রেনিং নিয়ে ২০১০ সালের জুন থেকে শুরু করে গুপ্ত হত্যা, অপহরণ ইত্যাদিসহ বিভিন্ন অপকর্ম শুরু করেছে। "ক্রুসেডার-হান্ড্রেড" কোডমেনের এই দলটি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ভারতের প্রবেশ করে এবং ২০১০ সালের মধ্য জুন পর্যন্ত অবস্থান করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছু তরুণ কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নাম করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চৌকস কমান্ডো প্রশিক্ষকরা এইসকল তরুণদের দুর্ধর্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এ্যান্ড এনালাইসিস উইং 'র'-এর মূল পরিকল্পনায় এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারেক আহমেদ সিদ্দিকীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় "ক্রুসেড হান্ড্রেড"-এর পুরো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালনকাল থেকেই মেজর জেনারেল (অব.) তারেক আহমেদ সিদ্দিকী ভারতীয় 'র' এবং ব্রিটিশ এমআই সিক্স এর সাথে দীর্ঘকাল ধরে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। শেখ হাসিনার সাথে

তার পারিবারিক ঘনিষ্ঠতারসূত্রেই তিনি 'র' এবং এমআই সিক্স এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে প্রধানমন্ত্রীর সামরিক উপদেষ্টা হওয়ায় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটবোন শেখ রেহানার ভাসুর হওয়ার সুবাদে মেজর জেনারেল (অব.) তারেক আহমেদ সিদ্দিকী সরকারে অপরিহার্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। "ক্রুসেডার হান্ড্রেস" টীমের পুরো ব্যাচের সদস্যদের তিনি নিজে এবং তার অনুগত কিছু সহকর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের দিয়ে সরকার দলীয় ক্যাডারদের মধ্য থেকে বাছাই করেন। "ক্রুসেডার হান্ড্রেড" গ্রুপের সদস্যরা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এলে তাদের হাতে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় বেশ কিছু রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের একটি হিট লিস্ট সরবরাহ করা হয়। তথ্যমতে, "ক্রুসেডার হান্ড্রেড" গ্যাং-এর হাতে সরবরাহকৃত তালিকায় ৮৩ ব্যক্তির নাম রয়েছে, যাদের নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষিত এ গুপ্তঘাতক দলের সদস্যরা রাজধানীর গুলশান ও বারিধারা এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থান করছে। বারিধারাভিত্তিক গুপ্তঘাতকেরা মেজর জেনারেল (অব.) তারেক আহমেদ সিদ্দিকীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং গুপ্তঘাতকদের আবাসস্থলসমূহ অত্যাধুনিক সার্ভেইল্যান্স যন্ত্রপাতি সজ্জিত ও এসকল আবাসস্থলে জনসাধারণের অনুপ্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। অতি সম্প্রতি গুম হওয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতা এম. ইলিয়াস আলীর নামও "ক্রুসেডার হান্ড্রেড" ফোর্স-এর তালিকায় রয়েছে। হিট লিস্টে রয়েছে এমন কিছু নেতাদের নাম আমার নিউ দিল্লিস্থ সোর্স প্রকাশ করেছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন রাজনীতিবিদ আমানুল্লাহ আমান, মির্জা আব্বাস, সাদেক হোসেন খোকা, ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, এম. ইলিয়াস আলী, হাবিবুন নবী সোহেল, আব্দুল্লাহ আল নোমান, কাজী জাফর আহমদ, মীর কাসেম আলী, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, শফিউল আলম প্রধান, আ. স. ম. আব্দুর রব, মুফতি ফজলুল হক আমিনী এবং মওলানা ফজলুল করীম, শফিক রেহমান, মেহনাজ রশীদ, আবদুল আউয়াল মিন্টু, ক্যাপ্টেন

তারেক রহমান এবং তাজুল ইসলাম ফারুক (কিছু নাম গার্ডিয়ানের ২৮ তারিখের রিপোর্ট থেকে সংযোজিত)। আওয়ামী লীগ এবং 'র' সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এদেরকে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করবে, কেননা আগামী দিনে আবার ক্ষমতায় আসতে এ মিশনকে ক্ষমতাসীন দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত করেছে।

ক্রুসেডার হান্ড্রেড গ্যাংটির ক্ষুদ্র ও মাঝারী পাল্লার সাইলেন্সারযুক্ত অত্যাধুনিক অস্ত্র, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, গ্যাস বোমা সমৃদ্ধ এবং অপারেশনের জন্য রয়েছে যানবাহন। বাংলাদেশি যেকোনো গোয়েন্দা সংস্থার চোখ এড়াতে এ দলের কিছু সদস্য স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করছে। এ গ্যাং-এর প্রতিটি সদস্য বিশাল অঙ্কের অর্থসহ বিবিধ অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা যথা সদস্যদের পরিবার-পরিজনদের জন্য ঢাকা শহরে এ্যাপার্টমেন্ট ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সুযোগ পেয়ে থাকে। দিনের বেলায় এরা প্রকাশ্যে মুখ দেখাতে পারে না এবং প্রায় পুরোদিন এদেরকে ঢাকা শহরের আস্তানায় অবস্থান করতে হয়। আর জরুরি প্রয়োজনে বাইরে রাস্তায় বের হতে হলে তাদেরকে জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের মুখ লুকানোর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কালো রঙ্গের হেলমেট পরিধান করতে হয়। পর্যায়ক্রমে এ টিমের সকল সদস্যকে ৭ থেক ১০ দিনের বিনোদনের জন্য গোপনে ভারতে প্রেরণ করা হয় এবং ভ্রমণের কোনো প্রকার দলিলপত্র প্রদর্শন ছাড়াই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত নির্বঘ্নে পারাপারের জন্য তারা অনুমতিপ্রাপ্ত।

১৯. শ্রীলঙ্কা *গার্ডিয়ান পত্রিকার* নিউজটি বিস্তারিত

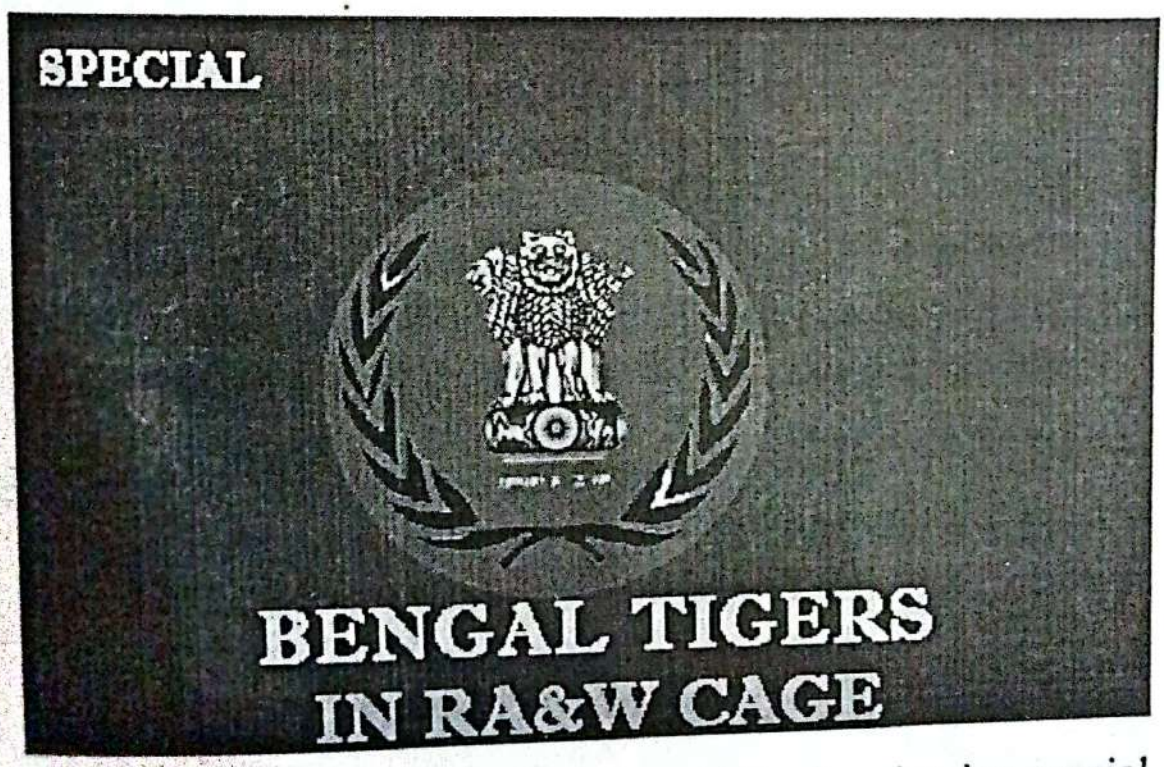
The Bengal Tigers in the R&AW cage

R&AW trained Crusader 100 in action in Bangladesh

by Jessica Fox

(April 23, 2012, Dhaka, Sri Lanka Guardian) Strictly scrutinized 100 armed cadres of the ruling Awami League in Bangladesh, who received 6-month long extensive commando training at Dehradun in India under the direct

supervision of Indian espionage agency the Research and Analysis Wing are continuing various types of activities, including secret killing, abduction etcetera since June of 2010 with the mission of "clearing" a large number of politicians, media personnel and members of the civil society in Bangladesh. The team codenamed "Crusader-100" went to India during end September 2009 and stayed there till mid June 2010, where brilliant commando trainers of Indian Army gave extensive training to these people under the disguise of "training few young commandos of Bangladesh Army". The entire project of "Crusader-100" was orDginally conceived by Indian Research and Analysis Wing (RAW) and the project was coordinated directly by the Bangladeshi Prime Minister and her defense advisor Maj. Gen. (Rtd) Tarique Ahmed Siddiqui.



Maj. Gen. (Rtd) Tarique Ahmed Siddiqui maintains special connection with Indian RAW and British MI6 for decades, since he was in army service. Such relations of RAW and MI6 with him was because of his family relations with

Sheikh Hasina. When Bangladesh Awami League formed government in January 2009, Maj. Gen. (Rtd) Tarique Ahmed Siddiqui became extremely important in the government due to his official position as the defense advisor to the Bangladeshi Prime Minister as well as his personal identity of being the brother-in-law of Prime Minister's younger sister Sheikh Rehana. The selection of the entire batch of ruling party cadres, who were sent to India for commando training were directly done by Maj. Gen. (Rtd) Tarique Ahmed Siddiqui and a few of his loyal colleagues and retired army officers, while on return of the members of the "Crusader-100" team from India, they were provided a hit list comprising names of opposition politicians, members of Bangladeshi media and some members of the civil society. According to information, the list contains names of more than 83 people, who are planned to be "cleared" by the members of the "Crusader-100" gang. The members of these specially trained hitters are housed inside several buildings at Dhaka's Gulshan and Baridhara areas. The Baridhara "bases" of the hitters is maintained directly by Maj. Gen. (Rtd) Tarique Ahmed Siddiqui and each of such places are equipped with sophisticated surveillance equipments as well as entry of civilians are restricted within these premises. Leader of Bangladesh Nationalist Party, M Ilias Ali, who became victim of enforced disappearance recently, was also named in the list of Crusader-100 force. My New Delhi contacts disclosed few of the names of the hit list, which include, political leaders Amanullah Aman, Mirza Abbas, Sadeque Hossain Khoka, Goyeshwar Chandra Roy, M Ilias Ali, Habibun Nabi Sohel, Abdullah Al Noman, Barrister Abdur Razzaque, Shafiul Alam Pradhan, ASM Abdur Rob, Mufti Fazlul Haque Amini and Moulana Fazlul Karim. Awami

League and RAW have decided "clearing" the listed names latest by December 2013, which they consider to be "vital" for the ruling party in Bangladesh in returning into power.

The gang of Crusader-100 is equipped with sophisticated small and medium range weapons, mostly with silencers as well as bullet-proof jackets, gas bombs and vehicles for their operations. Some of the members of this gang use satellite phones to skip interception of any of the Bangladeshi intelligence agencies. Each of the members of this gang received healthy financial package alongside various types of extra benefits, including apartments in Dhaka city for the members of their families and small businesses. They are not allowed to show faces during the day-time and mostly required to stay inside their bases in Dhaka city. In case of emergency, when the members of the team are required to go on street during the day time, they are compulsorily required to wear black-tinted helmets, to hide their faces from the public. By rotation, members of the team are secretly taken to India for a break of 7-10 days for "amusement" purposes. In such cases, they are allowed to cross Bangladesh-India borders without any travel documents.

২০. শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের পেছনে 'র'

-টাইমস অব ইন্ডিয়া

"শাহবাগের বিক্ষোভকারীদের পেছনে ভারতীয় মদদ"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর অন্যতম *টাইমস অব ইন্ডিয়া* গত ২৬ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যার শিরোনাম ছিল 'প্রটেস্টার্স অ্যাট শাহবাগ ইন বাংলাদেশ ব্যাকড বাই ইন্ডিয়া'। ইন্দ্রাণী বাগচীর লেখা প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে: 'বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি ব্যস্ত চৌরাস্তা শাহবাগ, সেখানে

যাঁরা বিক্ষোভ করছেন, তাঁরা সবচেয়ে বেশি সমর্থন পাচ্ছেন সম্ভবত প্রতিবেশী ভারত থেকে।[১]"

'জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) শিবশঙ্কর মেনন বলেছেন, আন্দোলনকারীরা বাংলাদেশের তরুণ সমাজের "খোলা মনের" প্রতীক, তাঁরা উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়ছেন এবং গণতন্ত্রের মৌলিক মূল্যবোধগুলোকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছেন। পুনরায় রাম শেঠ চেয়ার প্রতিষ্ঠাকালে মেনন বলেন, 'উগ্রপন্থি ও যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ঢাকার শাহবাগ চত্বরে চলমান হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ বাংলাদেশি তরুণ সমাজের আবেগের শক্তি, রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করার সামর্থ্য ও মুক্তমনের পরিচয় তুলে ধরছে।'

টাইমস অব ইন্ডিয়ার অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের সঙ্গে পাঠকদের মন্তব্য অংশে একাধিক পাঠক মন্তব্য করেছেন, প্রতিবেদনটির শিরোনাম বিভ্রান্তিকর।

"শাহবাগে না যাওয়ায় ভারতের ভিসা মিলছে না"

১৮ মার্চ ২০১৩ সালে হিফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর ফেসবুক পেজে এ সংক্রান্ত একটি সংবাদ শেয়ার করতে দেখা যায়। প্রকাশনা স্থগিত হওয়া *দৈনিক আমার দেশ* এর বরাতে সংবাদটির কিয়দাংশ... "দিল্লি যাওয়ার জন্য ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে ভিসার আবেদন করেছিলেন তাবলিগ জামাতের কর্মী আবদুল্লাহ মাহমুদ। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে ভিসা অফিসার তার কাছে শাহবাগ সম্পর্কে জানতে চান। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে গিয়েছেন কিনা। মাহমুদ জানান, তিনি শাহবাগে যাননি। ভিসা অফিসার তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে পাসপোর্ট ফেরত দেন। মাহমুদকে বলা হয়, আগে শাহবাগ যান, তারপর ভারতে যাওয়ার ভিসার জন্য আবেদন করুন।

---

১. *প্রথম আলো* : ২১-০৩-২০১৩

আবদুল্লাহ মাহমুদ কাকরাইল মসজিদের ইমাম মাওলানা নুরুর রহমানের ভাতিজা। দিল্লিতে অবস্থিত তাবলিগ জামাতের কেন্দ্রীয় মারকাজে (দফতর) যেতে তিনি ভিসার আবেদন করেছিলেন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

এ ঘটনা শুধু মাহমুদের একার ক্ষেত্রেই ঘটেনি। তাবলিগ জামাতের আরও বেশ কয়েকজন বলেছেন, শাহবাগ যাননি বলে তারাও ভারতে যাওয়ার ভিসা পাননি। সাক্ষাৎকারের সময় তাদেরও প্রশ্ন করা হয়েছে শাহবাগে গিয়েছেন কিনা।

শাহবাগ সম্পর্কে ভারতীয় হাইকমিশনের এ দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাবলিগ জামাতের অসংখ্য দায়িত্বশীল। দিল্লি নয়, তাবলিগ জামাতের মুসল্লিদের আগে শাহবাগের কথিত গণজাগরণ মঞ্চে যাওয়ার বিষয়ে ভারতীয় হাইকমিশনের এ ধরনের পীড়াপীড়িতে অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন তাবলিগ জামাতের মুরব্বিরা ।

আমার দেশকে তারা বলেন, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে ভিসাপ্রার্থী তাবলিগ কর্মী ভাইদের সাক্ষাৎকারের সময় শাহবাগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। শাহবাগে গিয়েছেন কিনা জানতে চাওয়া হচ্ছে। শাহবাগে না যাওয়ার তথ্য দিলে তাদের ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান করে পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হয়েছে।

শাহবাগের তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চে গিয়ে একাত্মতা না জানানোর কারণে এভাবে অনেকের ভিসা আবেদনই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে উপর্যুপরি চেষ্টা করেও ভারতীয় হাইকমিশনের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

রাজধানীর মিরপুরের বাসিন্দা তাবলিগ জামাতের দায়িত্বশীল মাওলানা রাইহান দিল্লিতে যাওয়ার জন্য কাকরাইলের মুরব্বিদের পরামর্শ চাইলে তাকে বলা হয়েছে, আপনি শাহবাগ গিয়েছেন কিনা? যদি শাহবাগ গিয়ে থাকেন তাহলে ভিসার জন্য আবেদন করেন। আর যদি না গিয়ে থাকেন তাহলে অন্তত একবার শাহবাগে গিয়ে ঘুরে আসুন। সাক্ষাৎকারের সময়

CamScanner

আপনি যাতে সত্য কথা বলতে পারেন। মাওলানা রাইহান আপাতত দিল্লি ও শাহবাগ কোনোটাতেই না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২১. ঢাকা থেকে আসামি ধরে নিয়ে যায় 'র'!

এ ব্যাপারে অসংখ্য ঘটনা, গুম নিখোঁজের অভিযোগ বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। বিবিসির একটি প্রতিবেদনে চোখ বুলানো যাক। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত সংবাদটিতে বলা হয়. ...২০১৭ সালে বিভিন্ন সময় নিখোঁজ ৫৫ জনের মধ্যে ১২ জন ফিরেছে বলে খবর পাওয়া যায়। নতুন তিনজনের মধ্যে কল্যাণ পার্টির মহাসচিব আমিনুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। আলোচিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোবাশ্বার হাসান এবং সাংবাদিক উৎপলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে রাতের আঁধারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ফাহিম আহমেদ বলেন, "যারা ফেরত আসছেন বোঝা যাচ্ছে তারা নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন। গুম হওয়ার আগের মানুষটার সঙ্গে ফিরে আসা মানুষটার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। তাদের মোটিফটা হচ্ছে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। আর এক্ষেত্রে তারা কিছুটা হলেও আতঙ্ক আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পেরেছে।"

এ বছর যারা নিখোঁজ হয়েছেন তাদের পরিচয় থেকে দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজন ভিকটিম হয়েছে। নিখোঁজ যারা হয়েছে তার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী। এ ছাড়া ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, প্রকাশক, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, ব্যাংকারসহ পেশাজীবীরা নিখোঁজ হয়েছেন।

মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বলছেন, "বাংলাদেশে গত এক দশকে কমপক্ষে সাড়ে পাঁচশ মানুষ গুম অপহরণের শিকার হয়েছেন। একটা পরিবর্তন এসেছে ধরার ক্ষেত্রে। আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচয় দেওয়া হতো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তরফ থেকে এসেছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। পরে তাকে ডিনাই করা হতো। এবং

বাসা থেকে, অফিস থেকে, পরিচিত জায়গা থেকে, কোনো ক্ষেত্রে রাস্তা থেকে অপহরণ করা হতো। সাম্প্রতিকালে আমরা লক্ষ করছি যে অপহরণ প্রক্রিয়ায় একটা পরিবর্তন এসেছে। সেটা হচ্ছে, অতি সঙ্গোপনে এ কাজটি করা হচ্ছে, যাতে কোনো সাক্ষী না থাকে, যাতে কোনো মানুষ সাক্ষ্য দিতে না পারে।" এ পরিবর্তনের পেছনে যুক্তি কী হতে পারে সেটি তুলে ধরে মি. লিটন বলেন, "এনফোর্সড ডিজএপিয়ারেন্স এর ব্যাপারে জাতিসংঘের যে নিয়ম-কানুন আছে, কনভেনশনগুলো আছে সেখানে ধারা উপধারায় যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে, সেই সংজ্ঞার মধ্যে যাতে এ বিষয়গুলো না পড়ে এই ধরনের একটা প্রবণতা লক্ষ করছি কৌশল হিসেবে গ্রহণ করার।" মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বাংলাদেশে গুম পরিস্থিতির একজন পর্যবেক্ষক। অপহরণ কিংবা গুমের শিকার হয়ে জীবিত ফিরে আসা অন্তত ২০ জনের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে তিনি কথা বলেছেন।

আরেকটি সংবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামে ২২ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে। যার শিরোনাম ছিল, "ঢাকায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অভিযান ঈশান কোণে অশনি সংকেত?"

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন, ভারতের সাথে আমাদের বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে, কিন্তু এ দেশের ভূখণ্ড থেকে কাউকে ধরে নেওয়ার এখতিয়ার তাদের নেই। তারপরও কাউকে না জানিয়েই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং) গত সপ্তাহের দিকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ভারত ভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের (আইএম) এক সদস্যকে প্রকাশ্য দিবালোকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদের দাবি, জিয়াউর রেহমান ওরফে ওয়াকাস নামের ওই ব্যক্তি পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের হয়ে কাজ করছিলেন। এ খবরটি বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যমের নজরে আসেনি। গত ১৫ এপ্রিল টাইমস অব ইন্ডিয়ার অনলাইন সংস্করণে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়, গ্রেফতারের পর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র) তাকে ধরে নিয়ে গেছে। আর এ খবরটি জানেন না বলে জানান বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি ১৬

এপ্রিল সচিবালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমি এখনো বিষয়টি জানি না। পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

তার মতো করেই বলেছেন পুলিশের আইজি হাসান মাহমুদ খন্দকার। গতকাল সোমবার সকালে এ প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের জবাবে আইজিপি হাসান মাহমুদ বলেন, হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরে এ ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। আমরাও বিষয়টি জানি না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা। কোনো দেশের কোনো গণমাধ্যম কি লিখলো না লিখলো তা নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় নেই। তার বরাত দিয়ে এ দেশের গণমাধ্যমগুলো একটি ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছে বলে তিনি দাবি করেন।

.... ভারতীয় পত্রিকাটি জানায়, ওয়াকাসকে একটি পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল আইএসআই। তিনি বিমানবন্দরেও গিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের অভিবাসন কর্মকর্তারা দেখতে পান যে পাসপোর্টে এন্টি স্ট্যাম্প নেই। বাংলাদেশি কর্মকর্তারা তাকে গ্রেফতারের উদ্যোগ নেয়। এই বিষয়টি এক 'র' কর্মকর্তার নজরে পড়ে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে স্মার্টফোনের সাহায্যে ছবিসহ খবরটি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানান।

'র' কর্মকর্তারা ঢাকা বিমানবন্দরে ৬ ফুট লম্বা লোকটির ছবি দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। পত্রিকাটি জানায়, এরপর 'র' কোনো প্রমাণ না রেখেই তাকে ভারতে নিয়ে যায়। তবে কীভাবে ভারত বাংলাদেশ থেকে তাকে নিয়ে গেল তা টাইমস অব ইন্ডিয়া জানায়নি।

এ ঘটনাটি সাম্প্রতিক। এর আগেও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে 'র' কোনো কথাবার্তা ছাড়াই রাজশাহীর সীমান্তবর্তী এলাকার একটি গ্রামে ঢুকে আরডিএস উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা কোনো আইনকানুনের তোয়াক্কা না করেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে। এটা একটি স্বাধীন দেশের ভূখণ্ডে অবৈধ অনুপ্রবেশ বলে পর্যবেক্ষকদের অভিমত।

CamScanner

বিডিআরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) সেনা কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক আ. ল. ম. ফজলুর রহমান দৈনিক সংগ্রামকে বলেন, বিমানবন্দর থেকে 'র' একজনকে ধরে তাদের দেশে নিয়ে গেছে এর ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে একটি ক্লারিফিকেশন দেওয়া উচিত। ভারতীয় এজেন্টের লোকজন সরকারকে না জানিয়ে এটা করে থাকলে আমাদের জন্য এলার্মিং। সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি বিষয়টি না জানে তবে তাদের পদত্যাগ করা উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ, তারা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলবে আর এমন ঘটনা ঘটবে তা তো মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, ধৃত ব্যক্তি যে দেশেরই হোক না কেন সরকার হয় তাকে ধরে 'র'-এর হাতে তুলে দিয়েছে না হয় 'র' সরকারকে জানিয়েই ঘটনাটি ঘটিয়েছে- এটা একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের জন্য শুভ লক্ষণ নয়। এটা এ দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। ভারতও যা করেছে তা দুঃখজনক।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি জানেন না বলে গণমাধ্যমে যে সংবাদ বেরিয়েছে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন তিনি জানবেন না। তার দায়িত্ব কী। ঘটনাটা সত্যি হলে আমি চাইব তিনি পদত্যাগ করুক। তাকে আমরা চাই না। কারণ, এমন একটি ঘটনার জন্য আমরা প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করিনি। এ ঘটনা আমাদের সার্বভৌমত্বের সাথে অবশ্যই জড়িত। আর ঘটনাটি যদি সত্যি না হয়ে থাকে তাহলেও সরকারের তরফ থেকে একটি বক্তব্য আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেনের কাছে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি এ দেশের জন্য হুমকির। এ ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সভাপতি শফিউল আলম প্রধান-এর কাছে জানতে চাইলে তিনি দৈনিক সংগ্রামকে জানান, 'র'-এর এমন ঘটনায় স্বাধীনতা প্রিয় বাংলাদেশের মানুষ হতবাক। স্তম্ভিত। এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল।

২২. বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংসে ভারতের কূটচাল!

-স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই ভারত বাংলাদেশের অর্থনীতির উ
সহ্য করেইনি বরং এর ধ্বংসে নানমুখি কূটচালে ব্যস্ত থাকে। সদ্য স্বাধী
দেশটি তার প্রশাসনিক বিন্যাসে যখন ব্যস্ত তখন ভারত দেশটির সম্প
লুটপাটে মেতে ওঠে। সাবেক আওয়ামীলীগ নেতা ও ভাষা সৈনিক অ
আহাদের ভাষায়, "স্মরণীয় যে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরর বিজয়
ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ
সীমান্ত একাকার হইয়া যায়। বিনা অনুমতিতে বা বিনা দলিলেই
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় জনতা ও পণ্যের স্রোত প্রবাহিত হইতে
থাকে। বাংলাদেশ বাস্তবে ভারতের বাজারে পরিণত হয়। বাংলাদেশ
হতে লক্ষ লক্ষ গাইট পাট অবাধে সীমান্ত পারের পাটকলগুলির চাহিদা
মিটাইতে আরম্ভ করে। ভারতীয় পাটকলগুলির পূর্ণোদ্যমে দুই-তিন
শিফটে কাজ চালু হইয়া যায়। এমনকি বাংলাদেশের পাট-লোপাট করিয়া
ভারত নতুন করে বিদেশে কাঁচাপাট রফতানী শুরু করিয়া দেয়। স্মর্তব্য,
কাঁচাপাটের অভাবে ইতিপূর্বে ভারতীয় পাটকলগুলি অতি কষ্টে এক
শিফটে কাজ করিত এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাক-
ভারত বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভারতকে বাধ্যত সিঙ্গাপুরের
মাধ্যমে প্রতি বৎসর ১০ থেকে ১৫ লক্ষ বেল পাকিস্তানি পাট চড়ামূল্যে
ক্রয় করিতে হইত। অথচ মুজিবের শাসনামলে ভারত অবাধে
বাংলাদেশের পাট লুণ্ঠন শুরু করিয়া চলিল। সেই পাটজাত পণ্য দ্বারাই
ভারত বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের বাজার দখল করিল। শুধু তাই নয়,
বাংলাদেশি কাঁচাপাট রফতানী দ্বারা ভারত নিয়মিতভাবে বিপুল পরিমাণ
বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করিয়া চলিল। অথচ শেখ মুজিব টু শব্দটি
উচ্চারণ করিলেন না। ইহা কোন স্বার্থের বিনিময়ে কিংবা কোন বিশেষ
কারণে? তিনি কি জ্ঞাত ছিলেন না যে, ভারতের পাটশিল্পজাত পণ্য
রফতানীপ্রসূত অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাত্র ১৫% থেকে ১৭%;
কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি কাঁচাপাট ও পাটশিল্পজাত পণ্য রফতানী
আয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।" ১৯৭২ সালের ২৭শে মার্চ শেখ মুজিব
সরকার ভারতের সাথে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি নামে যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করে
তার ফলে ভারত সরকার বাংলাদেশে লুটপাটের একটি বৈধ ভিত্তি পায়।

তখন ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান থেকে বৈদেশিক অর্থে আমাদানিকৃত উন্নতমানের পণ্য ভারতে পাচার করা শুরু হয়। সে স্রোতের সাথে যাওয়া শুরু করে সোনা-রূপা, তামা, পাকিস্তানি আমলের ধাতব মুদ্রা, কলকারখানার যন্ত্রপাতি, সার, আমদানিকৃত বিদেশি ঔষধ এবং বাংলাদেশি মাছ।"-(অলি আহাদ)।

ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র "অমৃত বাজার"-এর ১২ই মে ১৯৭৪ সাল-এর রিপোর্ট অনুসারে ভারত সরকার দুইশত থেকে আড়াইশত রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্থানান্তরিত করে। অথচ ১৯৭৩ সালের ১১ই জুলাই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন, "ভারতে কোনো অস্ত্রশস্ত্র পাচার হয় নাই বা লইয়া যায় নাই"। প্রশ্ন জাগে, যদি জনাব তাজউদ্দীন সত্য বলে থাকেন তবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া কয়েক শত ট্যাংক গেল কোথায়? ১৯৭৫ সালে মুজিব সরকারের অপসারণে সামরিক বাহিনীর তরুণ অফিসারগণ যে ট্যাংক ব্যবহার করেছিল সেগুলি ছিল মিসর সরকারের খয়রাতি দান। তখন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে পাকিস্তান আমলের কোনো ট্যাংকই ছিল না। অতএব, তাজউদ্দীন আহম্মদ যা বলেছেন সেটি সত্য ছিল না, ছিল ডাহা মিথ্যা। অপরদিকে ১৯৭৪ সালের ১৭ই জুন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর বলেন, ভারতে স্থানান্তরিত অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশকে ফেরত দেওয়া শুরু হয়েছে। দুই মন্ত্রীর দুই ধরনের বক্তব্য। জনাব তাজউদ্দীনের মতানুসারে ভারত যদি অস্ত্র লুণ্ঠন না করে থাকে তবে তাহের উদ্দিন ঠাকুরের কথামতো ভারত সেগুলো ফেরত দেয় কি করে?

৭১ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে একটি তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হলেও স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়েও বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারে ১৯৮০ সালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার খবর, "একাত্তরের যুদ্ধের বছর নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তেমন কোনো শিল্প প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি বা উৎপাদন ব্যাহত হয়নি। আসলে যুদ্ধটা একটা অজুহাত মাত্র। তা ছাড়া জাতিসংঘের ত্রাণ কমিটির

এক হিসাব থেকেও জানা যায়, বাংলাদেশের যুদ্ধজনিত সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বাংলাদেশে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল তেরোগুণ বেশি।"[১]

কিন্তু এর কয়েক বছর পরই এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। এত বিপুল সমৃদ্ধির অবস্থান থেকে কীভাবে তলানীতে গিয়ে পৌছেছিল তা পাঠক এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন। কতটা তলানিতে গিয়েছিল অর্থনীতি আর মানুষের কীরকম দুর্বিসহ জীবনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার বিবরণ জনাব অলি আহাদ দিয়েছেন এভাবে: "(পাকিস্তান আমলের) এক টাকার গামছার দাম হয় সাত টাকা। পাঁচ টাকার শাড়ির দাম হয় পঁয়ত্রিশ টাকা। তিন টাকার লুঙ্গি পনেরো টাকা বা কুড়ি টাকায়, দশ আনা বা বার আনা সেরের চাউল হয় দশ টাকায়। আট আনা সেরের আটা ছয়-সাত টাকা। দুই আনা সেরের কাঁচা মরিচ চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। তিন-চার টাকা সেরের শুকনা মরিচ আশি-নব্বই টাকা। আট আনা সেরের লবণ চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ টাকা সেরের সরিষার তৈল তিরিশ-চল্লিশ টাকা। সাত টাকা সেরের নারিকেল তৈল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। সাত টাকার লাঙ্গল ত্রিশ-চল্লিশ টাকা।"

বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংসে ভারতের নানামুখী কূটচাল আর ষড়যন্ত্র এতদিনে কমেনি বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিচের সংবাদগুলো লক্ষ করুন।

বাংলাদেশের একটি ইংরেজি দৈনিক Daily Industry পত্রিকা ২ জুলাই ২০১৮ তারিখে 'Bangladesh becomes 4th largest remmitance source for India' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এরপর ০৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে একটি প্রতিবেদন ছাপায় যার শিরোনাম "বাংলাদেশ ভারতের চতুর্থ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশ"।

ভারত ২০১৭ সালের বাংলাদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে আয় করে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার। হিসাব মতে ভারতের রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা চতুর্থ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য

---

১. ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৮০

অনুযায়ী, ২০০৯ সালে বাংলাদেশে অবৈধভাবে ৫০০,০০০ (পাঁচ লাখ) ভারতীয় রয়েছেন। এর বাহিরেও অবৈধ পথে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কয়েক বিলিয়ন ডলার ভারতে যায়।

ভারত সরকার নিজেদের অবৈধ এসব জনশক্তিকে টিকিয়ে রাখতে প্রায় বলে থাকেন ভারতে প্রায় ২০ লাখ অবৈধ বাংলাদেশি রয়েছে। মাঝেমধ্যে এদের বের করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো এত বাংলাদেশি ভারতে অবস্থান করে তাহলে তাদের রেমিট্যান্স কোথায়। রেমিট্যান্স আহরণকারী ২০ দেশের তালিকা ভারত নেই। তাহলে তারা এ টাকা কী করেন।

জানা গেছে, ভারত ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে রেমিট্যান্স হিসাবে আয় করে ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮ দশমিক ৩২০ বিলিয়ন যায়। রেমিট্যান্সগুলি অবৈধ চ্যানেলগুলির মাধ্যমে পাঠানো হতো কিন্তু ভারতীয় ব্যাংকে ঘোষণা তারা অবৈধ পথে টাকা পাঠানো বন্ধ করতে চায়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সূত্র জানায়, অবৈধ বিদেশি কর্মী বাংলাদেশের কাছ থেকে টাকা পাঠাতে পারে না কিন্তু অবৈধ ইন্ডিয়ানরা অধিকাংশ টাকা এখনও অবৈধ পথে পাঠান।

বাংলাদেশের পোশাক খাত দিন দিন প্রতিবেশী দেশের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। দেশের সবচেয়ে বড় রফতানী খাত তৈরি পোশাক শিল্প এখন চরম সঙ্কটে। এ শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে দেশের ৪০ লাখ শ্রমিক। বৈদেশিক মুদ্রার ৮০ ভাগের বেশি অর্জিত হয় এ খাত থেকে। প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত এটিই। কিন্তু সরকারের উদাসীনতা এবং গার্মেন্ট মালিকদের অর্থলিপ্সা ও মালিকদের যথাযথ প্রদক্ষেপের অভাবের কারণে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে তৈরি পোশাক শিল্প। এই অবস্থায় উদ্বিগ্ন দেশের সাধারণ গার্মেন্ট ব্যবসায়ীরা। দেশে তৈরি পোশাক ব্যবসার লাভের অংশ হুন্ডি ও ভূয়া এলসির মাধ্যমে টাকা যাচ্ছে ভারতে। আর সরকার হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে এই চক্রান্ত আরও গভীর হয়েছে। তাই উদ্বেগও বেড়েছে, যা ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যেই এখন স্বীকার করছেন।

CamScanner

বর্তমানে দেশে বিজিএমইএ'র সদস্যভুক্ত বায়িং হাউজের সংখ্যা ৯১১টি এবং বিজিবিএ'র ১৭৯টি। এ দুই সংগঠনের আওতাধীন নয়, এমন বায়িং হাউজ রয়েছে প্রায় ৮ শতাধিক। দেশে তৈরি পোশাক কেনাবেচায় নিয়োজিত আছে দুহাজারের বেশি বায়িং হাউজ। সেই হিসাবে দেশে প্রায় ৭০ শতাংশ বায়িং হাউসের মালিক ভারতীয়রা। যা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোশাক শিল্পের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায় শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর পরিচালক ড. শফিক উজ জামানও বলেন, দেশের সবচেয়ে বড় রফতানী খাত তৈরি পোশাক শিল্প এখন চরম সঙ্কটে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পখাতে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার বিদেশি কর্মরত আছে। এদের মধ্যে ২০ হাজারই ভারতীয়। একেক কারখানায় ১০ থেকে ২০ জন ভারতীয় মিলে গড়ে তুলেছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবিদার এসব কর্মকর্তা এতটাই দাপুটে অবস্থানে রয়েছে যে, মালিকরা চাইলেও তাদের মাঝে বা তাদের ওপরে কোনো বাংলাদেশিকে বসাতে পারে না। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের বিশ্বস্ত কোনো বাংলাদেশি বা আত্মীয়স্বজনকে বসাতে চাইলে একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারা। পেশাগত কারণেই আমেরিকা-ইউরোপে অবস্থানরত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাথে তাদের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তারপর কৌশলে নিজ কর্মস্থল কারখানাটি বিক্রি করে দেয় ভারতীয়দের কাছে। নিজেদের অস্থাভাজন এই মিড লেবেল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তারা একের পর এক নামকরা কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, আবার কৌশলে কিনেও নিচ্ছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একদা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অহংকার হিসেবে পরিচিত এসকিউ, ক্রিস্টাল, মাস্টার্ড, হলিউড, শান্তা, রোজ, ফরচুনা, ট্রাস্ট, এজাক্স, শাহরিয়ার, স্টারলি, ইউনিয়ন প্রমুখ দেশসেরা গার্মেন্ট কারখানার মালিক এখন ভারতীয়রা।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গত আট থেকে ১০ বছরে যেসব কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ হয়েছে তার বেশির ভাগই ছিল কমপ্লায়েন্ট। এসব

কারখানায় কর্মপরিবেশ ভালো, নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়া হয়, ওভার টাইম দেওয়া হয়, টিফিন থেকে শুরু করে বেশির ভাগ সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেই এসব কারখানার শ্রমিকরা সন্তুষ্ট। অথচ কখনো রাস্তায় সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর অজুহাতে, কখনো শ্রমিক গুম কিংবা টয়লেটে ভূত থাকার মতো গুজব ছড়িয়ে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ করানো হচ্ছে এসব কারখানায়।

অপরদিকে যেসব কারখানায় নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়া হয় না, কাজের পরিবেশ নিম্নমানের এবং কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটছে- শ্রমিক অসন্তোষ বা ভাঙচুরের ঘটনা এসব কারখানায় অনেক কমই ঘটছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক দায়িত্বশীল উদ্যোক্তা জানান, যেসব কারখানা বড় ও কমপ্লায়েন্ট সেগুলোর কাজের ভলিউমও বেশি। মোটা অঙ্কের বেতন দিয়ে বিদেশি কর্মকর্তাদের এখানে নিয়োগ করা হয়। তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো কারণে মালিকের ওপর ক্ষুব্ধ হলে কিংবা কারখানার মালিক হওয়ার খায়েশ হলে তারা শ্রমিক অসন্তোষের মতো ঘটনা ঘটিয়ে কারখানা ধ্বংস করে দেয়। স্থানীয় মাস্তান, রাজনৈতিক টাউট, ঝুট ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পক্ষকে লেলিয়ে দেয় কারখানার বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, বাংলাদেশে আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা ইপিজেডে এখন অনুমতি নিয়ে বৈধভাবে কাজ করেন তিন হাজারের মতো বিদেশি। বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমতি নিয়ে দেশে কাজ করেন ১৩ হাজার বিদেশি কর্মী। আর এনজিও ব্যুরোর অনুমতি নিয়ে কাজ করা বিদেশি কর্মীর সংখ্যা ৫০০। সব মিলিয়ে সাড়ে ১৬ হাজার বিদেশি কর্মী সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশে বৈধভাবে কাজ করছেন। তবে বাস্তবে এ সংখ্যা বহুগুণ বেশি। বাংলাদেশে আসলে কত সংখ্যক বিদেশি নাগরিক কাজ করেন, তার সঠিক তথ্য সরকারের কোনো বিভাগের হাতেই নেই। অবশ্য সর্বশেষ (২০১৯, সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে ৩৫ হাজারের মতো বিদেশি রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

CamScanner

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ২০১৫ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৫ লাখ ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে কাজ করেন।

বিনিয়োগ বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, গত কয়েক বছরে ভারতীয় নাগরিকরা বাংলাদেশের ৩৫টি তৈরি পোশাক কারখানায় ৮ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে কারখানা খুলে বসা ভারতের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে শাহী এক্সপোর্টস, হাউজ অব পার্ল ফ্যাশনস, জে জে মিলস, আমবাত্তুর ক্লথিং ইত্যাদি।

দৈনিক ইনকিলাবে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে সাংবাদিক হাসান সোহেলের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম "পুঁজিবাজার ধ্বংসে ভারতীয় ষড়যন্ত্র, শেয়ারবাজারের অংশীদারিত্বে চীন না ভারত?"

...ডিএসইর এ শেয়ার বিক্রি নিয়ে ভারতের অন্যতম শেয়ারবাজার ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বিক্রম লিমা সম্প্রতি ঢাকায় এসে চাপ প্রয়োগ করে গেছেন। তিনি ডিএসইর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মাজেদুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করে শেয়ারবাজারের অংশীদার হতে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করেন। এমনকি এ সময় অন্যায় ও অযৌক্তিক প্রস্তাব দিয়ে কূটনৈতিক শিষ্টাচার বর্জিত ভাষাও প্রয়োগ করেছেন। এরপরই সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে (বিএসইসি) দিয়ে ডিএসই বোর্ডকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে ভারতের প্রতিষ্ঠানের কাছে অংশীদারিত্ব বিক্রির জন্য। তবে ডিএসই সদস্যরা বিএসইসিকে অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছেন। তাদের যুক্তি চীনা কনসোর্টিয়ামটি সর্বোচ্চ দরদাতা। তাই তাদেরই অংশীদারিত্ব পাওয়া উচিত। এ ছাড়া চীনা প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে শেয়ারবাজারের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা মিলবে। আর তাই ডিএসই ও বিএসইসি দ্বন্দ্বে কয়েকদিন থেকে দেশব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কৌশলগত অংশীদারিত্ব পাচ্ছেন কারা? চীন নাকি ভারতের ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের কনসোর্টিয়াম?

তবে শেষ পর্যন্ত নানা নাটকীয়তার পর চীনের সেনজেন ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের কনসোর্টিয়ামকে (জোট) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হওয়ার অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

২৩. কয়লার ধোঁয়া আমাদের বিদ্যুৎ ভারতের!

গোয়েন্দাবৃত্তির মূল উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রে নিজ দেশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে। যতটা সম্ভব। পুরোপুরি হয়ে গেল তো দেশটিই দখল হয়ে যায়। তদুপরি বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখা হওয়ায় এসব 'র'-এরই কাজ হিসেবে নির্দিষ্ট। তাই বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারে 'র'-এর অন্যতম এজন্ডা।

সুন্দরবনের পাশে রামপাল এলাকায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। দেশের আপামর জনতা, শিক্ষাবিদ, পরিবেশবিদদের মতামত উপেক্ষা করে সরকার এটি করছে। এতে ক্ষতি তো আমাদের হবেই বরং রীতিমতো অপমানজনক এক চুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভারতের স্বার্থে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হচ্ছে বলে মনে করেন পরিবেশবিদগণ। আওয়ামীপন্থি বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কল্পবিজ্ঞান লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবালের "রামপালের কালো ধোঁয়া"-শিরোনামে দৈনিক যুগান্তরে গত ১২ আগস্ট (২০১৬) প্রকাশিত এক নিবন্ধের খানিকটা তুলে ধরছি :

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মতো সমমনা বেশ কয়েকজন শিক্ষক অনেক বছর থেকে সপ্তাহের একটি দিন বসে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। এই সপ্তাহে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল 'বিদ্যুৎ নাকি সুন্দরবন? নাকি দুটোই?' নানা বিষয়ের নানা বয়সের অনেক শিক্ষকের মাঝে আমি একজন শিক্ষককেও খুঁজে পাইনি, যিনি রামপালের এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে মেনে নিতে রাজি আছেন। এই শিক্ষকরা আবেগনির্ভর যুক্তিহীন মানুষ নন। দেশের জন্য তাদের

ভালোবাসা আছে, সরকারের জন্য মমতা আছে, তারপরও তাদের কারও কাছে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র একটি গ্রহণযোগ্য প্রজেক্ট নয়।

পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি বের হয়েছে, যার মধ্যে কোনো লেখাতেই রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের পক্ষে কাউকে কিছু লিখতে দেখিনি। শুনেছি টেলিভিশনের টকশোতে সরকারের পক্ষের কিছু মানুষ এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের পক্ষে কথা বলে যাচ্ছেন; কিন্তু কয়লানির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের পক্ষে কাউকে নরম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। পৃথিবীর সামনে গর্ব করার মতো আমাদের খুব বেশি কিছু নেই, সুন্দরবন এর মধ্যে ব্যতিক্রম। যারা সুন্দরবন দেখেছে তারা এটাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসে। সেই সুন্দরবনের ক্ষতি হয়ে যাবে সেটি এ দেশের কেউ মেনে নেবে না।

দেশের একেবারে সাধারণ মানুষও এতদিনে জেনে গেছে, প্রস্তাবিত ১৩২০ মেগাওয়াটের অর্ধেকও পাওয়া সম্ভব নয়, প্রায় দ্বিগুণ দামে এই ইলেকট্রিসিটি কিনতে হবে, লাভের টাকা চলে যাবে ভারতে, পরিবেশ নষ্ট হবে বলে দুই-দুইটি ব্যাংক এই প্রজেক্ট থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। আমার মনে হয়, এরপরও জোর করে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করার চেষ্টা করলে সরকার তার অর্জনের অনেকটুকুই ম্লান করে ফেলবে।"

২৪. বাংলাদেশের সংস্কৃতি ধ্বংসে কাজ করছে 'র'

ভারতীয় সংস্কৃতি আমদানি করে এদেশের বিভিন্ন শ্রেণিপেশায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যেমন মনোরঞ্জন করত তেমনি এসব জলসা, সংগীতসন্ধ্যা, আসর বা পার্টি থেকে কৌশলে রাষ্ট্রীয় অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করত 'র'। এতে ভারতীয় সংস্কৃতিকর্মীদের যেমন এদেশে কাজ করার সুযোগ তৈরি হতো তেমনি দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অনীহা তৈরি হতো। তেমনি এক বর্ণনা পাওয়া যায় "বাংলাদেশে র'" বইয়ে। বইটির লেখক আবু রুশদ বলেন, "১৯৯১ সালের বাংলাদেশে র'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিল মি. মহাপাত্র। ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের কূটনীতিকের ছদ্মাবরণে তিনি ছিলেন ইন্টেলিজেন্স ক্যাডারের কর্মকর্তা।

১৯৯১ সালের পর প্রায়শই ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে কথক নাচের আয়োজন করা হতো। সেখানে মি. মহাপাত্র ও তার সুপ্রশিক্ষিত স্ত্রী

থাকতেন আসরের মধ্যমণি। পৃথিবীখ্যাত ভারতীয় কথক নাচের ওইসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হতো দেশবরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে বিরোধী দল এমনকি সরকারের বহু হোমরা চোমড়া মন্ত্রীদের। আপাত দৃষ্টিতে নাচ দেখার জন্য সেখানে দাওয়াত কবুল করতে কোনো মন্ত্রী আপত্তির কিছু দেখতেন না। সরল বিশ্বাসে উপস্থিত হতেন কথক নাচ দেখার জন্য। অথচ এই নাচের ফাঁকে ফাঁকে বা আপ্যায়নের সময় মি. মহাপাত্রসহ ভারতীয় কূটনীতিকদের ছদ্মাবরণে থাকা 'র' অপারেটিভগণ মন্ত্রী, এমপিদের কাছ থেকে আলাপছলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন লাভ করতেন তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গেও ভারতের অনুকূলে আদায় করতেন অসংখ্য সুবিধা। এভাবে চলে গেছে বেশ কয়েকদিন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশি গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের নজরে আসার প্রেক্ষিতে সরকারি উচ্চপর্যায়ে এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয় এবং একপর্যায়ে এ ধরনের অনুষ্ঠানে সরকারি দলের সদস্যদের যোগদান বন্ধ হয়ে যায়। তবে তাই বলে যে কথক নাচের আসরসহ বিভিন্নরূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আড়ালে 'র' তার কার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছিল তা কিন্তু নয়। বরং অসংখ্য নাট্যশিল্পী সংগীতশিল্পী বুদ্ধিজীবী কলামিস্ট যারা জ্ঞাতসারে বা অবচেতনভাবে 'র'-এর চক্রে জড়িয়ে গিয়েছিল তাদের আনাগোনা এসব অনুষ্ঠানে মোটেও হ্রাস পায়নি। তথ্য আদান-প্রদান করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশ লেনদেন রুটিন ওয়ার্ক চলেছে স্বাভাবিকভাবে।" (বইঃ "গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথাঃ বাংলাদেশে 'র": অধ্যায়-১০, পৃষ্ঠা-২২২। লেখকের সূত্রঃ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত এনএসআই'র মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত দুজন ঊর্ধ্বতন সেনা কমকর্তার সাক্ষাৎকার)

ওপরের দলিল দেখলে বোঝা যাচ্ছে, ১৯৯১ সালের পর ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে ভারতীয় কথক নৃত্যের আয়োজন ছিল মূলত 'র'-এর সদস্য রিক্রুট করা এবং বিভিন্ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের একটি উপলক্ষ্য মাত্র।

সময় পাল্টেছে, এখন সবকিছুই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অনুকূলে। এখন আরো বড় পরিসরে আর্মি স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হচ্ছে উচ্চাঙ্গ

সংগীতের অনুষ্ঠান। ২০১২ সাল হতে শুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান। প্রথম ছিল ৪দিন, পরের বছর বেড়ে হয় ৫দিন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে দিচ্ছে খোদ বর্তমান (২০১৮) সরকারের অর্থমন্ত্রী-সংস্কৃতিমন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিল ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। অনুষ্ঠানের স্পন্সর এনজিও ব্র্যাক, ধর্মান্তরিত স্কয়ার। প্রচারের দায়িত্ব প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, মাছরাঙা টিভির মতো চিহ্নিত বাইরের মদদপুষ্ট মিডিয়াগুলোর। আর অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ থাকে ভারত থেকে আসা একঝাঁক গায়ক-বাদক-নৃত্যশিল্পী ।

এ অনুষ্ঠান শুধু উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন নয়, বরং বিদেশি এজেন্ট সম্মেলন বলতে পারেন,

-এখানে নতুন সদস্য রিক্রুট হবে,
-পুরাতন সদস্যদের আলাপ-আলোচনা হবে,
- সংস্কৃতির নাম দিয়ে বাংলাদেশিদের ব্রেইন ওয়াশ হবে,
- ভারতীয় ভালোবাসা প্রবেশ করানো হবে,
- বাংলাদেশকে শোষন করার নতুন কোনো পরিকল্পনা গৃহীত হবে।

সর্বোপরি, এগুলো দেখে একসময় অভ্যস্ত হয়ে যাবে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ। তখন তাদের ভারতীয় আগ্রাসন দেখে আর গায় চুলকোবে না, সীমান্তে ফেলানীর ঝুলন্ত লাশ দেখে গা শিউরে উঠবে না, ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশে ঢুকে গেলে মুখ দিয়ে কথা বের হবে না। প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজ তখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, বলতে থাকবে: "থাক না, ভারতই তো ভালো, তাদের সংস্কৃতি কত ভালো। আমার খুব পছন্দ। বাংলাদেশ ভারত হলে কতই না ভালো হতো।"

২৫. অখণ্ড ভারত গঠনে কাজ করছে 'র'

ভারতের বর্তমান শাসক দল হলো ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি। বিজেপি'র অঙ্গ দল হলো রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ তথা আর.এস.এস। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বর্তমান অবস্থানে উঠে এসেছেন এ সংগঠন থেকে। বিজেপির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক (২০১৫ সালের)রাম মাধাবও

এক সময় আর.এস.এস'য়ের মুখপাত্র ছিলেন। এটি এখন কোনো গোপন বিষয় নয় যে, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের মূল এজেন্ডা হলো অখণ্ড ভারত নির্মাণ এবং সেই ভারতের প্রতিরক্ষা দেওয়া। সে লক্ষ্যে দলটির নারী ও পুরুষ নেতাকর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর.এস.এস'য়ের কেন্দ্রীয় দফতর অবস্থিত নাগপুরে; এ দফতরের দেয়ালে শোভা পায় অখণ্ড ভারতের একটি বিশাল মানচিত্র। সে মানচিত্রে বাংলাদেশ বলে কোনো দেশ নাই, পাকিস্তান বলেও কোনো দেশ নাই। আছে শুধু অখণ্ড ভারত। দলটির নেতাকর্মীদের সেটিই ভিশন। আল জাজিরা ইংরেজী টিভি চ্যানেলের উপস্থাপক মেহেদী হাসান নাগপুরে গিয়ে সে মানচিত্রটি দেখতে পান। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাম মাধাবকে আল জাজিরা'র একটি প্রোগ্রামে তিনি প্রশ্ন করেন, কেন এ মানচিত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাম নেই? রাম মাধাব অকপটে বলেন, আর.এস.এস চায় অখণ্ড ভারত।- (হেড টু হেড,আল জাজিরা টিভি চ্যানেল, ইংরেজী, ২৬/১২/১৫)। লক্ষ্য যখন অখণ্ড ভারত নির্মাণ; সে রাজনীতিতে কি স্বাধীন বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের জন্য কোনো স্থান থাকে?

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তার নেতা গান্ধি, নেহেরু ও বল্লব ভাই প্যাটেলেরও লক্ষ্য ছিল অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠা। সে অখণ্ড ভারতের নির্মাণে তারা ১৯৪৭ সাল থেকেই একের পর একটি দেশ গ্রাস করেছে। ১৯৪৮ সালে গ্রাস করেছে কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, গোয়া ও মানভাদার এবং ১৯৭৪ সালে গ্রাস করে সিকিম। তবে তাদের সমরনীতি বা রাজনীতির এখানেই শেষ নয়। প্রতিবেশী দেশের ওপর এরূপ সামরিক আগ্রাসন নিয়ে আজকের ক্ষমতাসীন বিজেপী ও ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেসের মাঝে দ্বিমত নেই। ভারতের বিভক্তি রুখতে ১৯৪৭ সালে তারা ব্যর্থ হয়েছিল মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্বের কারণে। তবে সেদিন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা রুখতে ব্যর্থ হলেও অখণ্ড ভারত নির্মাণের স্বপ্নটি কোনো কালেই তাদের মগজ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। সে লক্ষ্য পূরণে সবচেয়ে বড় বাধা হলো শক্তিশালী পাকিস্তান। পাকিস্তান খণ্ডিত হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোগুলোকে কবজা করার কাজটি সহজতর হয়। সমগ্র উপমহাদেশের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগে

ভারতের স্বাধীনতাটি তখন বাড়ে। তাই ১৯৪৭-এর পর থেকে ভারতীয় নীতি হয় প্রতিবেশী পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা এবং বিচ্ছিন্ন টুকরোকে ধীরে ধীরে ভারতীয় দখলদারিতে আনা। সে লক্ষ্যে ভারত বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে "জিয়ে সিন্ধ" আন্দোলনের নেতা জি.এম. সৈয়দের মাধ্যমে। লক্ষ্য, পাকিস্তানে থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন সিন্ধু দেশের প্রতিষ্ঠা। সীমান্ত প্রদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে "সীমান্ত গান্ধি" নামে পরিচিত কংগ্রেস নেতা আবদুল গাফ্ফার খানের নেতৃত্বে স্বাধীন পখতুনিস্তান প্রতিষ্ঠায়। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে ময়দানে নামায় স্থানীয় ভারতপন্থি রাজনীতিকদের।

এখনও চালিয়ে যাচ্ছে বেলুচিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ। মুহাজির অধ্যুষিত পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শহর করাচী এবং পাশ্ববর্তী হায়দারাবাদকে নিয়ে চেষ্টা চালায় স্বাধীন মুহাজিরস্তান প্রতিষ্ঠায়। অনেকের অভিমত, ভারত এ লক্ষ্যে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে লন্ডন প্রবাসী মুহাজির নেতা আলতাফ হোসেন ও তার সংগঠন মুহাজির কাওমী মাহাজ (এমকিউএম)-কে।

২৬. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে 'র'

বছর কয়েক আগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি অংশ অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছে বলে সেনা সদরের একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল। যদিও ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ফেসবুকের বিভিন্ন পোস্টের মাধ্যমে এর কিছুটা জানতে পারা গিয়েছিল। মেজর জিয়াউল হকের একটি ই-মেইল তার একজন ঘনিষ্ঠ মানুষ ফেসবুকসহ বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট করেছিলেন, সে সুবাধেই সেনাবাহিনীর বিভেদ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। যদিও এটার সত্য-মিথ্যা যাচাই করা সম্ভব ছিল না।

সেই ই-মেইলটিতে মেজর জিয়াউল হক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর অনুপ্রবেশের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাকে অপহরণ করার পর গোপন জিজ্ঞাসাবাদের সময়

ডিজিএফআই-এর পাশাপাশি 'র'-এর গোয়েন্দারাও সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তারাও তাকে দোভাষীর সাহায্যে জেরা করেছিল। মেজর জিয়ার ভাষ্য মতে, 'র'-এর এজেন্টরা যখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পাশে বসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন মেজরকে জেরা করতে পারে তখন নিশ্চিত বোঝা যায় ডিজিএফআই এখন চালাচ্ছে ভারতীয় সরকার।

মেজর জিয়ার ভাষ্যমতে, 'র' বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় এবং ৬৪টি জেলাভিত্তিক ফিল্ড অফিসের মেধাবী অফিসারদের ব্যবহার করে এক-এগারোর মতো আরেকটি অবস্থা সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। 'র'-এর সাথে হাত মিলিয়েছে কিছু উচ্চাভিলাষী জেনারেল। এরা বর্তমান শাসক দলকে মদদ দেওয়ার ভান করছে। কিন্তু যখন এদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে তখন পথের কাঁটাদের নির্মূল করা হবে। এ ঘটনা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটির জন্য তা এক ভয়াবহ বিপদ সংকেত।

সেনাবাহিনীর ভেতর এরকম অস্থিরতা নিয়ে ২০ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে বিবিসি বাংলা দুটি নিউজ করে "হিযবুত বিরোধী অভিযান" ও "বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের চেষ্টা নস্যাৎ" শিরোনামে। যার চুম্বক অংশ... সেনা সদরদপ্তরে ওই সংবাদ সম্মেলনে সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার রাজ্জাক লিখিত বক্তব্যে আরো বলেন, ... সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা সৃষ্টির অপর পরিকল্পনাকারী মেজর সৈয়দ মো. জিয়াউল হক ত ২২শে ডিসেম্বর কর্মরত অন্য এক কর্মকর্তাকে একই ধরনের কাজ রার প্ররোচনা দেন। এই কর্মকর্তা বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানালে মজর জিয়াউল হকের ছুটি ও বদলির আদেশ বাতিল করা হয়। তাকে াকার লগ এরিয়া সদর দপ্তরে যোগ দিতে বলা হয়।

২৭. 'র' নিয়ে একটি বিস্ময়কর বই 'বাংলাদেশে র'

২০০১ সালে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' নিয়ে আমাদের দেশে একটি ই বেরিয়েছিল। বইটির মাধ্যমে না জানা অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সেসময় জানা গিয়েছিল।

বইটির নাম গোয়েন্দাসংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা 'বাংলাদেশে র' আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপসন্ধানে। এর লেখকের নাম আবু রুশদ। এই বইটিতে লেখক এমন অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে নতুন করে জাতি চিন্তার খোরাক পায়। ওনার দেওয়া সেই চাঞ্চল্যকর তথ্যগুলো আজ আবার আলোচিত হচ্ছে সেই চাঞ্চল্যকর বইটির কিছু তথ্য ...

বইটির ভূমিকায় ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এম.এ মতিন (অব.) বীরপ্রতীক প্রিওসসি লিখেছেন:

"যেহেতু আমি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংগঠন 'ডিজিএফআই' তথা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি, সেহেতু এ দেশের বুকে 'র'-এর অপতৎপরতা সম্পর্কে আমার অল্প-বিস্তর ধারণা রয়েছে। একটি আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন জাতি হিসেবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদেরকেই ভাবতে হবে। আর তাই স্থায়ীভাবে কাউকে আমাদের শত্রু বা মিত্র বলে জ্ঞান করার কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। আজ যে আমাদের পরম মিত্র, পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাল সে ঘোরতর শত্রু বলে পরিগণিত হতে পারে। আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের নজির বিরল নয়।"

লেখক ও গবেষক আবু রুশদ বইটিতে বাংলাদেশে 'র'-এর অপকীর্তি সম্বন্ধে যেসব কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের দেশের মানুষকে ব্যাপকভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। তিনি র-এর সেসব অপকীর্তি তালিকা আকারে সে বইতে উল্লেখ করেছেন:

১. পার্বত্য চট্টগ্রামে (সন্ত্রাসী) শান্তিবাহিনী গঠন করে যাবতীয় উপায়ে ভারতীয় সেনারা প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনী ২৫ বছর যুদ্ধ করেছে। বহু অন্যায় দাবিতে তারা বিদ্রোহ করেছে এবং বাঙালিদের হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের সকল দাবি মেনে নিয়ে বাঙালিদের নিজ দেশে পরবাসী বানিয়ে দিয়েছে।

CamScanner

২. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যা: লেখক অনেক তথ্য-প্রমাণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন, ভারত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে হটিয়ে একটি বন্ধুভাবাপন্ন শক্তিকে ক্ষমতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জিয়া হত্যার মাত্র ১২ দিন পূর্বে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসে। জিয়া হত্যার খবর পেয়ে শেখ হাসিনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্ত দিয়ে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা বাধ সাধায় তিনি সে যাত্রায় পার হতে পারেননি।

৩. স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন: ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। পরের দিনই 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' নামে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছিল। এক সময়কার আওয়ামীলীগ নেতা ড. কালীদাস বৈদ্য 'বঙ্গসেনা' নামে একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনীও গড়ে তুলেছিল। খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে এই হিন্দুরা গঠনের চক্রান্ত চালানো হয়েছিল। এটার পেছনেও 'র'-এর হাত ছিল।

৪. বাংলাদেশ সরকারের ভেতরে-বাহিরে ৩০ হাজার 'র'-এর এজেন্ট তৎপর শিরোনামে তিনি লিখেছেন, মন্ত্রী, এমপি, আমলা, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রকাশক, অফিসার, কর্মচারী পর্যায়ের লোকজনই শুধু নয়; ছাত্র, শ্রমিক, কেরানী, পিওন, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কুলি, টেক্সিড্রাইভার, ট্রাভেল এজেন্ট, ইন্ডেটিং ব্যবসায়ী, সিএন্ডএফ এজেন্ট, নাবিক, বৈমানিক, আইনজীবিসহ বিভিন্ন স্তরে তাদের এজেন্ট সক্রিয় রয়েছে।

৫. ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি: এ কমিটির পেছনেও 'র'-এর হাত রয়েছে বলে লেখক তার বইতে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ১৯৯৪ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে সৃষ্ট আন্দোলনে জামাত আওয়ামী লীগের শরীকে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে এ ঘাদানিক কমিটির সকল দাবি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। অথচ তারা একসময় গণ-আদালত গঠন করে গোলাম আযমের ফাঁসি দাবি

করলেও আওয়ামী লীগ-জাপা-জামাত জোট গঠনের পর একটি বারের জন্যও সে ফাঁসির রায় কার্যকর করার একটি টু শব্দও তারা করেনি। একদিকে ঘাদানিক গঠন ও এর উদ্দেশ্য যে ঘাতকদের বিচার নয় ভিন্ন কিছু ছিল সে ব্যাপারে ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। ১৯৯১ সালে বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে গঠন হলেও ১৯৯২ সালের পর হতে ১৯৯৯ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত এই ঘাদানিক-এর কোনো সাড়া-শব্দ ছিল না। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঘটনা বিশ্লেষণ করে কি বোঝা যায় না, কী উদ্দেশ্যে, কাদের স্বার্থে এ কমিটির সৃষ্টি?

জিনাফ বা 'জিয়া নাগরিক ফোরাম" কর্তৃক প্রকাশিত বইটিতে মোট ১১টি অধ্যায় রয়েছে। এর মধ্যে অধ্যায়-৯-এর শিরোনাম "বালাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত-'র' কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড"। অধ্যায়-১০ শিরোনাম "দূতাবাস, এনজিও, এবং মিশনারী ভিত্তিক গুপ্তচরবৃত্তি। অধ্যায়-১১-এর শিরোনাম" গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালকদের সাক্ষাৎকার। সেখানে ৬জন বাংলাদেশের সাবেক ডিজিএফআই মহাপরিচালকদের সাক্ষাৎকার তুলে ধরে হয়।

ওপরে উল্লেখিত ঘটনাগুলো অনেক আগের। সাম্প্রতিককালে (২০০৮-২০১৮) এরকম আলোচিত ঘটনার মধ্যে রয়েছে ফখরুদ্দিন-মইন ইউ আহমেদ সরকারের পাতানো নির্বাচন, বিডিআর হত্যা, শাহবাগ গণজাগরন মঞ্চের নামে নাস্তিক্যবাদী শক্তির উত্থান, ঢাকার মতিঝিলে হেফজত কর্মীদের ওপর বর্বরতা, সাধারণ ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন দমন, স্কুল ছাত্রদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন দমন, ভারতের সাথে গোপন সামরিক চুক্তি এবং সর্বশেষ তাবলীগ জামাতে বিভাজন সৃষ্টি।

মেজর জিয়াউল হক এবং লে. (অব) আবু রুশদ-এর ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে বোঝা যায়, প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ভারত তার গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন সেক্টরে কল-কাঠি নাড়ছে। ভারত তার পছন্দের এবং সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দ্বারা বাংলাদেশে এক মহাবিপর্যয় ঘটাতে চাচ্ছে। ৪৮ বছর হয়েছে আমাদের দেশ স্বাধীন (!) হয়েছে। বিগত যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে

বাংলাদেশের রাজনীতিতে হিংসা-বিদ্বেষ চরম আকারে ধারণ করেছে। দেশের মানুষের অজান্তে দেশে যেকোনো সময় এমন বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, যখন আর কিছুই করার থাকবে না।

২৮. বাংলাদেশের হিন্দুদের সাথে 'র'-এর সম্পর্ক!

এ ব্যাপারে 'বাংলাদেশে 'র' নামক বই থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করছি

"...সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পকাহিনি ও বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিতকরণ"

'র'-এর প্ররোচনায় বিজেপি শুধু স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন ও মোহাজির সংঘ তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি, যাবতীয় উপায়ে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি উগ্র হিন্দু বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করাই 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য। ভারতে অব্যাহত মুসলমান নির্যাতন, সংখ্যালঘু বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মূলত 'র' এই পথে অগ্রসর হয়। .....লক্ষ করলে দেখা যাবে, '৯০ সালে ভারতে বাবরী মসজিদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই 'বাংলাদেশের হিন্দুরা নিরাপদে নেই' এ ধরনের প্রচারণা জোরদার করা হয়। এরকম একটি প্রচারণা চালিয়েছিল 'বঙ্গভূমি আন্দোলন'র নেতা ও ভারত সেবা আশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ বিজয়া নন্দজী মহারাজ। ('বঙ্গভূমি আন্দোলন' হচ্ছে উগ্রহিন্দুদের একটি আন্দোলন, যারা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে একটি পৃথক হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করতে চায়)।.... (বইটির পৃষ্ঠা: ১৬৬)

...."বাংলাদেশে যেসব হিন্দু সংগঠন বাংলাদেশ বিরোধী অপতৎপরতা চালাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে- বালাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, প্রণব মঠ ও সেবাশ্রম, বাংলাদেশ সন্ত মহামণ্ডল, বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশন, বিশ্ব ধর্ম ও শান্তি সম্মেলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ চৈতন্য সংস্কৃতিক সংঘ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ইত্যাদি। এ সব সংগঠন আবার নিয়মিত পত্রিকা বের করে।...বাংলাদেশের ওইসব সংগঠন মূলত ভারতের সাম্প্রদায়িক সংগঠনের শাখা হিসেবে কাজ করছে। আর এই

কাজের সমন্বয় করে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা, অর্থাৎ ভারেতের গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশের ওইসব সংগঠনের মাধ্যমে তৎপরতা চালায়। কত সুচতুরভাবে যে অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে তা খতিয়ে দেখলে সবাই বিস্মিত হয়ে যাবেন। বাইরে মনে হবে, তারা নিছক হিন্দু ধর্মীয় তৎপরতা চালাচ্ছে। আসলে তারা হিন্দু ধর্মীয় তৎপরতার নামে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পনাটিই কার্যকর করছে। এ ছাড়া 'ইসকন' নামে একটি সংগঠন বাংলাদেশে কাজ করছে। এর সদর দফতর নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। মূলত এটা ইহুদিদের একটি সংগঠন বলে জানা গেছে। এই সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানিমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি।".... (বইটির পৃষ্ঠা: ১৭০, ১৭১)

..."বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কৌশল হচ্ছে 'ডিইসলামাইজেশন' নীতি। অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে ইসলামি মূল্যবোধে আঘাত হানা। এজন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে। এটাকে তারা ব্যবহার করেছে বিভিন্ন কায়দায়। প্রথমত, এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মাধ্যমে প্রচার করছে যে, 'ইসলাম সেকেলে জীবনপদ্ধতি, এটা এই আধুনিক যুগে অচল। একমাত্র নিরপেক্ষতাই হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিক কনসেপ্ট'। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভারত এ ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের যেমন বিভ্রান্ত করছে, তেমনি আবার ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের কৌশলে সংখ্যালঘু মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার মধ্যে ফেলে দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করছে। দুজায়গাতেই তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানরা। দ্বিতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষতার নাম দিয়ে, হিন্দু সংগঠনগুলোকে উগ্রবাদী করে তোলা হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে, ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়ায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নির্যাতিত হচ্ছে। যদিও এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। তথাপি অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। এসবের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়া। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলো এই লক্ষ্যেই কাজ করছে।" (বইটির পৃষ্ঠা: ১৭৩)

২৯. বাংলাদেশ নিয়ে এক 'র' অফিসারের খোলামেলা বর্ণনা

ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক (এসপিওনাজ/কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স) গোয়েন্দা সংস্থা 'রিসার্চ এন্ড এনালিসিস উইং' বা 'র'-এর সাবেক অফিসার আর.কে. যাদব। স্পাইং ক্যারিয়ার শেষে অবসর নেওয়ার পর এখন তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে লেখালেখি করেন। টকশো করেন। গোপন গোয়েন্দা কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে 'মিশন 'র' নামে একটি বইও লিখেছেন।

এ বছর (২০১৫) ষোলো ডিসেম্বর তিনি ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। শিরোনাম হলো "একাত্তরের বাংলাদেশ যুদ্ধ: 'র'-এর যে নায়কদের সম্মান করতে ভারত ভুলে গেছে"। এর ভাবানুবাদ...

"১৯৭১ সালের ষোল ডিসেম্বর। পাকিস্তানি আর্মির পরাজয়ের এ দিনটিকে ভারত এবং বাংলাদেশ দুটি দেশই বিজয় দিবস হিসেবে উদযাপন করে। অথচ এ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যারা রেখেছিল, এ লড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছিল যারা, তাদের সম্পর্কে সবাই এখনো নীরব থেকে গিয়েছে। তাদের সম্পর্কে গত চৌচল্লিশটি বছর ধরে একটি কথাও বলা হয়নি। এরা হলো 'র'-এর সাহসী অফিসারের দল। আর.এল. কাও-এর নেতৃত্বে এরাই ছিলেন একাত্তরের যুদ্ধের প্রকৃত যোদ্ধা। আমি বিশ্বাস করি এখন সময় এসেছে একাত্তরের যুদ্ধে এই গোপন সংস্থার অবদান সম্পর্কে দেশবাসীকে জানানোর।

একাত্তরের যুদ্ধ আসলে ছিল দুই পর্যায়ে বিভক্ত এক ঘটনা। প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধ ছিল 'র'-এর পরিচালনায় গেরিলা যুদ্ধ। পরবর্তী সময়ে ডিসেম্বরের তিন তারিখ ভারতীয় আর্মির সরাসরি অংশগ্রহণে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৭০ এ পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের আগেই সেদেশের আর্মি, রাজনীতিবিদ এবং কূটনীতিবিদের বিভিন্ন জায়গায় থাকা 'র'-এর সোর্সরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিল, নির্বাচনে যদি শেখ মুজিবুর রহমান কোনোভাবে জিতেও যায় তবু তার হাতে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ক্ষমতা দেওয়া হবে না। এসময় আমরা জানতে পারি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে

বিপুল পরিমাণ সেনা সদস্যদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে বিমানপথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তখন 'র'-এর প্রধান কাও ভারতের মাটির ওপর দিয়ে আকাশপথ ব্যবহারের এ সুযোগ বন্ধ করে দিতে এক নিখুঁত অপারেশনের পরিকল্পনা করেন।

১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারী, 'র'-এর গোপন সদস্যরা শ্রীনগর থেকে টেইক অফ করা ভারতীয় এয়ারলাইন্সের একটি বিমান, যার নাম ছিল গঙ্গা, সে বিমানটি হাইজ্যাক করে। ছিনতাইকৃত সে বিমানকে তারা লাহোরে নিয়ে যায়। বিমানের সব যাত্রীকে শেষপর্যন্ত মুক্তি দেওয়া হয় এবং বিমানটিতে আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। গঙ্গা ছিল পুরনো একটি বিমান। এমনিতেই খুব শীঘ্র বিমানটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করার কথা ছিল।

যাহোক, বিমান ছিনতাই এর এ সন্ত্রাসী ঘটনার অজুহাতে তাৎক্ষণিকভাবে ভারতীয় সরকার ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের আকাশপথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। কাও এর এই গোপন অপারেশনের ফলে আকাশপথে পাকিস্তানের সৈন্য এবং সামরিক সরঞ্জাম পরিবহন ব্যাহত হয়। যদিও তারা শ্রীলঙ্কার কলম্বো হয়ে নৌপথে পরিবহন করার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিবাদসহ বিভিন্ন চাপে পুরো প্রক্রিয়াটি বেশ ধীর হয়ে পড়ে।

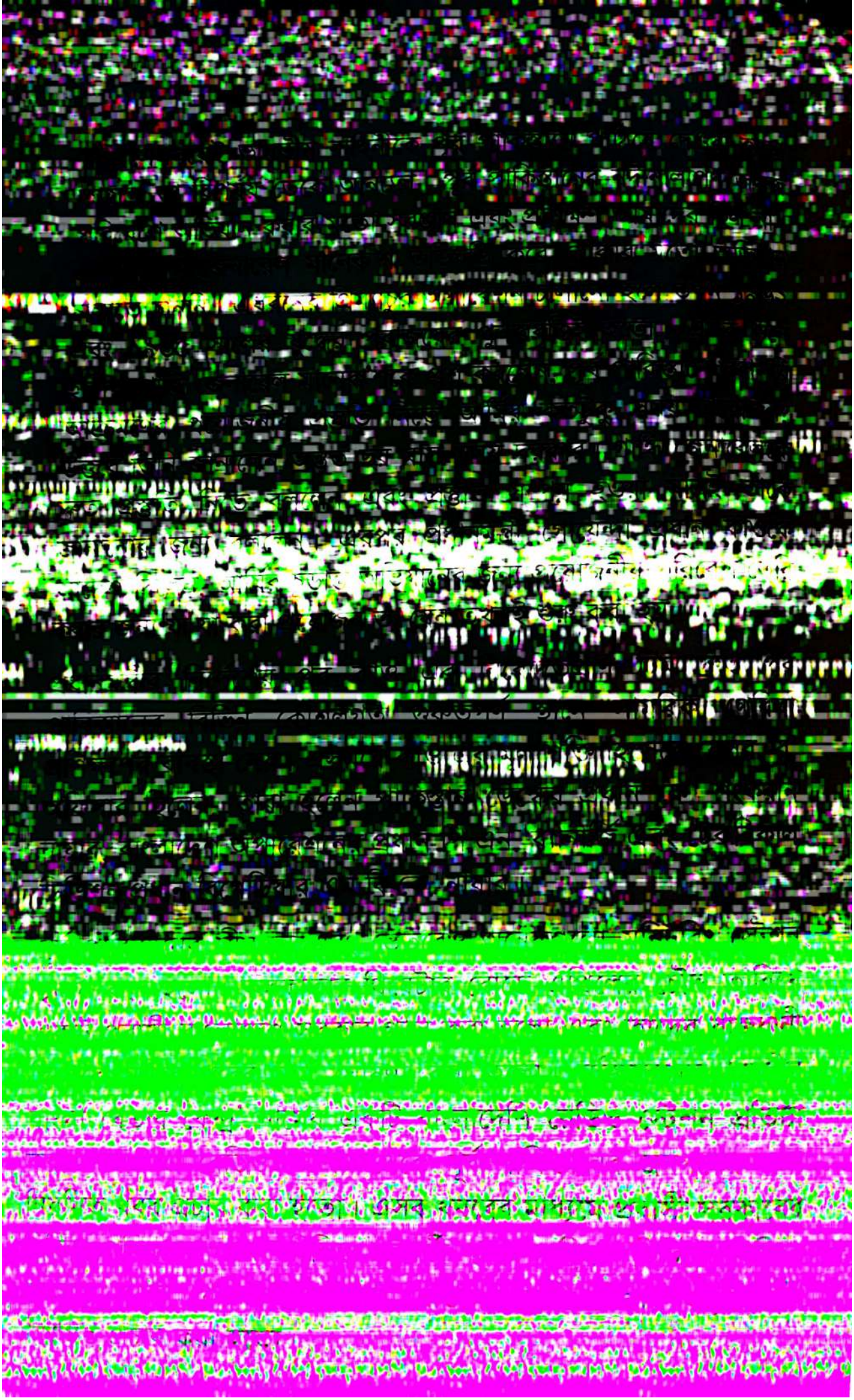
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বিকেল পাঁচটায় পাকিস্তানের সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে করাচী রওনা হন। কয়েকদিন থেকে চলে আসা রাজনৈতিক আলোচনা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, তখন ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার জন্য ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছান। ভারতের আকাশসীমা এড়িয়ে দুই হাজার মাইল দীর্ঘ এই বিমানযাত্রার জন্য প্রচুর নিরাপত্তার আয়োজন করা হয়।

ইয়াহিয়া খান জানতেন তিনি ঢাকায় থাকা অবস্থায় সামরিক অভিযান শুরু করলে সাথে সাথে ঢাকাতে ভারত সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বসতে পারে। তার কাছে রিপোর্ট ছিল 'র'-এর গোপন অভিযানে এমন কি তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। সবমিলে পাকিস্তান বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পরবে।

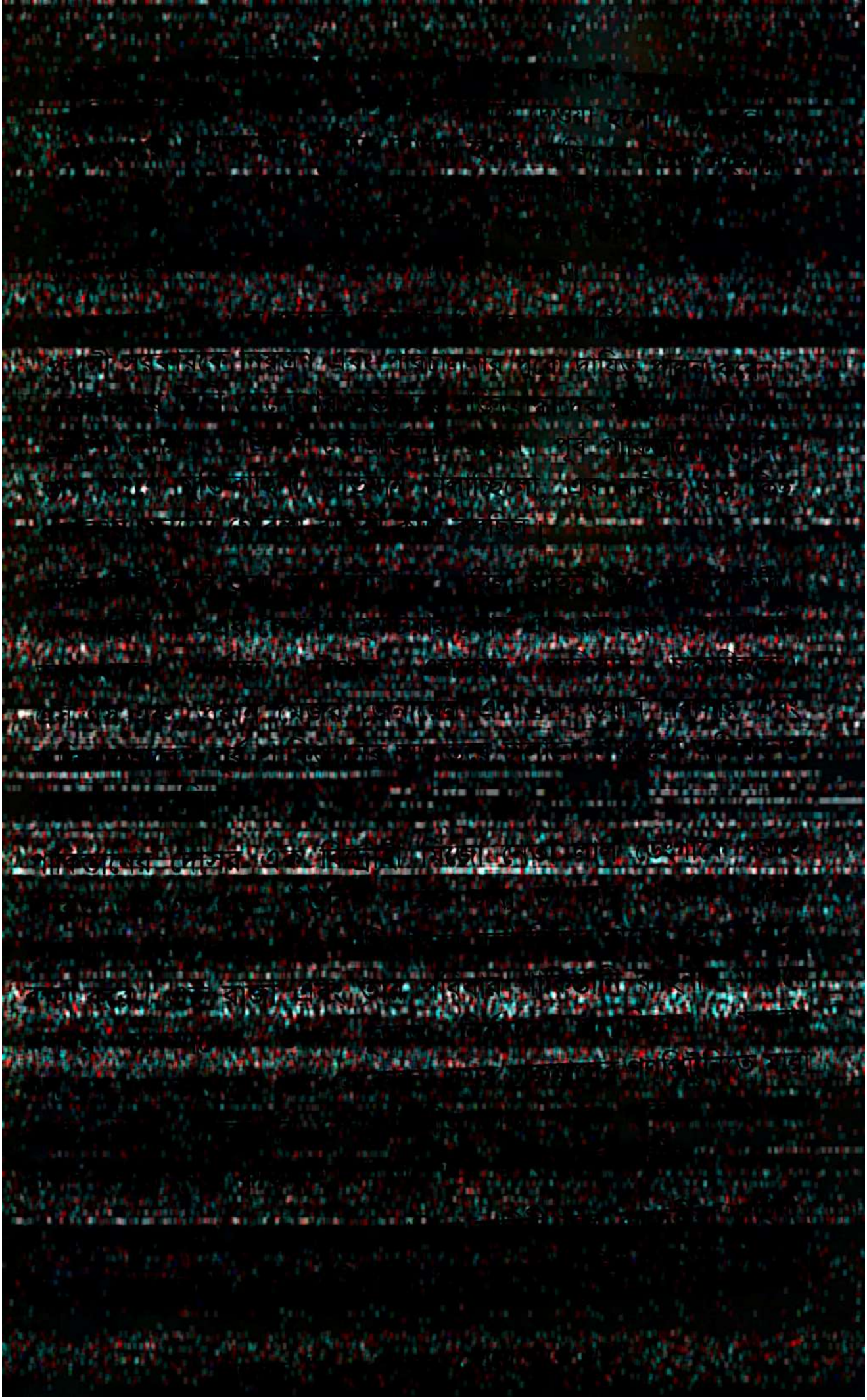
'র'-এর মাধ্যমে কোনোভাবে আটকে যাওয়ার কিংবা ফেরার পথে ভারতের মাটিতে জোরপূর্বক অবতরণের কোনো ঝুঁকি ইয়াহিয়া খান নিতে চাননি।

সুতরাং, তিনি করাচী পৌঁছার পরে সামরিক অভিযান শুরু করা হবে এমন পরিকল্পনা করা হলো। করাচীতে তার অবতরণ করার সংবাদ ঢাকাতে আর্মির কাছে পৌঁছার পরপরই রাত সাড়ে এগারোটায় বাঙালিদের ওপর চালানো নৃশংস গণহত্যা শুরু হলো। এর আগে ঠিক রাত আটটার সময় অপারেটিভরা বত্রিশ নাম্বার ধানমন্ডিতে মুজিবের সাথে দেখা করে তাকে জানিয়েছিল যে, রাতে পাকিস্তানি আর্মি তাকে গ্রেফতার করতে আসবে। তখন মুজিব তার অনুগত নেতাকর্মীদেরকে আত্মগোপন করতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি বাসা ছেড়ে নিজে অন্য কোথাও আত্মগোপনে যেতে রাজি হননি। তিনি ভাবছিলেন তাকে খোঁজার জন্য আর্মি পুরো ঢাকা তছনছ করে জ্বালিয়ে দিতে পারে। রাত প্রায় দেড়টার দিকে মুজিবকে গ্রেফতার করা হলো। এসময় পাকিস্তানি আর্মির এক গোপন বার্তা 'র' ইন্টারসেপ্ট করে। এতে বলা হয়েছিল, 'পাখিকে খাঁচায় ঢুকানো হয়েছে'। বার্তার এ খবর সাথে সাথে ভারতীয় মিডিয়ার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

পাকিস্তানি বাহিনী যখন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর ভয়াবহ ক্র্যাকডাউন চালাতে আরম্ভ করল, সেখান থেকে দলে দলে আশ্রয় নিতে আসা শরণার্থীর ভীড় ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো। এ পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সেনাপ্রধান স্যাম মানেক'শ এবং 'র' প্রধান আর.এন. কাও এর সাথে বৈঠকে বসলেন। তিনি এসময় তাদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার উপায় এবং কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি সেনাবাহিনী প্রধান মানেক'শকে বলেন এ অঞ্চলে পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে ভারতীয় আর্মির অভিযান চালাতে হবে। এর উত্তরে জেনালের মানেক'শ বলেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সব সময়ই ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে শিখিয়ে এসেছে যে তাদের ভূমিকা হলো প্রতিরক্ষামূলক। সেনাবাহিনীর মূল কাজ হলো নিজ দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা।



CamScanner



CamScanner

তার নেতৃত্বে এ বাহিনী ঢাকায় এবং বিভিন্ন নিকটবর্তী এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এরা বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়, সেনাবাহিনীর রসদ ও সামরিক সরঞ্জাম বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয় এবং তাদের পরিবহন করা গাড়িগুলোর ওপর আক্রমণ করতে থাকে। টাইগার সিদ্দীকীর বাহিনী এসময় অনেকগুলো ব্রিজ উড়িয়ে দেয়। এর ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর চলাচল মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

সবমিলে ভারতীয় আর্মির যুদ্ধ শুরু করার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে শক্তিশালী পাকিস্তানি বাহিনীর তিরানব্বই হাজার সেনার আত্মসমর্পণ করার এই ঘটনা সম্ভবপর হয়েছিল গেরিলা আক্রমণের প্রথম পর্যায় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় আর্মির চূড়ান্ত অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে। সাউথ ব্লকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের খুব কাছাকাছিই মানেক'শ এবং কাও অফিস ছিল। তাদের সবার মাঝে যোগাযোগ এবং বুঝাপড়া ছিল খুবই শক্তিশালী, এবং এ বুঝাপড়াই ছিল এ যুদ্ধে ভারতের বিজয়ের আসল শক্তি। কাও নিজে আমাকে একবার বলেছিলেন, তারা তখন যেকোনো সময় যখনই দরকার হতো তখন একজন আরেকজনের অফিসে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতা কিংবা ইতস্ততবোধ ছাড়াই ঢুকে যেতেন। এমনকি তারা অফিস সময়ের বাইরেও অনেক সময় যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশলগত পরিকল্পনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ব্যস্ত থাকতেন।

এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়টি ছিল 'র'-এর পরিচালনায়, যারা এক লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশিকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এরা দ্বিতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত আক্রমণের আগপর্যন্ত আট মাস যাবৎ পাকিস্তানি বাহিনীকে ব্যস্ত রেখেছিল। এরপর শুরু হলো যুদ্ধের শেষ পর্যায় যখন ডিসেম্বরের তের থেকে ষোল তারিখ পর্যন্ত সরাসরি লড়াই হলো। 'র'-এর জন্য এটি এমন এক অর্জন যার কোনো তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ইতিহাসে নেই।

পুরো বিষয়টি ছিল কাও এর পরিকল্পনা, যার অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তা ছিল অতুলনীয়। সেসময় মাত্র তিন বছর আগে 'র'-এর কার্যক্রম আরম্ভ

হয়েছিল। তাদের শক্তি এবং যন্ত্রপাতি খুব বেশি ছিল না। তবুও কাও তার অফিসারদের সাথে নিয়ে এ বিশাল অর্জন সফলভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। আমি তাকে যতদূর বুঝেছি, তিনি কখনো কোনো কাজ অর্ধেক করাতে কিংবা অসম্পূর্ণভাবে করে রাখাতে বিশ্বাস করতেন না।

অথচ ভারতের সরকার কাও এর এইসব অবদানকে ভুলে গিয়েছে এবং যুদ্ধে এ গোপন ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির ভূমিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। যারা বাংলাদেশিদেরকে একাত্তরে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তারা অনেক সম্মান দিয়েছে, কিন্তু এমনকি তারাও 'র'-এর কোনো অফিসারকে সম্মানিত করেনি। এ বিষয়টি আসলেই বিশাল একটি প্রশ্ন হয়ে থেকে গিয়েছে। যদিও এইসব নায়কদের অনেকেই এখন আর জীবিত নেই, এবং অনেকে অশীতিপর বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

এখনই উপযুক্ত সময়। সরকারকে তাদের রাজনৈতিক জড়তা ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং ভারতীয় গোয়েন্দা কার্যক্রমে কাও এর অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এর মাধ্যমে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এর নৈতিক শক্তি চাঙ্গা হবে এবং ভবিষ্যত সফলতার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।"

এ পর্যন্ত হলো 'র'-এর এক্স-অফিসার আর.কে. যাদবের লেখা। এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির নানা প্রশ্ন ও মন্তব্য দেখা যায়। যেমন আমান আবদুহু নামের একজন ব্লগার নিচের মন্তব্যগুলো করেন...

১. তাদের দৃষ্টিতে প্রথম আটমাসের যুদ্ধ ছিল 'র'-এর পরিচালিত এবং বাংলাদেশি গেরিলাদের, যাদের আমরা মুক্তিবাহিনী বলে গর্ব করি, তাদের অংশগ্রহণে গেরিলা যুদ্ধ। পরে তেরো দিন সরাসরি দুই দেশের সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ হয়। 'র'-এর অফিসার হিসেবে তিনি নিজের ফোর্সকে মহিমান্বিত করবেন এটা স্বাভাবিক। পুরো লেখাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী থেকে বিদ্রোহ করা বাংলাদেশি আর্মি অফিসারদের ভূমিকার কোনো উল্লেখ নেই। যাইহোক, এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আগে জানতাম শেষ তেরো দিন ভারতের যুদ্ধ। এখন জানলাম আসলে একাত্তরের পুরোটাই ভারতের যুদ্ধ। বরং, তারা একাত্তরের আগে থেকেই বিভিন্ন কাজকর্ম করে যাচ্ছিল।

২. ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের 'গঙ্গা' ছিল ফকার এফটুয়েন্টি সেভেন ফ্রেন্ডশীপ বিমান। ভারতীয় বিমান সংস্থার এটি ছিল সবচেয়ে পুরনো বিমান, যা বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে সার্ভিস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তবে ঘটনার কয়েকদিন আগে তা আবার চালু করা হয়। একাত্তরের জানুয়ারীর ত্রিশ তারিখে বিশিষ্ট কাশ্মীরি জিহাদী জনাব হাশিম কোরেইশী, যিনি বর্তমানে জম্মু কাশ্মীর ডেমোক্রেটিক লিবারেশন ফ্রন্টের চেয়ারম্যান, তিনি এবং তার সহযোদ্ধা আশরাফ ভাট বিমানটি হাইজ্যাক করে লাহোরে নিয়ে যান। পয়লা ফেব্রুয়ারী এক বিস্ফোরণে বিমানটি আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেসময় এটি ছিল আন্তর্জাতিকভাবে বিশাল এক ঘটনা। এখন জানা গেলো পুরোটা ছিল 'র'-এর সাজানো অপারেশন।

৩. শেখ মুজিবের সাথে 'র'-এর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। অবশ্য আগেও বিভিন্ন লেখাতে এ যোগাযোগের কথা এসেছে। পাকিস্তানের একজন অন্যতম রাজনৈতিক নেতার সাথে প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এ ধরনের যোগাযোগ সে গোয়েন্দা সংস্থার বিশাল কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে।

৪. রাজাকার রাজা ত্রিদিব রায়ের পরিবারকে রক্ষার ঘটনা থেকে বুঝা যায় 'র' দুই দিকেই দক্ষতার সাথে ভূমিকা রেখেছে।

৫. কাদের সিদ্দীকী 'র'-এর অপারেটিভ বা এজেন্ট। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশনের সোর্স হওয়া এক কথা, আর সরাসরি অপারেটিভ হওয়া অন্য কথা। সোর্সরা শুধু তথ্য সরবরাহ করে। যেমন ধরেন আপনি ইয়ুথ ডেলিগেশনে ভারত ঘুরে আসলেন, বিভিন্নভাবে খাতির হলো। পরবর্তীকালে সরকারি অফিসার হওয়ার পর আপনার মাধ্যমে তারা নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য পেল। কিন্তু অপারেটিভরা অর্গানাইজেশনের দেওয়া বিভিন্ন এসাইনমেন্ট বাস্তবায়ন করে। সে এসাইনমেন্ট যে শুধু সন্ত্রাসী কাজকর্ম হবে এমন কোনো কথা নেই। শ্যাডো-বিরোধীতা তৈরি করাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা এসাইনমেন্ট হতে পারে।

৩০. বাংলাদেশে 'র' কতটা প্রভাবশালী?

এ ব্যাপারে ডিজিএফআই'র সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব:) এম এ হালিম এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলতেন, "বাংলাদেশে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' -এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার করা ও সব ব্যাপারে বাংলাদেশকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা।"[১]

এবার নিচের তথ্যগুলোর দিকে খেয়াল করুন:

১. বাংলাদেশে অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কন্সট্রাকশন ফার্ম থাকার পরও যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার বানানো হলো ভারতীয় কোম্পানি সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাচার দিয়ে।

২. বাংলাদেশে বিদেশে রফতানিকারী ঔষধ কোম্পানি থাকলেও শিশুদের জন্য ভিটামিন এ ক্যাপসুল বানানো হলো ভারতের বিতর্কিত 'অলিভ হেলথ কেয়ার'র মতো কোম্পানি দিয়ে (২০১৫)।

৩. দেশি কোম্পানিগুলোর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও দ্বিতীয় ভৈরব সেতু বানানো হচ্ছে ভারতীয় কোম্পানি ইরকন ও এফকন্সকে দিয়ে।

৪. দেশি কোম্পানিগুলোর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও দ্বিতীয় তিতাস রেলসেতু বানানো হচ্ছে ভারতীয় কোম্পনি গ্যানোন ও এফএলসিএলকে দিয়ে।

৫. বাংলাদেশের ভ্যাকসিন উৎপাদন বন্ধ করে ৩১২ কোটি টাকার ভ্যাকসিন আনা হয়েছে ভারতের অখ্যাত সিরাম ইন্সটিটিউট থেকে।

৬. বাংলাদেশে অজস্র ছাপাখান থাকলেও বোর্ডের বই ছাপানো হচ্ছে ভারতীয় কোম্পানি গফ সন্স ইন্ডিয়া, ক্যালিকো, রেপপ্রো ইন্ডিয়া'র মতো কোম্পানি দিয়ে।

৭. বাংলাদেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

---

১. সূত্র: গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা: বাংলাদেশে 'র', পৃষ্ঠা: ২৪৪

CamScanner

৮. বাংলাদেশে অসংখ্যা রিয়েল স্টেট গ্রুপ থাকলেও ভারতের সাহারাগ্রুপের উপশহর বানানোর প্রস্তাব।

৯. ভারতের নিম্নমানের রেল ইঞ্জিন কেনা হচ্ছে উচ্চমূল্য দিয়ে।

১০. বাংলাদেশের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভারত থেকে বাস-ট্রাক কেনা হচ্ছে।

১১. বাংলাদেশে চাল পাচার করে ভারত থেকে চাল আমদানি করা হচ্ছে।

১২. অনুন্নত হওয়া সত্ত্বেও ভারত থেকে কেনা হচ্ছে ডেমু ট্রেন।

১৩. অনুন্নত হওয়া সত্ত্বেও ভারত থেকে কেনা হচ্ছে তেল ট্যাঙ্কার।

১৪. অনুন্নত হওয়া সত্ত্বেও ভারত থেকে কেনা হচ্ছে ড্রেজার।

১৫. বাংলাদেশে কোম্পানিগুলোকে ইচ্ছাকৃত অনুন্নত রেখে ভারতের অতিনিম্নমানের ওএনজিসি নামক কোম্পানিকে সাগরে গ্যাস উত্তোলন করতে দেওয়া হয়েছে।

১৬. বাংলাদেশ পারলেও আমাদের নৌ টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছে ভারত।

১৭. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পারলেও নিজেরা অস্ত্র না বানিয়ে গোপন সামরিক চুক্তি অনুযায়ী ভারতের কাছ থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছে নিম্নমানের অস্ত্র।

১৮. ভারত থেকে দ্বিগুণ দামে কেনা হচ্ছে প্রিপেইড মিটার।

এবার বাংলাদেশে 'র' কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, আপনি নিজেই চিন্তা করুন। অনলাইনে একটু কষ্ট করলেই তথ্যগুলো যাচাই করা যায়।

১৯. কৃষকরা ধানের দাম পায় না বলে ধান ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দিলেও কৃষিমন্ত্রী ভারত থেকে চাল আমদানির ঘোষণা দেয়।

২০. আগরতলা বিমানবন্দরের জন্য ভারত বাংলাদেশের ভেতরে জমি দাবি।

২১. লালমনিরহাটে মসজিদ নির্মাণে বিএসএফের বাধা।

৩১. বাংলাদেশ একদিন সিকিমের মতো হয়ে যাবে!

বাংলাদেশ একদিন সিকিমের মতো ভারতে বিলীন হবে বলে মন্তব্য করেন গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জাফরুল্লাহ চৌধুরী। জুলাই ২৩, ২০১৮ তারিখে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'নাগরিক ঐক্য' আয়োজিত 'কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিপীড়িত শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন।

জনাব জাফরুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশে সব ব্যবসা ভারতীয়রা পাচ্ছে চীনারা পাচ্ছে না। এমন চলতে থাকলে বাংলাদেশ সিকিমের মতো একদিন ভারতে বিলীন হয়ে যাবে। তার মতে, ভারত এই দেশ থেকে সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে। গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ভারতে গেলেন, তাদের আবার উপহার দিয়ে এসেছেন। ৮.২২ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ কিনে আনলেন। যেখানে এস আলমের বিদ্যুৎ ৬.৫০ টাকায়, আবার সেই বিদ্যুৎ বেচা হয় ৪.৫০ টাকা দরে। সেটাও আবার বিনা টেন্ডারে নেওয়া হবে।' 'ব্যবসা সব ভারত পাবে, চীন কিছুই পাবে না। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের অবস্থা সিকিমের মতো হবে।'

জাফরুল্লাহ বলেন, 'ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ১২ বিলিয়নের ১০ বিলিয়নেই আমাদের বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায়। ভারতীয়রা পাঁচ লাখ কাজ করে আমাদের দেশে, আর আমাদের ৮০ লাখ বাঙালি বাইরে কাজ করে ১৪ বিলিয়ন পাঠায়।'

৩২. কোটা সংস্কার আন্দোলন বানচালে 'র'-এর ষড়যন্ত্র!

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে প্রায় ৫৬% কোটা রয়েছে। অর্থাৎ সরকারি ১০০টি চাকরির ৫৬টি পাবে বিভিন্ন কোটাধারী লোকেরা বাকি ৪৪টি পাবে সাধারণ মেধাবী ছাত্ররা। বিভিন্ন ধরনের কোটার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান-সন্ততি ও নাতি-পুতিদের জন্য ৩০%, নারীদেরজন্য ১০% উপজাতিদের জন্য ৫% প্রতিবন্ধিদের জন্য ৩%সহ আরো রয়েছে জেলা কোটা, পোষ্য কোটা ইত্যাদি। এই কোটা পদ্ধতিকে বৈষম্যমূলক বলে

মন্তব্য করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলী খান, ড. মীর্জা আজিজুল ইসলাম, জিল্লুর রহমান, শিক্ষাবিদ ড. সলিমুল্লাহ খান এবং আসিফ নজরুলসহ অনেক বুদ্ধিজীবী। এই কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।

ছাত্ররা ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরাও ছাত্রদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিটি জেলা শহরের সড়ক ও মহাসড়ক অবরোধ করে। সব মিলিয়ে সারা দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হলে সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ে এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের বৈঠক হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে কোটা পদ্ধতি বাতিলের ঘোষণা দেন। রমজানের ঠিক আগের মাসে।

রোজা শেষে ঈদ পেরিয়ে প্রায় এক মাস অতিক্রান্ত হলেও কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করে না সরকার। এরই মধ্যে ছাত্রদের আন্দোলন চলাকালে এক রাতে ঢাবি ভিসির বাসায় হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট হয়। ভিসি এবং তার পরিবার থেকে হামলাকারীদের অজ্ঞাত এবং অছাত্র বলে মন্তব্য করা হয়। কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের আসামি করে মামলা করা হয় এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের হয়রানি করা হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত আন্দালনে প্রথম সারির নেতা রাশেদকে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনও চলে। নুরুল হক নূরকে ছাত্রলীগের কর্মীরা মেরে আহত করে এমনকি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে বাধা দেওয়া হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কোমর ভেঙে দেওয়া হয়।

এ নিয়ে বুদ্ধিজীবীগণ নানা মন্তব্য করলেও এর সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর যোগসাজোশ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনে হামলার প্রসঙ্গে বলেন, "যে স্টাইলে হামলা করা হয়েছে তা ভারতীয় 'র' করে থাকে।

ওই হামলার সময় সেখানে চার জন পুলিশ ছিল কিন্তু হামলাকারীদের ধরা হয়নি। কারা করে এই হামলা? 'র' করে, ভারতে এভাবে হামলা করা হয়, সিআইএ যেভাবে হামলা করে সেই স্টাইলে হামলা করা হয়েছে ভিসির বাড়িতে"। সংবিধানে কেবল পশ্চাদপদ নৃগোষ্ঠীর জন্য কোটার কথা বলা আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "কোটা পদ্ধতিতে মেধাশূন্য করে দিতে চক্রান্ত আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে।"

৩৩. নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় 'র'-এর কালো হাত

নেপালেও ভারতের থাবা

নেপালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড. খগেন্দ্র থাপা তাঁর "India has been supporting the Nepalese Terrorists"থ শীর্ষক তথ্যবহুল লেখায় উল্লেখ করেছেন : "UK and the USA must note that India has been supporting Nepalese terrorists until two years ago. May be India is still supporting the insurgents even today. The Napalese insurgents get all their weapons from India. The majority of the insurgents leaders are living comfortably in India with the full knowledge of Indian authorities." (http : /www.bangladesh-web.com/view. php/? hid. 0000]

ড. খগেন্দ্র থাপা Ferris State University-র একজন স্বনামধন্য ও পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং ১৪ বছর ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সিনেটে নির্বাচিত শিক্ষাবিদ হিসেবে কর্মরত। ভারত নেপালের ইনসার্জেন্টদের অস্ত্র, আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দেয়– এমন অভিযোগকে কোনোভাবেই তাই কোনো অপপ্রচার বা মামুলি অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

নেপালের মাওবাদী গেরিলা নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড নেপালি রাজা হত্যার পেছনে ভারত তথা তার গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর হাত রয়েছে বলে সম্প্রতি এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। এদিকে নেপালের নাগরিক টেইলিকে উদ্ধৃত করে, 'আমার দেশ' ৪ এপ্রিল, ২০১০ নেপালের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী চক্র প্রসাদ বাস্তোলার উদ্ধৃতিতে এক খবরে

উল্লেখ করেছে, নেপালের নৃশংসতম প্রাসাদ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জড়িত।

শ্রীলঙ্কায়ও ভারতের কালো হাত

গত ৯-০৩-১০ তারিখ 'দৈনিক প্রথম আলো' আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এএফপিকে উদ্ধৃত করে শ্রীলঙ্কান ডাকমন্ত্রী নান্দানা গুনা থিলেকের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, গত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাহিন্দা রাজাপাকসেকে পরাজিত করার চেষ্টা করেছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। 'ডেইলি মিরর' পত্রিকাকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন। ওই মন্ত্রী আরও বলেছেন, 'র'-এর কার্যক্রম কীভাবে চলে এবং কোন্ নীতিতে পরিচালিত হয়-- মাঝে মাঝে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভারতের সরকার দৃশ্যত রাজাপাকসের পক্ষে থাকলেও 'র'-এর কর্মকর্তারা তার বিপক্ষেই কাজ করেছেন।' উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার বিচ্ছিন্নতাবাদী তামিল টাইগাররা যে ভারতের মদদ, প্রশ্রয় ও সামরিক সহায়তায় তামিলদের জন্য জাফনায় একটা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করতে দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়ংকর যুদ্ধের সূচনা করেছিল; তাও সবার জানা। এক পর্যায়ে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধ্বনে নয়াদিল্লীর সাথে হাত মিলিয়ে চুক্তিবদ্ধ হন এবং ভারত চুক্তি অনুযায়ী তামিল টাইগারদের দমনে যৌথ সামরিক অভিযান চালায়। তবে ভারত সেখানে মার খেয়ে ফিরে আসে। তামিলরা ভারতের এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে হত্যা করে তার বদলা নেয়। চুক্তির পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজীব গান্ধী শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে ওই দেশের সেনাবাহিনী পরিদর্শনে গেলে শ্রীলঙ্কান এক সৈনিক রাজীব গান্ধীকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত হানার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় ভারতের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রীলঙ্কানদের ক্ষোভ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তবে তামিলদের সাথেও ভারত বিশ্বাসভঙ্গ করায় তারাও দিল্লীর প্রতি ক্রুদ্ধ।

৩৪. পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে 'র'

পাকিস্তানের রাজনীতিক ও কূটনীতিকরা ভারতের কাছে এমন নিশ্চয়তা চায় যে, আফগানিস্তানকেন্দ্রিক ভারতের অতিমাত্রায় তৎপরতা পাকিস্তানকে

অস্থিতিশীল করার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখবে না এবং পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকায় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার স্পন্সরড কোনো কাভার্ড তালেবানি হামলায় তারা মদদ দেবে না। কিন্তু ভারত এ ব্যাপারে পাকিস্তানকে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। ফলে পাকিস্তানের মনে ভারতের গোপন নাশকতা নিয়ে সন্দেহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাবেক পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত খালেদা সাঈদ সম্প্রতি "India's Warrior Diplomacy" শীর্ষক এক লেখায় পাকিস্তানকে ভারতের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে জঙ্গিবাদের মদদদাতা হিসেবে ভালোভাবেই চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ৯/১১-এর পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তথা আফগান যুদ্ধের ক্ষেত্রে পাকিস্তান আমেরিকার বিশেষ কৌশলগত পার্টনার হিসেবে যে ধরনের সুবিধাজনক অবস্থান দখল করে দিল্লী-ওয়াশিংটনের সম্পর্কের চেয়েও বিশেষ মাত্রায় পাক-মার্কিন সম্পর্ককে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস, আত্মঘাতী বোমা-সন্ত্রাস তা ধ্বংস করে দিয়েছে। যার অধিকাংশই ইন্দো-ইসরাঈল-মার্কিনীদের চাপিয়ে দেওয়া। সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের প্রধান অংশীদার হয়েও পাকিস্তান আমেরিকার কাছে অনির্ভরশীল ও অবিশ্বাসী 'মিত্র' এবং আমেরিকান নীতি-নির্ধারকরা এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, পাকিস্তান যে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের পার্টনার হিসেবে তারা পাকিস্তানকে 'ভুল দেশ' হিসেবে নির্বাচন করেছে। এই অজুহাতে আমেরিকা তালেবান দমনের নামে পাকিস্তানের অভ্যন্তরভাগে অব্যাহত 'ড্রোন' বিমান হামলা চালিয়ে শতশত মানুষ হত্যা করে চলেছে। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের দোহাই পর্যন্ত নাকচ করে আমেরিকা পাকিস্তানের ভেতরে ড্রোন বিমান হামলা চালাচ্ছে। এ ছাড়া ৩ হাজার সিআইএ পরিচালিত ব্লাকওয়াটার জঙ্গি পাকিস্তানে গোপনে গোপনে কাজ করছে। এর দ্বারা তারা এটাই প্রমাণ করছে যে, পাকিস্তান জঙ্গি দমনে আন্তরিক নয়। অথবা জঙ্গি দমনে তার সামর্থ্য নেই। প্রতিবেশী দুটি দেশও একই সুরে পাকিস্তানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই তার দেশের তালেবানদের হামলার জন্য বারবার সরাসরি পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেছেন। ভারত তো

আমেরিকাসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছে যে, এ অঞ্চলে জঙ্গিবাদ আর পাকিস্তানের নাম সমার্থক। মুম্বাই কাণ্ডের কথিত নায়ক আজমল কাসাবকে নিয়ে ভারত অনেক প্রচারণা চালিয়েছে, পাকিস্তানকে সন্দেহের আবর্তে জড়াতে জন হ্যাডলির স্ত্রীর বয়ানও ব্যবহার করা হচ্ছে। আজমল কাসাব-এর ভিন্ন বক্তব্য মুম্বাই ঘটনায় আটক ও ভারতে বিচারাধীন পাকিস্তানি নাগরিক আজমল কাসাবের আইনজীবী সি-এম-ফারুক পাকিস্তানভিত্তিক টিভি চ্যানেল 'জিও' নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ২০০৬ সালের আগে নেপালি নিরাপত্তা বাহিনীর সাহায্যে কাঠমন্ডু থেকে মুম্বাই হামলায় আটক আজমল কাসাবকে অপহরণ করেছিল। ফারুক বলেন, ২০০৬ সালের আগে নেপালি নিরাপত্তা বাহিনী ২০০ ব্যক্তিকে আটক করে, যাদের মধ্যে আজমল কাসাবও ছিলেন। নেপালি সুপ্রীমকোর্টে তার মামলা এখনও ফাইলবন্দি হয়ে আছে। সেখানে ভারতীয় সংস্থা ও নেপালি নিরাপত্তা বাহিনীকে বিবাদী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সময় আজমল বৈধ ভিসার ব্যবসা উপলক্ষ্যে নেপালে সফররত ছিলেন। আইনজীবী ফারুক বলেন, এ ব্যাপারে তিনি ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে চিঠি লিখেছিলেন বলে জানান। নেপালে এক সংবাদ সম্মেলনে আইনজীবী ফারুক আজমলের গ্রেফতারের বিষয়টি তুলে ধরেন।[১] উক্ত আইনজীবী দাবি করেন, গ্রেফতারের পর আজমলকে অন্যদের সাথে একটি অজ্ঞাত স্থানে রাখা হয়। যাতে ভারত এদের নিয়ে দুরভিসন্ধিমূলক কাজে স্কেপগোট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

৩৫. রবীন্দ্র কৌশিক: সর্বকালের সেরা 'র' এজেন্ট

রাজ্যস্থানের একদম শেষ মাথায় ছোট একটা শহর। নাম শ্রী গঙ্গানগর। শহরটা শেষ হলেই পাকিস্তান বর্ডার। মাঝে মরুভূমি। এই শহরেই ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস 'র' মানে রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইংয়ের সবচেয়ে প্রোফাইলিক এজেন্ট জন্ম নেয় ১৯৫২ সালে। তার নাম রবীন্দ্র কৌশিক। একদম সাদামাটা পরিবারে জন্ম নেওয়া এই ছেলের ইন্টেলিজেন্স লেভেল ছিল বাকি সবার থেকে অনেক ওপরে আর অভিনয় দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। ফলে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে কলেজে থাকা অবস্থাতেই।

---

১. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৬.১২.০৮/ দ্য নিউজ রাওয়ালপিণ্ডি

CamScanner

প্রতি বছর ন্যাশনাল লেভেল ড্রামা মিট হয়। সেখানে প্রতিটা প্রদেশ থেকে সেরা দল আসে প্রতিনিধিত্ব করতে। সেবার এই মিট ছিল লখনৌতে। রবীন্দ্র আসে রাজস্থানের প্রতিনিধি হয়ে। তাঁর থিয়েটার পারফরমান্সে সবাই মুগ্ধ। অনেকেই বলে যে দিল্লী বা মুম্বাইয়ে গিয়ে অভিনয়ে যোগ দিতে। এই দর্শক সারিতে ছিল 'র'-এর তিন জন হাই অফিশিয়াল। তাদের নজরে পড়ে যায় রবীন্দ্র। তাঁকে অফার করা হয় দেশের জন্য কাজ করার জন্য। সে রাজিও হয়ে যায়!

'র'-এর প্ল্যান ছিল কৌশিকের মতো ন্যাচারাল ট্যালেন্টকে তারা জেমস বন্ডের মতো ফিল্ড এজেন্ট না বানিয়ে 'আন্ডার কাভার এজেন্ট' বানাবে যারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিচয়ে থেকে, ভারতকে ইনফরমেশন দেয়। ঠিক করা হয় কৌশিককে ভারতের ১ নম্বর শত্রু পাকিস্তানে পাঠানো হবে। সেরাদের সেরারাই শুধু এজন্য সিলেক্টেড হয়। কিন্তু কৌশিক তো সনাতন ধর্মবলম্বী। কি করা যায়? যে সময় কৌশিককে 'র' অফার দেয় তখন তার বয়স মাত্র ১৯। সে পরিবার ছেড়ে দিল্লীতে চলে আসে। 'র' তাকে পুরো ২ বছর এসপিওনাজ ট্রেনিং দেয়। কীভাবে ইন্টেলিজেন্স কালেক্ট করা লাগে, কীভাবে ফলো করতে হয়, কীভাবে লোকজনের ভীরে কাভার নিতে হয়, কীভাবে স্যাবোটাজ করতে হয় ইত্যাদি।

এমনকি সুন্নতে খৎনাও করানো হয় মুসলিম বানানোর জন্য। পাকিস্তানি সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এসব শিখানো হয়। চোস্ত উর্দু শিখানো হয়। আর কৌশিক পারতো পাঞ্জাবি, কারণ তার জন্মস্থানের অনেক লোক এটা বলতো, ফলে এটা কাজে লেগে যায়। পাকিস্তানের অনেক জায়গায় পাঞ্জাবিতে কথা বলে পাকিস্তনিরা।

ট্রেনিং শেষে কৌশিকের নাম দেওয়া হয়- নাবি আহমেদ শাকির। মাত্র ২৩ বছর বয়সে তাকে পাকিস্তানে পাঠায় ভারত। তার ওপর নির্দেশ ছিল পাকিস্তানের একটা শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে, কারণ সেখান থেকে যাতে সে পরে পাকিস্তানের ডিফেন্স এস্টাব্লিশমেন্টে ঢুকতে পারে। কৌশিক ভর্তির সুযোগ পেয়ে যায় করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখান থেকে সে এলএলবি পাশ করে সোজা পাকিস্তানে আর্মিতে যোগ দেয়। নিজের গুণে সে দ্রুত প্রমোশন পেয়ে মেজর হয়ে যায়। এরপর আসে তার আসল কাজ।

মেজর হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তান আর্মির অনেক টপ সিক্রেট ইনফরমেশন যেমন ট্রুপ মুভমেন্ট, মিসাইল টেস্ট, বর্ডার মিশন এসব ইনফরমেশন সে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না করেই অ্যাক্সেস পেয়ে যায় এবং এসব সুযোগ বুঝে কোডেড মেসেজ আকারে 'র'-কে পাঠাতে থাকে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এই কাজ এত সাফল্যের সাথে করে যে, 'র' প্রধান যখন তার সাফল্য সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধিকে জানায়, তিনি বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে কৌশিকের নাম দেন 'ব্ল্যাক টাইগার'।

ঠিক একই সময়ে পাকিস্তানি সিক্রেট সার্ভিসে আইএসআই-এর সন্দেহ জাগে যে ভারতের কোনো স্পাই তাদের আর্মিতে আছে, না-হলে গোপন তথ্য ভারত আগেভাগে জানে কীভাবে! তারাও এই 'কালপ্রিট' খুঁজে বের করতে উঠেপড়ে লাগে।

সব ঠিকমতোই চলছিল। কৌশিক এক পাকিস্তানি মেয়েকে বিয়ে করেন, নাম ছিল আমানত। একটা মেয়েও হয়েছিল তাঁদের। ১৯৮৩ সালে 'র' ইনায়াত মাসিহা নামের আরেক এজেন্টকে পাকিস্তানে পাঠায়। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আরেকটা মিশনে যেটা সে কৌশিকের সাহায্যে এক্সিকিউট করত।

কিন্তু কৌশিকের সাথে দেখা হওয়ার আগেই আইএসআই ২৯ বছর বয়সী ওই মেয়ে এজেন্টকে ধরে ফেলে করাচিতে। সেপ্টেম্বরে আইএসআই-এর টর্চার সেলে মাসিহা কৌশিকের আসল পরিচয় বলতে বাধ্য হয়। আইএসআই টের পেয়ে যায় যে নাবি আহমেদ নামের এই পাকিস্তানি মেজর আসলে ভারতের স্পাই!

এরপর আইএসআই তাঁকে ধরে ফেলে। ভিন্ন জনশ্রুতি আছে যে, মাসিহার সাথে করাচির একটা পার্কে দেখা করতে গিয়েছিলেন কৌশিক। সেখানেই তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তবে অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে, আইএসআই তাকে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে টর্চার করে, যাতে তার মুখ থেকে ভারতীয় স্পাইদের পরিচয় বের করতে পারে যারা পাকিস্তানে আছে বিভিন্ন পরিচয়ে কিন্তু কৌশিকের মুখ ওরা খুলতে পারেনি! পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কৌশিকের স্ত্রী-কন্যাকেও মেরে ফেলে।

প্রথম দুবছর তাকে শিয়ালকোটের ইন্টেরোগেশন কেন্দ্রে রেখে টর্চার করা হয়। ১৯৮৫ সালে আমরণ কারাবাস দেওয়া হয় কৌশিককে। 'ব্ল্যাক টাইগার'-এর জীবনের শেষ ১৬টা বছর জেলেই কাটে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুলতান জেলে ২০০১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জেলের পেছনেই তাঁর কবর। মারা যাওয়ার দিন তিনেক আগে বাড়িতে একটা চিঠি লিখেছিলেন, 'আমি যদি আমেরিকান হতাম, তাহলে তিন দিনের মধ্যে জেল থেকে বের হয়ে যেতাম।'

এই রবীন্দ্র কৌশিকের জীবনের ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয়েছিল সালমান খান অভিনিত সিনেমা 'এক থা টাইগার'। বাস্তবের টাইগার প্রেম করে পালায়নি। তিনি ধরা পড়ামাত্রই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় 'র' তার সকল রেকর্ড ধ্বংস করে ফেলে। এটাই সিক্রেট সার্ভিসের নিয়ম।

তবে আজও ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে শ্রদ্ধার সাথে কৌশিককে স্মরণ করা হয়। এক শীর্ষ স্থানীয় সাবেক 'র' অফিসারের মতে, 'র-এর হাতে গড়া সবচেয়ে প্রতিভাবান স্পাইদের একজন হলো এই কৌশিক।'[১]

৩৬. 'র'-এর কিছু আলোচিত অপারেশন

হিমালয়ে ELINT অপারেশন যা ১৯৬৪ সালে চীনের পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পর সি আই এ ও 'র' ১৯৬৮ সালে যৌথভাবে চীনের মিসাইল স্টেশন ও ওই বিস্ফোরণের স্থান নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিখ্যাত ভারতীয় পর্বতারোহী নন্দা দেবীর সহায়তায় পরিচালনা করে।

১৯৭১ এ বাংলাদেশ অপারেশন: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৭০ এ কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদিদের ব্যবহার করে ভারতের বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে ভারত তার আকাশসীমার ওপর দিয়ে পাকিস্তানে দুই পাশের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দিতে পারে।

---

১. দ্য টেলিগ্রাফ, ইকোনমিক টাইমস ও হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে

CamScanner

অপারেশন স্মাইলিং: 'র'-এর দেওয়া ১৯৭৪ সালে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র প্রোগ্রাম এর কোড নেম। ১৯৭৪ এর ১৮ মে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও পরীক্ষার আগে পর্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা।

সিকিম দখল: ১৯৭৫ এ 'র'-এর সহোযোগীতায় ভারতীয় বাহিনী সিকিম একীভূত করে। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

কাহুটা ব্লু প্রিন্ট ফাঁস: ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে কাহুটা এলাকায় খান রিসার্চ ল্যাবটারিতে পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচির খবর উদ্ধার করে 'র'। ল্যাবটারির কাছে তাদের পরিচালিত একটি নাপিতের দোকান থেকে সংগ্রহ করা চুলের স্যাম্পল এ রেডিয়েশন পরীক্ষা করে। এরপর তারা ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন পরিচালনা করে প্রকল্প ধ্বংস করতে চাইলে ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মোরাজি দেশাই তাদের নিবৃত্ত করেন এবং পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে ফোন করে 'র'-এর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেন।

অপারেশন মেঘদূত: ১৯৮২-তে ভারতের সেনা বাহিনীর যে ধরনের স্নো ওয়ার্ফেয়ারের গীয়ার ব্যবহার করে একই ধরনের আর্টিক ওয়ার্ফেয়ারের গীয়ার পাকিস্তান লন্ডনের একটি কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করছে জানতে পারে 'র'। যার ফলে ভারতীয় সেনা বাহিনী পাকিস্তানিদের পূর্বেই সিয়াচেল হিমবাহের সিংভাগ দখল করে নেয়।

ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন: মধ্য আশির দশক জুড়ে পাকিস্তানের অবস্থিত খালিস্তানি (শিখ) বিদ্রোহীদের ঘাটিতে ক্ল্যান্ডেস্টাইন অপারেশন পরিচালনা করে।

অপারেশন ক্যাকটাস: ২০০ তামিল গেরিলার হাতে দখল হয়ে যাওয়া মালদ্বীপকে সহায়তায় 'র' ও ভারতীয় বিমান বাহিনী একসাথে অভিযান পরিচালনা করে। ৩ রা নভেম্বর ১৯৮৮ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের সহায়তায় মালদ্বীপ ক্ষমতা পুর্ন্দখল করে।

শ্রীলঙ্কায় তামিল ট্রেনিং: আশির দশক ধরে 'র' শ্রীলঙ্কায় তামিলদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ট্রেনিং পরিচালনাসহ পরবর্তী সময়ে ভারতীয় বাহিনীর অভিযানে সহায়তা করে।

অপারেশন চাণক্য: পুরো ৯০ এর দশক ধরে কাশ্মীর উপত্যাকায় আইএসআই ও তাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের ধরতে এ অভিযান চালানো হয়।

অ্যান্টি অ্যাপারটিড মুভমেন্ট: RAW অনেক স্বাধীন আফ্রিকান দেশের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়া বিরোধী জাতিবিদ্বেষ সংগ্রাম করতে সাহায্য করে। RAW অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিছু আফ্রিকান দেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কাজ সহায়তা করে।

অপারেশন লিচ: মায়নমারকে দমন করার জন্য কোচিন বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে, পরে নিজেরাই KIA (Kochin Independence Army) র ৬ জন শীর্ষ নেতাদের হত্যা করে আসলেই গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডে কোনো শত্রুমিত্র নেই।

নর্দান এলায়েন্স: এ ছাড়া আফগান গৃহযুদ্ধে ৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে নর্দান অ্যালায়েন্স কে 'র' সহায়তা করে। মার্কিন যুক্তরাস্ট্র পরিচালিত ওয়ার অন টেরর এ সক্রিয়ভাবে সি আই এ মোসাদসহ অন্যান্য পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার সাথে অংশগ্রহণ।

অপারেশন মেহেরান: ২০১১ সালে পাকিস্তানের মেহেরান নৌ ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে তিনটি অত্যাধুনিক আর্লি ওয়ার্নিং রাডারযুক্ত পাকিস্তানের একমাত্র আর্লি ওয়ার্নিং বিমান স্কোয়াড্রন ধ্বংস করা।
পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদান। পাকিস্তানের করাচী ভিত্তিক রাজৈতিক হত্যাকাণ্ড পরিচালনা। নেপালের রাজা বিরেন্দ্র বীর বিক্রমকে নির্বংশ করা। ৯০-এর দশকে নেওয়া এক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে গত দেড় দশক ধরে ৫,০০০ ভারতীয় তরুণীদের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রী হিসাবে তৈরি করে প্রেরণ করা হয়েছে।

CamScanner

৩৭. 'র' কর্মকর্তাদের কুকর্ম

১. ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ "আউটলুক ম্যাগাজিন" সাবেক চীফ অশোক চর্তুবেদীকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ভারত সরকারের তহবিল ব্যবহার করে জনাব অশোক তার স্ত্রীকে নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশে ঘোরাঘুরি করেন। অবসর গ্রহণ করার পরে তিনি একাজ করেন। কিন্তু সেসময় তার পাসপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। অশোক চর্তুবেদীর কূটনৈতিক পাসপোর্ট সারেন্ডার তো করেইনি, উপরন্ত তার স্ত্রীর জন্য আরেকটি পাসপোর্ট ইস্যু করিয়ে নেন।

২. অবসর গ্রহণ করার পর মেজর জেনারেল ভি কে সিং 'র'-এর অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি নিয়ে একটি বই লেখেন। এরপরই "অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট" র আওতায় গ্রেফতার হন।

৩. ১৯শে আগস্ট ২০০৯ 'র'-এর গুরগাও প্রশিক্ষণ একাডেমির ভাষা পরিচালক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সামনে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানা যায় না।

৪. একজন সিনিয়র প্রযুক্তিগত অফিসার সিবিআই দ্বারা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, ডিরেক্টর স্তরের এই কর্মী, যে "সংবেদনশীল" প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত সরঞ্জাম এর এক্সপোর্ট লাইসেন্স মঞ্জুর কাজ করত। তার বিরুদ্বে অভিযোগ ১ লক্ষ রুপি ঘুষ গ্রহণের।

৫. সেপ্টেম্বর ২০০৯, ৭ জন RAS ক্যাডার এ.বি. মথুরকে special secretary (IPS cader) বিধিবর্হিভূত পদোন্নতি প্রদান করায় পদত্যাগ করে।

৩৮. 'র'-এর পরিচালকেরা

'র'-এর প্রায় সব পরিচালকই ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস থেকে এসেছে। একমাত্র অশোক চর্তুরবেদী ছাড়া সমস্ত পরিচালকেরা চীন, পাকিস্তান expert ছিলেন। অশোক চর্তুরবেদী ছিলেন নেপাল বিষেশজ্ঞ।

CamScanner

১. আর.এন.কাও এবং শঙ্কর নায়ার ইম্পেরিয়াল পুলিশ (IP) থেকে এসেছেন যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকের পুলিশ সার্ভিস ছিল ১৯৪৭ পর্যন্ত।

২. এন.এফ. সাত্তক ভারতীয় নেভিতে পরে ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস এবং Indian Frontier Adminastration Force এ ছিলেন।

৩. বিক্রমসুদ Indian Postal Service এ ছিল এবং পরে স্থায়ীভাবে RAS ক্যাডারে যান। এখন সে পর্যবেক্ষক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে।

৪. এ.এস. দুলাত একজন ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস অফিসার, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো থেকে আসেন।

৫. সি ডি সহায় ১ এপ্রিল ২০০৩ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত 'র'-এর প্রধান ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে যোগ দেওয়া কর্নাটাক পুলিশ ব্যাচের কর্মকর্তা। ১৯৭০ সাল থেকে সহায় 'র'-এ কাজ করে আসছেন। ৯০-এর দশকে জম্মু ও কাশ্মীরে 'র' প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান ও অন্যান্য ইসলামি দেশগুলোর সাথে লিয়াজোঁ রক্ষার দায়িত্বও তার ছিল। তিনিই একমাত্র ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা, যার ইসরাঈলের গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা প্রশিক্ষণও তার ছিল।

৬. পি কে হরমিস থারাকান 'র'-এর দায়িত্ব নেন ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি আর অবসর নেন ২০০৭ সালের ৩১ জানুয়ারি। তিনি এর আগে কেরালা পুলিশের মহাপরিচালক ছিলেন।

৭. অশোক চতুর্বেদী জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৭ সালে। ১৯৬৮ সালে কেরালা রাজ্যের পুলিশ ক্যাডারের মাধ্যমে চাকরি শুরু করেন। ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত 'র'-এর প্রধান ছিলেন। চতুর্বেদী ছিলেন বাংলাদেশ ও নেপাল বিশেষজ্ঞ। লন্ডন ও কানাডাতে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি ভারতশাসিত জম্মু কাশ্মীরেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

৮. কে.সি. ভার্মা একজন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো অফিসার ছিলেন। ১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত 'র'-এর প্রধান ছিলেন।

CamScanner

৯. সঞ্জীব ত্রিপাঠী ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ হতে ২৯ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত 'র'-এর প্রধান ছিলেন। মেয়াদ শেষে তিনি ভারতের হিন্দু উগ্রবাদী দল বিজেপিতে যোগ দেন। 'র'তে তার অবদান হলো তিনি শিখদের সাথে সম্পর্কন্নোয়নে ভূমিকা রাখেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর দেখভাল করেন। RAS থেকে আসা এই নেতা ও আমলার জন্মস্থান ভারতের উত্তরপ্রদেশে।

১০. অলোক জোশি 'র' প্রধানের দায়িত্বকাল ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত। ক্যারিয়ারের শুরুতে জওহরলাল ইউনিভার্সিটি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে যোগ দেন ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে। হারিয়ানা ক্যাডার হন ১৯৭৬ সালে। ২০০৫ সালে গোয়েন্দা শাখার জয়েন্ট ডিরেক্টর, ২০১০ সালে রয়ের স্পেশাল সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন। অমিতাভ মাথুর তার সমমর্যাদার হলেও তাকেই প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে 'র' প্রধান নিয়োগ করা হয় সিনিয়র বলে। অবসর নেবার পর তাকে National Technical Research Organisation এর সিনিয়র এডভাইজার এবং বর্তমানে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

১১. ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং ('র')-এর প্রধান হিসেবে রাজিন্দ্র খান্নাকে নিয়োগ দেওয়া হয় ১ জানুয়ারী ২০১৫। রাজিন্দ্র খান্নাকে চুক্তি ভিত্তিক দুবছরের জন্য 'র'-এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। উড়িষ্যা ক্যাডারের ১৯৭৮ সালের ব্যাচের আইপিএস রাজিন্দ্র খান্না কাউন্টার টেরর বিশেষজ্ঞ হিসেব পরিচিত। দীর্ঘ চাকরি জীবনে 'র'-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ছিল তার মেয়াদকাল।

১২. অনিল কুমার ধসমানা বর্তমান 'র' প্রধান। ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে তার নিয়োগ হয়। ২ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে উত্তরখণ্ডের পাউরে তার জন্ম। এর প্রধান হয়েছেন অনিল কুমার ধসমানা। জানা গিয়েছে, তার বালোচিস্তান নিয়ে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে। আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

CamScanner

১৯৮১ সালের ব্যাচের আধিকারিক ধসমানা মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস অফিসার। তিনি বালোচিস্তান বিশেষজ্ঞ এ ছাড়া কাউন্টার টেররিজম ও ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়েও তিনি দক্ষ। তাঁর নিয়োগের পর বালোচিস্তান ইস্যুতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধবে কেন্দ্র, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। 'র'-এর প্রধান রাজিন্দর খান্নার জায়গায় আসছেন ধসমানা। তিনি পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ইস্যুতেও বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতের হয়ে সার্ক, ইউরোপের গোষ্ঠীর পাশাপাশি লন্ডন ও ফ্র্যাঙ্কফুর্টের কাজ করার পাশাপাশি নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। 'র'-এর এক আধিকারিক ওয়ান ইন্ডিয়াকে জানিয়েছে, ধসমানার নিয়োগ সঠিক সময়েই হচ্ছে। বালোচিস্তান ও আফগানিস্তান ইস্যুতে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্তমান সময়ে কেন্দ্রের বিশেষ কাজে লাগবে। কারণ, বর্তমান সময়ে দুটি ইস্যুই ভারতের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

ক. আরো কিছু বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা

১. সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সিআইএ

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং অন্যতম তুখোর গোয়েন্দা সংস্থা যা সিআইএ (CIA) নামে বেশি পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন একটি বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা। এটি একটি স্বাধীন সংস্থা, যার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং উচ্চপদস্থ নীতি-নির্ধারকদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে গঠিত অফিস অফ স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসেস (OSS)-এর উত্তরসূরি হিসেবে সিআইএর জন্ম। এর কাজ ছিল যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা। ১৯৪৭ সালে অনুমোদিত হওয়া ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা জাতীয় নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে সিআইএ গঠন করা হয়।

সিআইএর প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বিদেশি সরকার, সংস্থা ও ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা জাতীয় নীতি-নির্ধারকদের কাছে তা সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান করা। সিআইএ এবং এর দায়বদ্ধতা ২০০৪ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

২০০৪ সালের ডিসেম্বরের পূর্বে সিআইএ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা। এটি শুধু নিজের কর্মকাণ্ডই নয়, বরং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডও দেখাশোনা করত। কিন্তু ২০০৪ সালে অনুমোদিত ইন্টেলিজেন্স রিফর্ম অ্যান্ড টেররিজম প্রিভেনশন অ্যাক্ট, ২০০৪ দ্বারা তা

CamScanner

পরিবর্তিত হয়। সিআইএ প্রেসিডেন্টের অনুরোধে গোপন কার্যক্রমেও অংশ নেয়। এর পাশাপাশি আধাসামরিক অপারেশন এবং অন্য দেশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অপারেশন পরিচালিত হয়ে থাকে বিশেষ কার্যক্রম বিভাগের মাধ্যমে।

সিআইএ পৃথিবীর সব ধরনের ডিভাইসে একসেস নিতে পারে। বিশেষ সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্যে অনলাইন-অফলাইনের সব ধরনের তথ্য তারা পেতে পারেন। সিআইএর মতো গোয়েন্দা সংস্থাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সন্ত্রাসীরা ডেটা এনক্রিপশন পদ্ধতির আশ্রয় নেয়।

এর সদর দফতর ভার্জিনিয়ার ল্যাংলের জর্জ বুশ সেন্টার ফর ইন্টেলিজেন্সে। বর্তমান পরিচালক মাইক পম্পেও। সংস্থাটির দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনার কারণে ৯/১১ এর বিমান হামলা প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়। আফগানিস্থানে ১০ লাখ সোভিয়েত সৈন্যের আগমন সম্পর্কে কোনো তথ্য তারা পায়নি এবং ইরাকে সাদ্দাম হোসেন সরকারের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র থাকার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। সিআইএর সব থেকে নেতিবাচক দিক হচ্ছে এদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী হিটম্যান (ভাড়াটে দক্ষ খুনী) নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা পলিটিক্যাল কিলিং করে থাকে।

১. এমআইসিক্স

জেমস বন্ড সিরিজের মুভিগুলো বেশ জনপ্রিয়। এজেন্ট ০০৭ যিনি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্ট এজেন্সি এমআইসিক্সের (MI6) দুর্ধর্ষ স্পাই থাকেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকেন। জেমস বন্ড মুভির মতো হয়তো বাস্তবে স্পাইরা কাজ করেন না। কিন্তু বাস্তবে এমআইসিক্স কাজ করে।

এমআইসিক্স ব্রিটিশ মিলিটারির ইন্টেলিজেন্স এর একটি বিশেষায়িত শাখা। সংস্থাটির অফিসিয়াল নাম সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (এসআইএস)। ১৯০৯ সালের অক্টোবরে সিক্রেট সার্ভিস ব্যুরো নামে এটি গঠিত হয়। ওই সময়ে ব্যুরো নেভাল ও আর্মি সেকশন নামে দুটি

CamScanner

বিভাগে কাজ করত। নেভাল বিভাগের কাজ ছিল অন্য দেশে গোয়েন্দাগিরি। অন্যদিকে আর্মি বিভাগের কাজ ছিল অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস দমন। পরে নেভাল বিভাগের নাম দেওয়া হয় এমআই সিক্স আর আর্মি বিভাগের নাম দেওয়া হয় এমআই ফাইভ।

এসআইএসের সদর দপ্তর লন্ডনের এসআইএস বিল্ডিং। বর্তমান এসআইএস প্রধান এলেড ইয়ংগার। ১৯১১ সালে সিক্রেট সার্ভিস ব্যুরোর নাম পরিবর্তন করে সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস করা হয়। এমআই সিক্সের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশে হামলা ও হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততার। এ জন্য সংস্থাটি ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ, যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ'র সহযোগিতা নিয়েছে আবার কখনো সহযোগিতা করেছে। বিভিন্ন ইস্যুতে এ তিনটি সংস্থা একসাথেই কাজ করেছে বলে জানা যায়।

এশিয়া টাইমস পত্রিকায় সাংবাদিক রিচার্ড এম বানেটের এমআই সিক্সের হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত তালিকা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ২০০৩ সালের জুন মাসে প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে মোসাদের হিট স্কোয়াড কিডনের প্রধান রাফায়েল ইতান ইংল্যান্ডের হারফোর্ডে সফরের পর ব্রিটেনের নিরাপত্তা পলিসির বড় পরিবর্তন আসে। এই সফরের কিছু দিন পর লন্ডনে ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের দুই নেতাকে হত্যা করা হয়।

হত্যাকাণ্ডের সাথে এমআই সিক্স ও মোসাদের সম্পৃক্ততা ছিল। ১৯৮৮ সালে তিনজন আইরিশ রিপাবলিকান আর্মিকে জিব্রালটারে হত্যা করে ইউকে স্পেশাল ফোর্সেস। এর সাথেও মোসাদের সম্পৃক্ততা ছিল। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার মোসাদের কাছে তার দেশের নাগরিকদের জন্য হুমকি এমন লোকদের একটি তালিকা দিয়েছিল। মিসরের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরকে হত্যার পরিকল্পনায় সমর্থন দিয়েছিল এমআইসিক্স। নার্ভ গ্যাস প্রয়োগে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল এই সংস্থা। অবশ্য ১৯৭০ সালে তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।

১৯৬০ সালে হত্যার পরিকল্পনা করে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী জাতীয়তাবাদী নেতা প্যাটরিক লুমামবাকে। ১৯৬১ সালে তিনি নিহত হন। অফিসিয়ালি

তাকে হত্যার অনুমতি দেয় হাওয়ার্ড স্মিথ নামের এক কর্মকর্তা। পরে এই কর্মকর্তাকে এমআই ফাইভের প্রধান বানানো হয়। ১৯৭২ সালে জন ওয়াইম্যান আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক নেতাদের বোমা হামলা করে হত্যার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ওয়াইম্যান আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি নেতা লিটলজনসকে এ সংক্রান্ত একটি তালিকা দেয়। তালিকায় স্যামুয়েল কস্টেলো, সিন কারল্যান্ড ও সিন মাইকেল স্টাইফেনের নাম ছিল।

উল্লেখ্য যে বর্তমানে বিশ্বের সব থেকে চৌকষ ও দুর্ধর্ষ কমান্ডো বাহিনী হচ্ছে যুক্তরাজ্যের দি স্পেশাল এয়ার সার্ভিস (এসএএস)

২. এমএসএস

চীনের গোয়েন্দা সংস্থা গওজিয়া অ্যাংকেন বু অথবা মিনিস্ট্রি অব স্টেট সিকিউরিটি। এটি বিশ্বজুড়ে এমএসএস (MSS) নামে পরিচিত। চীনা এমএসএসের অনেক কিছুই সাধারণ মানুষের অজানা। আর এর কর্মী সংখ্যা পৃথিবীর সব গোয়েন্দা সংস্থার তুলনায় সবচেয়ে বেশি বলে ধারণা করা হয়। ২০০৫ সালের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই এমএসএস এর এক হাজার ইনফর্মার রয়েছে। এমএসএসের সদর দফতর চীনের রাজধানী বেইজিংএ অবস্থিত। এর জবাবদিহিতা স্টেট কাউন্সিল অব চায়নার কাছে। এমএসএসের সংস্থা প্রধান চেন ওয়েনকিং।

এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা, গুপ্তহত্যা, বর্ডার সার্ভেইল্যান্স, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, কাউন্টার টেররিজম, নিজস্ব লোক সংগ্রহ ও নেটওয়ার্ক তৈরি, বিদেশি কূটনীতিকদের ওপর নজরদারি, শত্রু এজেন্টদের সন্ধান, কাউন্টার রেভিউল্যুশনারি কার্যক্রম দমন, সাইবার ওয়ারফেয়ার পরিচালনা, নতুন প্রযুক্তি সংগ্রহ, বিশ্বের বড় করপোরেশনগুলোর নীতি-নির্ধারণের চেষ্টা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পিওনাজ।

এমএসএসের প্রধান বিচরণ এলাকা ম্যাকাও, হংকং, তাইওয়ান, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

ভারত, জাপান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা ও সারা দুনিয়ার চাইনিজ বংশোদ্ভূত জনগণ। এমএসএসের অনেক নামকরা এজেন্ট রয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন ল্যারি উ তাইচিন, ক্যাট্রিনা লেউং, পিটার লি, চি মাক, কো সুয়েন মো। ১৯৯৬ সালে এফ-১৫, বি-৫২সহ বহু সামরিক প্রযুক্তি পাচারের অভিযোগে ডং ফ্যাং চ্যু নামে বোয়িং কোম্পানির এক ইঞ্জিনিয়ার ধরা পড়েন।

ধারণা করা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউকে, কানাডা, ইউরোপ, ভারত, জাপানে আন-অফিশিয়াল কাভারে যেমন ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, ব্যাংকার, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ হিসেবে কমপক্ষে ১২০ জন করে এমএসএস কর্মী অবস্থান করছেন। পৃথিবীর অন্যসব গোয়েন্দা সংস্থাকেই এমএসএস তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।

৩. এফএসবি

রাশিয়া এফএসবির মূল নাম ফেডারেলনায়া সুলঝবা বেজপাসনোস্তি রাশিস্কয় ফেডেরাটসি। সংক্ষেপে এটি এফএসবি (FSB) নামে পরিচিত। এটি স্থাপিত হয় ১৯৯৫ সালের ৩ এপ্রিল। তবে এত অল্প বয়স দিয়ে এফএসবির কার্যকারিতার প্রভাব ও ভয়াবহতার কথা মোটেও অনুমান করা যাবে না। অনুমান করতে হবে এর পূর্বসূরি সংস্থার কথা মাথায় রেখে।

রাশিয়ার বর্তমান গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবির পূর্বসূরি ছিল দুনিয়া কাঁপানো গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি। আর কেজিবিরও আগে এর নাম ছিল চেকা। এফএসবির কর্মী সংখ্যা আনুমানিক লক্ষাধিক। এফএসবির সদর দফতর রাশিয়ার মস্কো শহরের ল্যুবিয়াঙ্কা স্কোয়ারে। এর জবাবদিহিতা করতে হয় প্রেসিডেন্ট রাশিয়ান ফেডারেশন।

এফএসবির সংস্থা প্রধান আলেকজান্ডার বর্টনিকভ। এফএসবির সাহায্যকারী সংস্থার নাম গ্রু। এফএসবির মোট ১০টি বিভাগ রয়েছে। এফএসবির মূল দায়িত্ব বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা, গুপ্তহত্যা, বর্ডার সার্ভেইল্যান্স, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, কাউন্টার টেররিজম, নিজস্ব লোক সংগ্রহ ও নেটওয়ার্ক তৈরি, বিদেশি কূটনীতিকদের ওপর নজরদারি।

CamScanner

এফএসবির নামকরা এজেন্টের নাম আন্না চ্যাপম্যান। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এফএসবির গোয়েন্দারা যারা নিয়মিত এফএসবিকে গোপন তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। এফএসবির সর্বমোট কর্মকর্তার সংখ্যা এবং এদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ এদের নিজস্ব কৌশল হিসেবে গোপন রাখা হয়।

৪. বিএনডি

জার্মানির বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার নাম জার্মান ভাষায় বুন্দেস ন্যাচরিচটেন ডিয়েনস্ট বা বিএনডি (BND)। ইংরেজিতে ফেডারেল ইনটেলিজেন্স সার্ভিস। জার্মান চ্যান্সেলরের অফিস থেকে সংস্থাটি সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং চ্যান্সেলরের কাছে জবাবদিহি করে। এটা ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি নতুন করে দেশের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে। এ সময় তাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা একেবারে ঢেলে সাজাতে হয়। তখন তারা অনুভব করে, নিরাপত্তার জন্য তাদের গোয়েন্দা তথ্যের অভাব রয়েছে। সেই প্রয়োজন থেকেই তারা একটি বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা নির্মাণ শুরু করে। ১৯৫৬ সালের ১ এপ্রিল বিএনডি প্রতিষ্ঠিত হয়। মেজর জেনারেল রেইনহার্ডরের নেতৃত্বে সংস্থাটি নির্মিত হয়েছিল। শুরুতে এটা যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

এই সংস্থাটি জার্মানিতে ও বিশ্বের যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকে। বিএনডি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস, মাদক সন্ত্রাস, প্রযুক্তির অবৈধ পাচার, অস্ত্র পাচার, সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ করে। বিএনডি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা হলেও তারা মিলিটারি ও সিভিল ইনটেলিজেন্সের তথ্য সংগ্রহ করে।

বার্লিনে অবস্থিত সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে চার হাজার কর্মী একসঙ্গে কাজ করে। বিশাল এই কার্যালয়টি প্রায় ৩৫টি ফুটবল মাঠের সমান। বিএনডি বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কাউন্টার ইনটেলিজেন্স

পরিচালনা, বিভিন্ন দেশে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা, কাউন্টার টেররিজম, নিজস্ব লোক সংগ্রহ ও নেটওয়ার্ক তৈরিতে কাজ করে।

এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারকদের বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণে সহায়তা, বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে। এক কথায় বহির্বিশ্বে জার্মান স্বার্থের পক্ষে যা কিছু করার প্রয়োজন তারা সেটাই করে। বিদেশে জার্মান স্বার্থের প্রতি হুমকির ব্যাপারে তারা সরকারকে আগাম সতর্ক করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

টেলিফোনে আড়িপাতা ও ইলেকট্রনিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও তারা কাজ করে। তারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিস্তার, প্রযুক্তির সব ধরনের অবৈধ হস্তান্তর, সংঘবদ্ধ অপরাধ, অস্ত্র ও মাদক পাচার, মানি লন্ডারিং, অবৈধ অভিবাসন ও তথ্যযুদ্ধের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে। তারা বৈদেশিক গুপ্তচরবৃত্তিতে জার্মানির একমাত্র গোয়েন্দা সংস্থা হওয়ায় সামরিক ও বেসামরিক উভয় ধরনের গুপ্তচরবৃত্তিতেই নিয়োজিত থাকে।

৫. আইএসআই

বিশ্বের সব থেকে বিতর্কিত গোয়েন্দা সংস্থার নাম পাকিস্তানের আইএসআই (ISI)। বিতর্কের দিক থেকে এই গোয়েন্দা সংস্থা বিশ্বের প্রথম। 'সরকারের ভিতরে সরকার' পাকিস্তানের মাটিতে এই নামে বহুল পরিচিত ও সবচেয়ে ক্ষমতাধর সংস্থাটির নাম আইএসআই।

১৯৪৮ এর মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত অস্ট্রোলীয় বংশদ্ভূত ব্রিটিশ আর্মি অফিসার ও পাকিস্তান সেনা বাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল রবার্ট চাওথামের পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে আইএসআই তৈরি হয়।

প্রাথমিকভাবে এর কাজ তিন বাহিনীর প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে সমন্বয় সাধন করা হলেও ১৯৫০ সাল থেকে একে আলাদা করে শুধু পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, স্বার্থ রক্ষা ও অখণ্ডতা বজায় রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

দেশে-বিদেশে সংস্থাটির সম্ভাব্য সদস্য সংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি এবং এর মধ্যে অনেক তথ্য প্রদানকারীও রয়েছে। এই সংস্থার প্রধান কাজ

CamScanner

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও অখণ্ডতা রক্ষা করা। যে সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, বৈদেশিক গোয়েন্দাসংস্থা রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যারা কাজ করে তাদের ওপর নজরদারি করা ও প্রয়োজনে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা করা। বিদেশে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ভারতের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে কৌশলগতভাবে নিজেদের অগ্রবর্তী রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী সব দেশকে প্রভাবিত করা। সরকার ও সেনা বাহিনীকে বাইরে ও ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা। সরকারের বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণ করা।

তিনজন ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেলের অধীনে তিনটি কোর বিষয়ের জন্য ৭টি বিভাগ কাজ করে। ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স এর সব কাজ মুলত ৭টি ডাইরেক্টরেটে দ্বারা পরিচালিত হয়।

আইএসআই কর্মীরা সাধারণত সেনাবাহিনীর এসএসজি, নৌ বাহিনীর ও বিমান বাহিনী থেকে আসে। তবে নিচু স্তরের কর্মীদের অনেক সময়ই প্যারা মিলিটারি ও পুলিশ বাহিনী থেকেও নেওয়া হয়। সংস্থাটির মূল প্রতিদ্বন্দ্বি 'র' এবং মোসাদ। বিখ্যাত মিশনগুলো হচ্ছে- সোভিয়েত বিরোধী আফগান যুদ্ধ, কার্গিল যুদ্ধ, ওয়ার অন টেরর ওয়াজিরিস্তান, বেলুচিস্তান এ আকবর বুগাতি হত্যা।

৬. ডিজিএসই

ডিজিএসই (DGSE) ফ্রান্সের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা। প্রতিষ্ঠিত হয় ২ এপ্রিল ১৯৮২। ডিজিএসই ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে চলে।

বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক প্রভাব এবং কাউন্টার ইন্টেলিজেন্ট অপারেশনে ডিজিএসই ডিজিএসআই নামক আরেকটি সংস্থার সাথে একসাথে কাজ করে। এর প্রধান কাজ হলো বাইরের দেশের বিভিন্ন সূত্র থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং তা মিলিটারি এবং নীতি-নির্ধারকদেরকে সরবরাহ করা। ডিজিএসইতে কাজ করেন প্রায় ৫ হাজারের বেশি কর্মকর্তা। এর সদর দফতর প্যারিসে।

৭. অস্ট্রেলিয়ার এএসআইএস

এএসআইএস (অঝওঝ) অস্ট্রেলিয়ার সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা যার কাজ হলো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, কাউন্টাল ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম এবং বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে সহায়তা মূলক কাজ করা।

প্রতিষ্ঠত হয় ১৩ মে ১৯৫২। প্রধান কার্যালয় ক্যানবেরাতে। বর্তমান ডিরেক্টর নিক ওয়ার্নার। এই সংস্থাটি ২০ বছর পর্যন্ত গোপন ছিল এমনকি অস্ট্রেলিয়ার সরকারও এই এজেন্সি সম্পর্কে জানত না। এর প্রধান কাজ হলো এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ।

এই কাজের জন্যে বিভিন্ন দেশে এজেন্ট নিয়োগ দিয়ে রেখেছে ASIS। এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো অন্যান্য গোয়েন্দাসংস্থাগুলোর সাথে একসাথে কাজ করে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বাইরের যেকোনো হুমকি থেকে দেশের জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া।



CamScanner

একনজরে বিশ্বের পনেরো দেশের গোয়েন্দা সংস্থা

মোসাদ, 'র' শুধু নয় আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল দেশেরই প্রশাসনিক কাঠামোতে গোয়েন্দা বিভাগ নামে একটি শাখা রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা, নিজ দেশের জনগণের চিন্তাচেতনা, পার্শ্ববর্তী বা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের খবরাখবর জানা এবং আধুনিক বিশ্বের পরাশক্তি রাষ্ট্রসমূহের গতিপ্রকৃতি জানতে এসব গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করে। সেরকম বিশ্বের ১৫টি গোয়েন্দা সংস্থার মৌলিক কিছু তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো ছকের মাধ্যমে।

এক নজরে বিশ্বের পনেরো দেশের গোয়েন্দা সংস্থা

ক্র.	গোয়েন্দা সংস্থা	তথ্যপঞ্জি	
০১	মোসাদ (MOSSAD)	দেশ	ইসরাঈল
		বর্তমান প্রধান	ইয়োসি কোহেন
		সদর দপ্তর	https://www.shabak.gov.il/english/Pages/, https://www.mossad.gov.il/
		ওয়েবসাইট	তেলআবিব, ইসরাঈল
		প্রতিষ্ঠাকাল	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৯
০২	সিআইএ Central Intelligence Agency (CIA)	দেশ	আমেরিকা
		বর্তমান প্রধান	মাইক পম্পেও
		সদর দপ্তর	ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
		ওয়েবসাইট	https://www.cia.gov/index.html
		প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৪৭ সালে

CamScanner

০৩	এফএসবি Federal Security Service of the Russian Federation (FSB)	দেশ	রাশিয়া
		বর্তমান প্রধান	আলেকজান্ডার বর্টনিকভ
		সদর দপ্তর	মস্কো, রাশিয়া
		ওয়েবসাইট	www.fsb.ru,
		প্রতিষ্ঠাকাল	১২ এপ্রিল, ১৯৯৫
০৪	'র'	দেশ	ভারত
		বর্তমান প্রধান	অনিল দাশমানা
		সদর দপ্তর	নয়াদিল্লি, ভারত
		ওয়েবসাইট	
		প্রতিষ্ঠাকাল	২১ সেপ্টেম্বর. ১৯৬৮
০৫	আইএসআই	দেশ	পাকিস্তান
		বর্তমান প্রধান	নাভিদ মুখতার
		সদর দপ্তর	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
		ওয়েবসাইট	
		প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৪৮
০৬	এমআই১৬	দেশ	যুক্তরাজ্য/ব্রিটেন
		বর্তমান প্রধান	এলেক্স ইয়ংগার
		সদর দপ্তর	ভক্সহল ক্রস, লন্ডন
		ওয়েবসাইট	
		প্রতিষ্ঠাকাল	১৯০৯ সালের অক্টোবার
০৭	এমএসএস (MSS)	দেশ	চীন
		বর্তমান প্রধান	চেন ওয়েনকিং
		সদর দপ্তর	বইজিং, চীন,
		ওয়েবসাইট	
		প্রতিষ্ঠাকাল	জুলাই ১৯৮৩
০৮	বিএনডি (BND)	দেশ	জার্মানি
		বর্তমান প্রধান	ব্রুনো কাল
		সদর দপ্তর	পুলাস এবং বার্লিন, জার্মানি
		ওয়েবসাইট	www.bnd.de
		প্রতিষ্ঠাকাল	১ এপ্রিল ১৯৫৬
০৯	National Security Council(NSC) (Turkish: *Milli Güvenlik* [illegible])	দেশ	তুরস্ক
		বর্তমান প্রধান	মুআম্মার তার্কার
		সদর দপ্তর	আংকারা, তুরস্ক
		ওয়েবসাইট	
		প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৩৩

১০	Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	দেশ	ইরান
		বর্তমান প্রধান	মে. জে. মহাম্মাদ আলি জাফরি
		সদর দপ্তর	সিপাহ, ইরান
		ওয়েবসাইট	
		প্রতিষ্ঠাকাল	১৮ আগস্ট, ১৯৮৪
১১	General Directorate for External Security (French: *Direction générale de la sécurité extérieure*,DGSE)	দেশ	ফ্রান্স
		বর্তমান প্রধান	বার্নার্ড বাজুলেট
		সদর দপ্তর	প্যারিস, ফ্রান্স
		ওয়েবসাইট	www.defense.gouv.fr/english/dgse
		প্রতিষ্ঠাকাল	২ এপ্রিল, ১৯৮২
১২	এএসআইএস (অঝওঝ)	দেশ	অস্ট্রেলিয়া
		বর্তমান প্রধান	নিক ওয়ার্নার
		সদর দপ্তর	ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া
		ওয়েবসাইট	www.asis.gov.au
		প্রতিষ্ঠাকাল	১৩ মে, ১৯৫২
১৩	এনআইএস National Intelligence Service (NIS)	দেশ	দক্ষিণ কোরিয়া
		বর্তমান প্রধান	সুহ হূন
		সদর দপ্তর	সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া
		ওয়েবসাইট	www.nis.go.kr eng.nis.go.kr,
		প্রতিষ্ঠাকাল	১৩ জুন, ১৯৬১
১৪	জিআইপি General Intelligence Presidency (GIP)	দেশ	সৌদি আরব
		বর্তমান প্রধান	লে. জে. খালিদ বিন আলি আল হুমাইদান
		সদর দপ্তর	রিয়াদ, সৌদি আরব
		ওয়েবসাইট	www.gip.gov
		প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৫৫
১৫	আরজিবি Reconnaissance General Bureau (RGB)	দেশ	উত্তর কোরিয়া
		বর্তমান প্রধান	অজ্ঞাত
		সদর দপ্তর	অজ্ঞাত
		ওয়েবসাইট	
		প্রতিষ্ঠাকাল	২০০৯

CamScanner

১৬	এনএসআই	দেশ	বাংলাদেশ
		বর্তমান প্রধান	মেজর জেনারেল মোঃ শামসুল হক পিএসসি
		সদর দপ্তর	ঢাকা, বাংলাদেশ
		ওয়েবসাইট	
		প্রতিষ্ঠাকাল	২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২

বর্তমানে কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সব থেকে দুর্ধর্ষ? ইন্টারনেটের বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে বিশ্বের গোয়েন্দা সংস্থা নিয়ে সার্চ করলে বিগত পাঁচ বছরের যেসব তালিকা পাওয়া যায়, সেগুলোর অধিকাংশই করেছে কয়েকটি অখ্যাত ও ভুঁইফোড় সংস্থা। এ ছাড়া ভিডিও শেয়ারিংয়ের ওয়েবসাইট ইউটিউবে রয়েছে অসংখ্য প্রামাণ্যচিত্র যেগুলোতে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য না পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

তবে ফরেন পলিসি, এবিসি নিউ পয়েন্ট, এক্সপার্ট সিকিউরিটি টিপস, দি মেশ নিউজ, জি নিউজ এবং স্টোরি পিক নামক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে করা কয়েকটি তালিকা পাওয়া যায়, যেখানে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তে বেশ মিল রয়েছে। এসব সূত্রের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বর্তমান সময়ের বিশ্বের সব থেকে দুর্ধর্ষ দশ গোয়েন্দা সংস্থার এই তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে।

CamScanner

তথ্যসূত্র

১. আলকুরআন
২. সহীল আল বুখারী
৩. মুসলিম শরীফ
৪. আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা। মাও. আব্দুর রহিম (রহ.)। কহিনুর প্রকাশনী।
৫. Oxford Advanced Learners Dictionary
৬. বাংলা একাডেমী ডিকশনারী
৭. `Art of War' ' সান জু'
৮. MOSSAD- *THE GREATEST MISSIONS OF THE ISRAELI SECRET SERVICE* মাইকেল বার জোহার, নিসিম মিশাল
৯. The Kaoboys & R&AW: Down Memory Lane| বি রমন।
১০. "গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা: বাংলাদেশে 'র'"। আবু রুশদ।
১১. 'জাতীয় রাজনীতি:১৯৪৫-১৯৭৪'। জনাব অলি আহাদ। সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ
১২. মিশন 'র'। আর.কে. যাদব।
১৩. ইনসাইড 'র'। অশোকা রায়না।
১৪. সীরাতে ইবনে হিশাম
১৫. উইকিপিডিয়া
১৬. আল জাজিরা। কাতার
১৭. বিবিসি বাংলা। ব্রিটেন

CamScanner

১৮. দি গার্ডিয়ান। ব্রিটেন
১৯. ইকনা। ইরান
২০. সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি)। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা
২১. একুশে টেলিভিশন
২২. দৈনিক প্রথম আলো
২৩. দৈনক কালের কণ্ঠ
২৪. দৈনিক যুগান্তর
২৫. দৈনক নয়া দিগন্ত
২৬. দৈনিক সংগ্রাম
২৭. দৈনিক ইত্তেফাক
২৮. দৈনিক ইনকিলাব
২৯. মাসিক তরজুমান
৩০. দৈনিক স্টেট্সম্যান। কোলকাতা
৩১. Daily Jerosalem Post. Israel
৩২. Jerosalem Online. Israel
৩৩. Srilanka Gurdian. Srilanka
৩৪. Daily Industry. Bangladesh দেশি-বিদেশি অসংখ্য নিউজসাইট, ওয়েবসাইট, ব্লগ, ফেসবুক পোস্ট ইত্যাদি।

CamScanner